নজরুল-রচনাবলী

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

নবম খণ্ড

বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাএ ৫৪২২

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ড যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে)। বাংলা একাডেমি সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং ১৯৮৪ সালে)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা-পরিষদ সম্পাদিত নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (নবম খণ্ড) : মাঘ ১৪১৫/ফেব্রুয়ারি ২০০৯। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ, আশ্বিন ১৪২২/অক্টোবর ২০১৫। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), NAZRUL RACHANABALI [Works of Kazi Nazrul Islam], Kendrio Bangla Unnayan Board Edition (Three Vol. in 1966, 1967 and 1970 respectively). Bangla Academy Edition (Forth and Fifth Vol.) in 1977 and 1984. New Edition (Four Vol.) in 1993. Nazrul Birth Centenary Edition [Vol. IX] : February 2009. First Reprint (Birth Centenary Edition) : Reprint Sub-Division, October 2015. Published by Dr. Jalal Ahmed, Director (in-charge), Sales, Marketing and Reprint Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Price : Taka 200.00 Only.

ISBN 984-07-5431-9

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

নবম খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য
আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য
আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

অতুলনীয় জীবনবৈচিত্র্য ও বিপুল সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা কবিতার ধারায় একটি নবতর স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন। কৈশোরে লেটোর দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁর সাহিত্যচর্চার যে সূচনা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধারাবাহিকভাবে তা চলেছিল গুরুতর অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা না হারানো পর্যন্ত (১৯৪২)। জীবিতকালেই সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকাররূপে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন নজরুল। কিন্তু তিনি খুব গোছালো মানুষ ছিলেন না। ফলে জীবিতকালে তাঁর রচনা গ্রন্থাকারে যতটা প্রকাশিত হয়েছিল, তার তুলনায় অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত ছিল অনেক বেশি। গত অর্ধ-শতকেরও বেশি সময় ধরে সেসব রচনা নানারূপে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের মতো একজন কবির রচনাবলীর প্রকাশ আমাদের সকলের জাতীয় কর্তব্য। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হওয়ার কারণে সে-দায়িত্ব আমাদের আরও বেশি। বস্তুত বাঙালির জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এ-দায়িত্ব পালনেরও সূচনা।

এরই ফল নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশ (১৯৬৬, ৬৭, ৭০)। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হলে (১৯৭২) একাডেমী থেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড (১৯৭৭) এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। কবি আবদুল কাদিরের মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে।

বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী থেকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের 'রচনাসমগ্র', নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনার পরই সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ নবম খণ্ডে 'অগ্রন্থিত কবিতা', 'নজরুলের হিন্দি গান', 'পত্রাবলী', ও 'বিবিধ' সংকলিত হলো।

সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ভাষাবিদ অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে যেভাবে 'নজরুল-রচনাবলী'র নবম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সেজন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ, জনাব শেখ সারোয়ার হোসেন, জনাব ফারহানা খানম, জনাব সৈয়দ মাহবুব হাসান, জনাব আবু মোঃ ইমদাদুল হক, জনাব শুভ্রা বড়ুয়া, জনাব বাবুল মিয়া এবং প্রেস ব্যবস্থাপক জনাব মোবারক হোসেন। দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১৯শে মাঘ ১৪১৫ ।। ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
মহাপরিচালক

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই

কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী': নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ নবম খণ্ডে 'অগ্রন্থিত কবিতা', 'নজরুলের হিন্দি গান', 'পত্রাবলী', ও 'বিবিধ' সংকলিত হলো। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবম খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা সম্পাদনা পরিষদ করেছেন। সুস্থাবস্থায় নজরুল একই গান একাধিক গ্রন্থে সংযোজন করে থাকলে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তা বাদ দেওয়া হয়নি।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে যেতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন' এবং গ্রন্থপরিচয়। সুতরাং কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ

গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
১৯শে মাঘ ১৪১৫ ।। ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় বাঙলা–উন্নয়ন–বোর্ড বিদ্রোহী–কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের এক সময়োচিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তদনুসারে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য–জীবনের প্রথম যুগের—যেই যুগে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ ছিল প্রধানতম প্রেরণা—সকল রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'–বিভাগে কবির কিশোর বয়সের রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর কয়েকটি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই যুগে তিনি যে–সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলী–র তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।

নজরুলের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা নানাজনে নানাভাবে করেছেন। রাজনীতিক পরাধীনতা ও আর্থনীতিক পরবশতা থেকে তিনি দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি চেয়েছিলেন। তার পথও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেদিনের তাঁর সেই পথকে কেউ ভেবেছেন সন্ত্রাসবাদ—কারণ তিনি ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের উদাহরণ দিয়ে তরুণদের অগ্নিমন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিয়মতান্ত্রিকতা—কারণ তিনি 'চিত্তনামা' লিখেছিলেন ; কেউ ভেবেছেন প্যান–ইসলামিজম—কারণ তিনি আনোয়ার পাশার প্রশস্তি গেয়েছিলেন ; আবার কেউ ভেবেছেন মহাত্মা গান্ধীর চরকা–তত্ত্ব—কারণ তিনি গান্ধীজীকে তাঁর রচিত 'চরকার গান' শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছিলেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এসব ভাবনার কোনোটাই সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সহায় নয়। প্রকৃতপক্ষে নজরুল তাঁর সাহিত্য–জীবনের প্রথম যুগে ছিলেন কামাল–পন্থী,—কামাল আতাতুর্কের সুশৃঙ্খল সংগ্রামের পথই তিনি ভেবেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সর্বাপেক্ষা সমীচীন পথ। ১৩২৯ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখের ১ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যক 'ধূমকেতু'তে তিনি 'কামাল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল' যে, 'খিলাফত উদ্ধার' ও 'দেশ উদ্ধার' করতে হলে 'হায়দারী হাঁক হাঁকা চাই ; .... ও–সব ভণ্ডামি দিয়ে ইসলাম উদ্ধার হবে না। ... ইসলামের বিশেষত্ব তলোয়ার।' কামাল আতাতুর্কের প্রবল দেশপ্রেম, মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিকতা নজরুলের এই যুগের রচনায় যে প্রভূত প্রেরণা যুগিয়েছিল তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে সম্যক উপলব্ধ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'নজরুল–রচনাবলী' প্রকাশের কাজে হাত দিয়ে আমরা দেখেছি যে, কবির অনেক কাব্যগ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা ইতোমধ্যেই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাঁর কোনো

কোনো কাব্যগ্রন্থ পরের সংস্করণে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দোলন-চাঁপা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। তার তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বহু বিখ্যাত কবিতা বাদ পড়েছে ; সে-স্থলে 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র কিছু কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। 'দোলন-চাঁপা'র গোড়ার দিকে 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' স্থান পেয়েছিল ; তৃতীয় সংস্করণে সেটি বর্জিত হয়েছে। এই খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে তা সঙ্কলিত হলো। বলা বাহুল্য যে, আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।

আমাদের ধারণা যে, 'সংযোজন'-বিভাগে আমরা যেসব লেখা দিয়েছি, তাছাড়াও সে-সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা অদ্যাবধি গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। কেউ যদি তেমন কোনো লেখার সন্ধান দিতে পারেন, তবে তা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করবো এবং পরবর্তী সংস্করণে বা খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করবো।

কবির কোনো কোনো কবিতার রচনা-কাল ও উপলক্ষ নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আমরা গ্রন্থ-পরিচয়ে যেসব তথ্য দিয়েছি, তাতে সে-বিতর্কের নিরসনে কিছু সহায়তা হবে। কিন্তু আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সব নেই ; সেজন্যই কবির অনেক রচনার প্রথম প্রকাশ-কাল নির্দেশ করা সম্ভবপর হলো না। আমাদের তরুণ গবেষকরা এ-বিষয়ে সন্ধান করে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবেন, এ আশাই আমরা করছি।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

আবদুল কাদির

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 'নজরুল-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের রচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'সংযোজন'-বিভাগের প্রথম তিনটি কবিতা তার সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে রচিত ; এগুলি রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন'-এ বলা হয়েছিল যে, সে খণ্ডের 'সংযোজন'-বিভাগে যে সকল লেখা সংকলিত হয়েছে তাছাড়াও সে সময়কার পত্র-পত্রিকাগুলি খুঁজলে কবির আরো কিছু লেখা পাওয়া যাবে—যা গ্রন্থবদ্ধ হয়নি, এবং সেরূপ কোনো লেখা পাওয়া গেলে তা পরবর্তী খণ্ডে পরিবেশন করা হবে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত তিনটি কবিতা রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরে আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে। 'প্রবন্ধ' বিভাগের শেষ দুটি নিবন্ধ কবির সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যুগে রচিত। সে যুগে কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে তাঁর স্বাক্ষরিত এরূপ বহু সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সে-সকল দুর্লভ লেখা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগের সূচনায় যে মতবাদের প্রবক্তা হন, তা প্রত্যক্ষত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজ্‌ম্)। তাঁর পরিচালিত 'লাঙলে' হয়েছিল তারই কালোপযোগী কর্ষণা। 'লাঙল' ছিল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র' ; ১লা পৌষ ১৩৩২ মুতাবিক ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে তার প্রথম (বিশেষ) সংখ্যাতেই সে-সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য ও 'চরম দাবি' বিবৃত করে নজরুল এক ইশতেহারে বলেন :

'নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ লাভই এই দলের উদ্দেশ্য। ...।

আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকরী জিনিস, লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া, দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মিগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-ক্ষম স্বায়ত্তশাসন-বিশিষ্ট পল্লী-তন্ত্রের উপর বর্তিবে—এই পল্লী-তন্ত্র ভদ্র শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।'

ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' ও 'ফণি-মনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট। তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার'-চরিত্র এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত।

কিন্তু সেদিন কবি প্রবল আবেগ নিয়ে দেশের গণ–আন্দোলনের পুরোযায়ী চারণ হয়েছিলেন, তাতে ভাটা পড়লো দুটি কারণে। প্রথম কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতায় রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত। দ্বিতীয় কারণ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে কংগ্রেস–কর্মী–সংঘের সদস্যদের উদ্যোগে 'হিন্দু–মুসলিম প্যাক্ট' নাকচ করে প্রস্তাব গ্রহণ। নজরুল কৃষ্ণনগর সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গেয়ে, কিন্তু কাণ্ডারিদের কানে তাঁর আবেদন পৌঁছলো না। অগত্যা নজরুল আত্মরতির সন্ধান করলেন 'মাধবী–প্রলাপ' ও 'অনামিকা'র রোমান্টিক রূপ–জালে ক্রমে আত্মমগ্ন হলেন 'বুল্‌বুল' ও 'চোখের চাতক'–এর সুর–লোকে। কিন্তু সেই রূপ ও সুরের মোহন মায়াজাল ভেদ করেও বারবার তাঁর কানে বেজেছে নিপীড়িত মানবতার কাতর আর্তনাদ ; তিনি নিরাসক্ত শিল্পীর আনন্দময় আসন ছেড়ে এসে রুদ্র কণ্ঠে গেয়েছেন 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়–শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'র বেদনার্ত গাথা–গান।

'মৃত্যু–ক্ষুধা' উপন্যাসের 'আনসার' একস্থানে বলেছেন, 'নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে, পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। ... আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে।' এই আনসারের কণ্ঠে সেদিন পরোক্ষে ফুটেছে নজরুলেরই অন্তরের বাণী। বস্তুত তাঁর সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে যে তাঁর রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তিত হয় এবং তাঁর সাহিত্যধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়, তা বর্তমান খণ্ডের লেখাগুলো একত্রে পড়ে নিঃসন্দেহে হৃদয়ঙ্গম হবে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।

এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত 'সিন্ধু–হিন্দোল' ও 'জিঞ্জীর' বহুদিন বাজারে নাই। এ দুটি কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণও হয় নাই। ইতিমধ্যেই 'বুল্‌বুল' হয়েছে দুর্লভ। 'সর্বহারা', 'ফণি–মনসা' ও 'চক্রবাক' নূতন সংস্করণে অনেক অদল–বদল হয়েছে। এই খণ্ডের জন্য 'বুল্‌বুল'–এর গানগুলি আমাকে নকল করে পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'সিন্ধু–হিন্দোল' দেখতে দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। 'চক্রবাক' প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেছি 'আল ইসলাহ্' সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নূরুল হকের সৌজন্যে সিলহেটে কেন্দ্রীয় সাহিত্য–সংসদের পাঠাগার থেকে। 'গ্রন্থ–পরিচয়' লিখতে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এঁরাও নজরুল–সাহিত্যের প্রচারকামী ; অতএব আমার কাছে কৃতজ্ঞতা দাবি করেন না।

এ–খণ্ডেরও 'গ্রন্থ–পরিচয়' অসম্পূর্ণ ; তারও কারণ আমাদের হাতে মালমশলার অভাব। তবে নজরুল–সাহিত্যের আলোচনা ক্রমশ যেরূপ বিস্তারিত হচ্ছে তাতে খুবই আশা করা যায় যে, নবীন গবেষকদের কল্যাণে কবির সকল লেখারই প্রথম প্রকাশকাল ও উপলক্ষ সম্পর্কে আবশ্যক তথ্যাদি পাঠকদের পরিজ্ঞাত হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

ঢাকা
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৭

আবদুল কাদির

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুসারে নজরুল-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই খণ্ডে নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগের প্রায় সমুদয় রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য 'প্রবন্ধ' বিভাগে পরিবেশিত 'সত্যবাণী' তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে বিরচিত, অতএব রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে স্থান পেলেই কালানুক্রম রক্ষিত হতো। কিন্তু ১৩২৮ ভাদ্রের 'সাধনা'য় প্রকাশিত এ-লেখাটি সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। এ-লেখাটিতে যে-সুর ধ্বনিত, নজরুলের সমগ্র গদ্য-রচনায় তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই। তাই রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের 'পরবর্তী সংস্করণে'র অপেক্ষা না করে এই মহামূল্য লেখাটি এই খণ্ডেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রবন্ধ'-বিভাগের শেষ দুটি লেখা দৈনিক 'নবযুগ'-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ-রূপে পত্রস্থ হয়েছিল। এই খণ্ডের 'ধর্ম ও কর্ম' শীর্ষক লেখাটিও 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত কবির স্বাক্ষরিত এরূপ একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এ লেখাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন অধ্যাপক আবদুল কাইউম। দ্বিতীয় খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, কবির সম্পাদিত দৈনিক 'নবযুগ'-পত্রে প্রকাশিত তাঁর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি 'সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলে চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে।' কিন্তু 'সে-সকল দুর্লভ লেখা' সংগৃহীত হওয়ার আশা খুব উজ্জ্বল প্রতিভাত হচ্ছে না বলেই 'ধর্ম ও কর্ম' লেখাটি এই খণ্ডেই পরিবেশিত হলো।

[প্রথম খণ্ডের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ আমরা বলেছিলাম যে, নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্য-জীবনের প্রথম যুগে যে-সকল শিশুপাঠ্য কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাবে।' কিন্তু এই খণ্ডেরও কলেবর সীমিত ও সুমিত রাখা আবশ্যক বিধায় অবশেষে স্থির হয়েছে যে, নজরুলের 'ঝিঙে ফুল', 'পুতুলের বিয়ে', 'মক্তব-সাহিত্য', 'পিলে-পট্‌কা পুতুলের বিয়ে' (১৩৭০), 'ঘুম-জাগানো পাখি' (১৩৭১) প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য।]*

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগে প্রধানত গীতিকার ও সুরস্রষ্টা রূপেই প্রথিতকীর্তি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। রোমান্টিক কবি-কৃতির সকল লক্ষণ তাঁর এ-যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট। বঞ্চনাহত অরণ্যের আন্দোলক ও উন্মত্ত সমুদ্রের ঊর্মিলতা নজরুলের কাব্যে যেমন বাঙ্‌ময়, মিলনের উদ্দাম ও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তাঁর প্রেমের

---

* সম্পাদনা-পরিষদ বর্তমান সংস্করণে নজরুলের রচনা কালানুক্রমভাবে সংকলিত হওয়ার দরুন গ্রন্থসমূহ বন্ধনীর অংশটুকু বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থানুক্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

গানে তেমনি ব্যঞ্জনাময়। তাঁর দেশাত্মবোধ ও ভক্তিভাবমূলক গানগুলিতেও প্রকৃতিপ্রেম ও প্রতীকপ্রীতি অভূতপূর্ব চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যময়। তাই অনবদ্য সৃষ্টির দিক দিয়ে নজরুলের শিল্পী-জীবনের দ্বিতীয় যুগকে যদি বলা হয় তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ, তাহলে এই তৃতীয় যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর সংগীত-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর ১০টি রুবাইর নজরুলের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এই খণ্ডে পরিবেশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলি গ্রন্থিত করার সময় কবি কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিশোধিত করেছেন। কিন্তু 'কাব্যে আমপারা'-র মূল পাণ্ডুলিপি তিনি মুদ্রণ-কালে পরিবর্তন করেন বিস্তর। মূল পাণ্ডুলিপিখানি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ; তা ছন্দের বিচারে ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত। কিন্তু পরে 'কোরআন-পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ন' রাখতে গিয়েই তিনি অগত্যা অনুবাদে বাংলা ছন্দের প্রচলিত বিধান বহু স্থানে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হন। ফলে এই পদ্যানুবাদের অনেক চরণেই ছন্দসাম্যের ব্যতিক্রম কানে বাজে। মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন এই গ্রন্থখানির 'প্রুফ দেখা, তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ' শুধু সম্পন্ন করেননি, কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত মূল পাণ্ডুলিপিখানিও সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্বে সুহৃদ্বর আবদুল মজিদ অকালে ইন্তেকাল করেছেন, অতঃপর তাঁর সংরক্ষিত সেই অমূল্য সম্পদ কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কে জানে।

নজরুলের অনেক গান সাময়িকপত্রে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থে তার কোনো কোনো চরণ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে,—এরূপ কিছু দৃষ্টান্ত আমি 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' দিয়েছি। আমার ধারণা যে, ভাবের প্রেরণায় নজরুল সে-সকল গান প্রথমে যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন সেরূপেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরে সেগুলি রেকর্ড করার সময় সুরের প্ররোচনায় যেভাবে পরিবর্তন করেন সেভাবেই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। অবশ্য এই জটিল বিষয়ে একমাত্র গীতি-বিশেষজ্ঞরাই সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।

আবদুল কাদির

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ৯ই পৌষ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল ; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বারংবার পরিবর্তনের দরুন তা প্রকাশিত হতে পাঁচ বছর সময় বেশি লেগে গেল। এই অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমাদেরও দুঃখের অন্ত নেই।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য-জীবনের চতুর্থ যুগের প্রায় সমুদয় রচনা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসখানি তাঁর সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগে বিরচিত,—যে যুগে তাঁর সচেতন মনে দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা (Socialistic Humanism) রাজনৈতিক চিন্তাদর্শরূপে প্রবলতম প্রেরণার সঞ্চার করেছে। এই 'কুহেলিকা' ছাড়া এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির সম্বিতহারা হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে কবির মস্তিষ্কের অবশীর্ণতা-রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ আকস্মিকরূপে দেখা দেয় ; তারপর তাঁর যে-সকল রচনা গ্রন্থিত হয়েছে, তাদের সজ্জা ও বিন্যাস তিনি সুস্থ থাকলে নিজে কিভাবে করতেন তা অনুমান করা কঠিন। এই খণ্ডে 'কবিতা ও গান' অংশের শেষে ১১১টি গান 'সঙ্গীতাঞ্জলি' নামে সন্নিবেশিত হয়েছে ; এই নামকরণও তিনি অনুমোদন করতেন কি না তা কে বলতে পারেন ?

নজরুলের কবি-জীবনের চতুর্থ স্তরে ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা (metaphysical poetry) ও মরমীয়া গান (mystical songs) এক বিশেষ স্থান ও মহিমা লাভ করেছে। এই যুগের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন :

> আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয় ;
> নিত্য আমাকে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়। ...
> দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয় ;
> কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয় !
> কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি নাকো, শুধু কাঁদি আর কাঁদি ;
> কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তারে বাঁধি !
> সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি ?
> চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি ?

কোনো প্রেমিক ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ ;
সে-প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহ্লাদ।

আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল এ-সকল কথা বলেছেন, তার অন্তর্গূঢ় রস-রহস্য পৃথিবীর একমাত্র মর্মবাদী সূফি সাধকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন,—সাধারণ মানুষেরা সেই বাণীর রসে আপ্লুত হলেও তার রহস্য অনুধাবন করতে অক্ষম। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে এই অন্তর্জ্যোতিদীপ্ত আধ্যাত্মিকতাই পেয়েছে প্রাধান্য অথবা বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের ও ধর্মসংস্কারের নানা রূপ ও রীতির আশ্রয়ে এই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি হয়েছে জনমন-রঞ্জনের পরম উপযোগী,—অথচ ধর্মীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে আহরিত উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের সুমিত ব্যবহারে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত ও রসোত্তীর্ণ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে তাঁর বন্ধু ও সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখেছিলেন : 'Poor Man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias'. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রায় এক শতাব্দীকাল পরেও দেখা যাচ্ছে নজরুলেরও শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদেরই কেউ কেউ তাঁর সাহিত্য-বিচারেও হয়েছেন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব-দোষে দিশাহারা। নজরুলের 'দেবীস্তুতি' নামক রচনাটির রূপকাশ্রিত ভাবতত্ত্ব ব্যাখ্যাচ্ছলে তার 'ভূমিকা'য় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'নজরুলের আসল পরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত।'—এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যক 'জয়তী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমি লিখেছিলাম : 'নজরুল ইসলাম বাংলার মুসলিম রিনেসাঁসের প্রথম হুংকারই শুধু নহেন, কাব্যচর্চায় ইসলামের নিয়ম-কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া neopaganism-এর সাহায্য-গ্রহণ ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী।'—আমার সেই লেখাটি পড়ে নজরুল ইসলাম দৃঢ়স্বরে মন্তব্য করেন যে, তাঁর কবিতায় ও গানে বাহ্যত neo-paganism বলে যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে pseudo-paganism। নজরুলের কোনো কোনো রচনায় বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ ও শৈবসুলভ শক্তি-আরাধনা দেখে যাঁরা তাঁকে স্থূল কথায় প্রতীক-পূজারী বলতে চান, তাঁদের কাছে কবির বক্তব্য যে, তিনি কখনই প্যাগান বা নিউ-প্যাগান নন, তিনি কখনো কখনো কাব্য বিষয়ের অনুসরণে ও অন্তরের অনুপ্রাণিত ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনে পরেছেন pseudo-pagan-এর (নকল প্যাগানের) সাময়িক কবি-বেশ।

আধুনিককালে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অসামান্য জীবনবৃত্ত নিয়ে কাব্য বিরচনের চেষ্টা করেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন ও মোজাম্মেল হক ; কিন্তু সেই প্রয়াস সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। নজরুল ইসলাম পরিণত বয়সে এই বিষয় নিয়ে 'মরু-ভাস্কর' রচনা শুরু করেন ; কিন্তু ৪২ বছর বয়সে দুরন্ত ব্যাধির কালগ্রাসে পড়ে এই প্রদীপ্ত প্রতিভা-সূর্য অকালে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ায় এই কাব্যখানিও অসমাপ্ত রয়ে

গেছে। নজরুল তাঁর 'মরু-ভাস্কর' কাব্যে বাংলা ভাষার প্রথাবদ্ধ ছন্দগুলি ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, তা নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে যাঁরা পরমাত্মার সহিত সাযুজ্য লাভের আনন্দ-সংবাদ দিয়েছেন, সামাজিক ঐক্য ও আর্ত-মানবতার প্রতি সুগভীর সহানুভূতি তাঁদের অমূল্য শিক্ষার এক বড় অঙ্গ। নজরুল-সাহিত্যের চতুর্থ স্তরে স্বভাবতই তাঁর সৌন্দর্য-প্রিয়তা ও প্রেম-বিহ্বলতা পেয়েছে প্রগাঢ়তম রূপ ; কিন্তু উদাসীন শিল্পীর সেই প্রসন্ন ধ্যানের আসনে বসেই নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁর বেদনা বোধের প্রকাশ হয়েছে পূর্বের চেয়ে আরও তীক্ষ্ণ ও প্রত্যক্ষ। 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড এই বৈশিষ্ট্যেরই দাবিদার।

এই খণ্ডে সংকলিত 'অপরূপ রাস' এবং 'আবিরাবির্মএধি' শীর্ষক কবিতা দুটির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন হুগলি থেকে কবির পরম ভক্ত শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' কাব্যানুবাদের কবি-লিখিত 'ভূমিকা' সংগ্রহ করে দিয়েছেন কল্যাণীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

দৈনিক 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত নজরুলের একটি মাত্র নিবন্ধ : 'বাঙালির বাঙলা' এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত পত্রিকায় কবির স্বাক্ষরযুক্ত আরও অনেক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ; কিন্তু সেগুলি সংগ্রহের উদ্যোগ নিবেন কে?

এই খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করেছেন স্নেহভাজন খোন্দকার গোলাম কিবরিয়া।

আবদুল কাদির

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রথমার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

সাবেক কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড 'নজরুল-রচনাবলী' কয়েক খণ্ডে প্রকাশের যে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তদনুসারে ১৩৭৯ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের দরুন তা পাঁচ বৎসর বিলম্বিত হয়ে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়। তার কয়েক মাস আগে, ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপদেষ্টা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম আবুল ফজল সাহেবের সমীপে পঞ্চম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্প উপস্থাপন করেছিলাম এবং তিনি তা তখনই অনুমোদন করেন। তার প্রায় দুবছর পরে ১২-২-১৯৭৯ তারিখে আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের কাছে উক্ত পরিকল্পের প্রতিলিপি-সহ একখানি পত্র প্রেরণ করি। সেই পত্রের উত্তরে একাডেমীর 'মহাপরিচালক সাহেবের আদেশক্রমে' ৬-৩-১৯৭৯ তারিখে আমাকে জানানো হয় যে, ১৫-২-১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের ৪৭-তম সংখ্যক মূলতবি অধিবেশনে' 'নজরুল-রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-৫-১৯৭৯ ইং তারিখের ৭৭১৪-সংখ্যক পত্রে আমাকে পঞ্চম খণ্ডের 'সমগ্র পাণ্ডুলিপি' ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দের 'জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে' দাখিল করতে বলা হয়। তদনুসারে ১১ই জুন তারিখে আমি 'পঞ্চম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি' একাডেমীর মহাপরিচালক সাহেবের হাতে অর্পণ করি।

এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও সম্পাদনা করতে হয়েছিল বলে আমাকে নজরুলের কিছু সংখ্যক রচনা সংকলন করার ব্যাপারে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেবের সহায়তা চাইতে হয়। তিনি সে-সময়ে আমার সহায়তা করতে সম্মত না হলে আমার ক্লেশ খুবই বৃদ্ধি পেতো। বলা বাহুল্য যে, তাঁকে তাঁর সেই অতি দ্রুততা-সহকারে সম্পন্ন কাজের জন্যে যথোপযুক্ত 'সম্মানী', পাণ্ডুলিপি একাডেমীতে দাখিল করার পূর্বেই, পরিশোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে পঞ্চম খণ্ডের মাত্র পাঁচ শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে। পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্তমানে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদনুপাতে পুস্তকের দাম বাড়াতে হয়েছে, তা বিবেচনা করে গ্রন্থমূল্য সহৃদয় পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখবার উদ্দেশ্যে উক্ত পাঁচ শত পৃষ্ঠার মূল পাঠ দিয়েই পঞ্চম খণ্ডের 'প্রথমার্ধ' প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে : (ক) হাসির গান,

(খ) নাট্যগীতি, (গ) নাটিকা ও প্রহসন, যথা—'ঈদ', 'গুল-বাগিচা', 'অতনুর দেশ', 'বিদ্যাপতি', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'বিজয়া', 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' প্রভৃতি, (ঘ) প্রবন্ধ ও রস-রচনা, (ঙ) অভিভাষণ, (চ) চিঠিপত্র ও (ছ) গ্রন্থ-পরিচয়।

নজরুলের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে এবং 'পুতুলের বিয়ে' ১৩৪০ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। এই দু'টি গ্রন্থ ছাড়া 'নজরুল-রচনাবলী' পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি।

এই খণ্ডে কবির জাগরণধর্মী কবিতা ও কাব্যগীতিগুলি 'অগ্রনায়ক' অভিধায় পরিবেশিত হলো। এই জাগরণ হচ্ছে আত্মার জাগরণ, জনগণের, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ আদায়ের জন্যে চিত্তের জাগরণ। কবিতাগুলিতে পরমাত্মার সহিত কবি-প্রাণের সাযুজ্য, কবির উদার মানবিকতার আদর্শ ও গভীর স্বদেশপ্রীতি পরম হৃদয়স্পর্শী রসমূর্তি লাভ করেছে।

'মৃত তারা' বিভাগের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোতে কবির ব্যক্তি-স্বরূপের পরিচয় দেদীপ্যমান। কবির উপচেতন মনের নিগূঢ় স্বাক্ষর, মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রেম ও কল্যাণ-কামনা, এর রচনাগুলোকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ।

'ঝিঙে ফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলো ছাড়া, কবি যে-সকল কিশোর-পাঠ্য কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা ও নাটিকা লিখেছেন, সেগুলো এই খণ্ডে 'কিশোর' নামে সন্নিবেশিত হলো।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে 'হারামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগ-মালিকা' নামে তিনটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মারফতে ক্লাসিক্যাল রাগ ও নবতর রাগের বহু সঙ্গীত প্রচার করে তাঁর অলোকসামান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই তিনটি অনুষ্ঠানে কবি বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর অনুমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং নানা নতুন সুরের সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক সঙ্গীত প্রচার করেন। তাদের কোন বিভাগে তিনি কোন কোন সঙ্গীত ও কতগুলি সঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তা বাংলা সঙ্গীত-সাহিত্যের গবেষকদের এক বড় গবেষণার বিষয়। আমি কবির দেওয়া উক্ত নামগুলির অনুসরণে এই খণ্ডের গানগুলিকে 'সন্ধ্যামণি', 'গীতি-বিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা', এই তিন নামের অধীনে বিন্যস্ত করেছি। 'সন্ধ্যামণি' আখ্যায় কবির প্রেমমূলক গানগুলি সংকলিত হয়েছে। 'গীতি-বিচিত্রা' আখ্যায় ভক্তিমূলক ও ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী সঙ্গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'নবরাগ-মালিকা' শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে প্রধানত কবির উদ্ভাবিত নবরাগের গানগুলি। সেগুলিতে আছে রাগ-রাগিণীর সূক্ষ্মতম কারুকার্য ও বিস্ময়প্রদ সুরবৈচিত্র্য।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে প্রতি মাসে একবার 'হারামণি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর পুনঃপ্রচলনের জন্যে নূতন গান প্রচার করতেন। সে-সকল গানের অধিকাংশই আজ পাওয়া যায় না। একবার খবর বেরিয়েছিল যে, 'হারামণি' অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা নজরুলের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি খাতা কবির অন্যমনস্কতাবশত হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই হারানো সম্পদ উদ্ধারের কোনো চেষ্টা কি আজ অবধি কোথাও হয়েছে?

প্রতি মাসে দুইবার 'গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটি হতো। সেই পৌনে এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হতো গীতি-আলেখ্য। কলিকাতা বেতারে নজরুলের রচিত প্রায়

আশিটি গীতি–আলেখ্য প্রচারিত হয়েছে। প্রতিটি গীতি–আলেখ্যে একটি মূল বিষয়কে আশ্রয় করে ছয়টি করে গান পরিবেশিত হতো। নজরুলের 'শেষ সওগাত' কাব্যের 'কাবেরী–তীরে' সেই অনুষ্ঠানেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু 'কাফেলা', 'ছন্দসী' প্রভৃতি নামে যে–সকল গীতি–আলেখ্য প্রচারিত হয়েছিল, তাদের কোনও পাঠ অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। নজরুলের 'ছন্দিতা' নামক গীতিগুচ্ছের 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'রুচিরা', 'দীপক–মালা', 'মন্দাকিনী' ও 'মণিমালা' নামক গানগুলি সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে সংরচিত। বাংলা ভাষায় প্রাকৃত মাত্রাচ্ছন্দে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান লিখেছেন ; কিন্তু নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে বাংলা গানের বাণী বিরচন করতে সক্ষম হননি ; এই রীতিতে বাংলা সঙ্গীতে নজরুলের অচিন্তিতপূর্ব অবদান তাঁর অলৌকিক কবি–প্রতিভার বিস্ময়প্রদ পরিচয় বহন করে। তাঁর 'ছন্দসী' নামক সঙ্গীত–আলেখ্যের দুটি অনুষ্ঠানে সংস্কৃত 'মালিনী', 'বসন্ত তিলক', 'তনুমধ্যা', 'ইন্দ্রবজ্রা', 'মন্দাক্রান্তা', 'শার্দূলবিক্রীড়িত' প্রভৃতি বৃত্তচ্ছন্দে বিরচিত তাঁর ১২টি গান প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সে–সকল মহামূল্যবান গানের বাণী কে সংগ্রহ করবেন ? নজরুল ইসলামের এ–সকল অবলুপ্তিমুখীন বিচিত্র গীতাবলী ও কীর্তন–গান সংগৃহীত হলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হবে যে, নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সঙ্গীত–সম্রাট।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' ও 'অন্নপূর্ণা', শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া' ও 'লায়লী–মজনু' প্রভৃতি নাটকের জন্যে নজরুল ইসলাম অনেক গান লিখে দিয়েছিলেন। 'চৌরঙ্গী', 'দিক্‌শূল', 'নন্দিনী', 'পাতালপুরী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার–লুণ্ঠন' প্রভৃতি বাণীচিত্রের জন্যেও নজরুল বহু গান প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের সকল গান নজরুলের গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধেয়।

নজরুল ইসলাম ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে 'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির কাহিনী এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে 'সাপুড়ে' ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন। এ দুটি ছায়াচিত্রের রেকর্ডবদ্ধ বাণী লিপিবদ্ধ করবার কোনো উদ্যোগ অদ্যাবধি কেউ নিয়েছেন বলে শুনিনি। এ দুটি ছায়ানাট্যের সমগ্র পাঠ পাওয়া গেলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, সন্দেহ নেই।

১৩৯১ সনের ১৮-ই জ্যৈষ্ঠ আমার বয়স ৭৮–বৎসর পূর্ণ হয়ে ৭৯–বৎসর শুরু হবে। বর্তমানে আমি বহুব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ। প্রায় সতেরো বছর আগে আমার ডান চোখের ছানি কাটা হয়েছিল ; কিন্তু সেই চোখ এখনও কাজে লাগছে না। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমার বাম চোখের ছানি কাটা হয়েছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে নজরুল ইসলামের অবলুপ্তিমুখীন রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা আর সম্ভবপর নয়। আমি আশা করব যে, নজরুল–রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং তা সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের নবীন নজরুল–গবেষক ও নজরুল–অনুরাগীরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয়ার্ধের
সম্পাদকের নিবেদন

যে-কোনো সমাজ-সচেতন সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শে মোড় পরিবর্তন দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন কবি ; সুতরাং তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিচারে তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা-বদলের নিদর্শন পাওয়া যাবে এ খুবই স্বাভাবিক। 'নজরুল-রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁর মনন-ধারার অনুসরণ করে আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে, কবি শেষ পর্যন্ত যে-সামাজিক ভাবনার স্তরে পৌঁছেছেন তাকে বলা চলে Spiritual Communism—আধ্যাত্মিক ধন-সাম্যবাদ। নজরুলের অবশিষ্ট রচনাবলী সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হলে তাঁর ভাবাদর্শের সামগ্রিক স্বরূপ সম্বন্ধে হয়ত পাঠকদের মনে নূতনতর উপলব্ধি হতে পারে। অতএব তাঁর অবশিষ্ট রচনাসমূহ সংগ্রহ করে 'নজরুল-রচনাবলী' ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই-ই আমি আশা করছি।

আবদুল কাদির

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'নজরুল-রচনাবলী' পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু 'নজরুল-রচনাবলী' সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত 'নজরুল-রচনাবলী'রই আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে 'অগ্নি-বীণা'র পরে 'বিষের বাঁশী' এবং তারপরে 'দোলন-চাঁপা' বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে 'অগ্নি-বীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'বিষের বাঁশী'। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২ কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, 'সঙ্গীতাঞ্জলি', 'সন্ধ্যামণি', 'নবরাগমালিকা'। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে-সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ 'নজরুল-রচনাবলী' প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দু'বার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন 'বিষের বাঁশী' কিংবা 'পূবের হাওয়া'। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন 'সর্বহারা'। যে-সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড়রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ 'সঞ্চিতা' এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে 'সঞ্চিতা'র প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. 'মক্তব-সাহিত্য' বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে 'মক্তব-সাহিত্যে'র উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হলো।

'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকরা 'নজরুল-রচনাবলী'র আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ।। ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

এক অনুষ্ঠানে কবির উপস্থিতিতে নজরুল-সংগীত পরিবেশন করছেন কণ্ঠশিল্পী শেখ লুৎফর রহমান

মৌন কবি
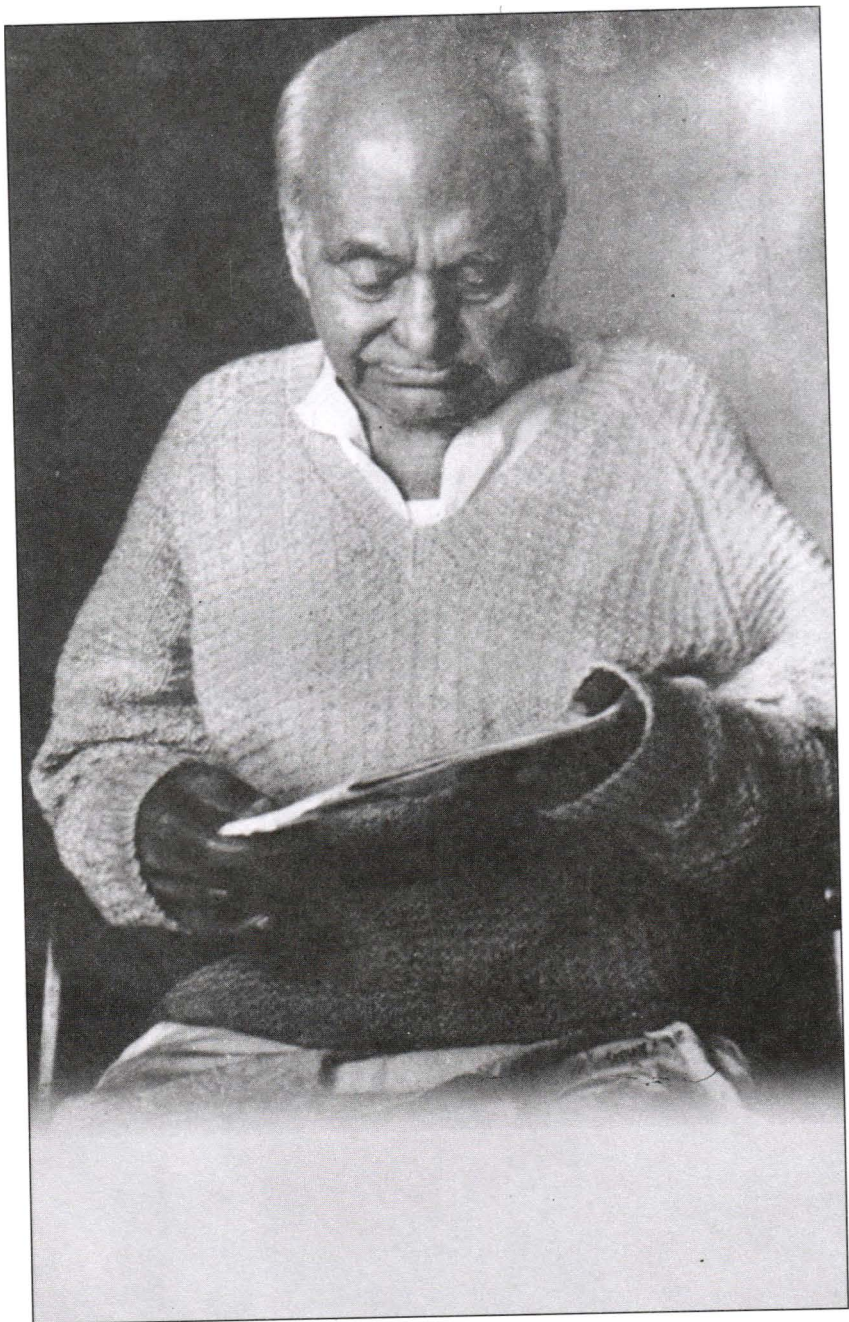
পত্রিকা হাতে কবি
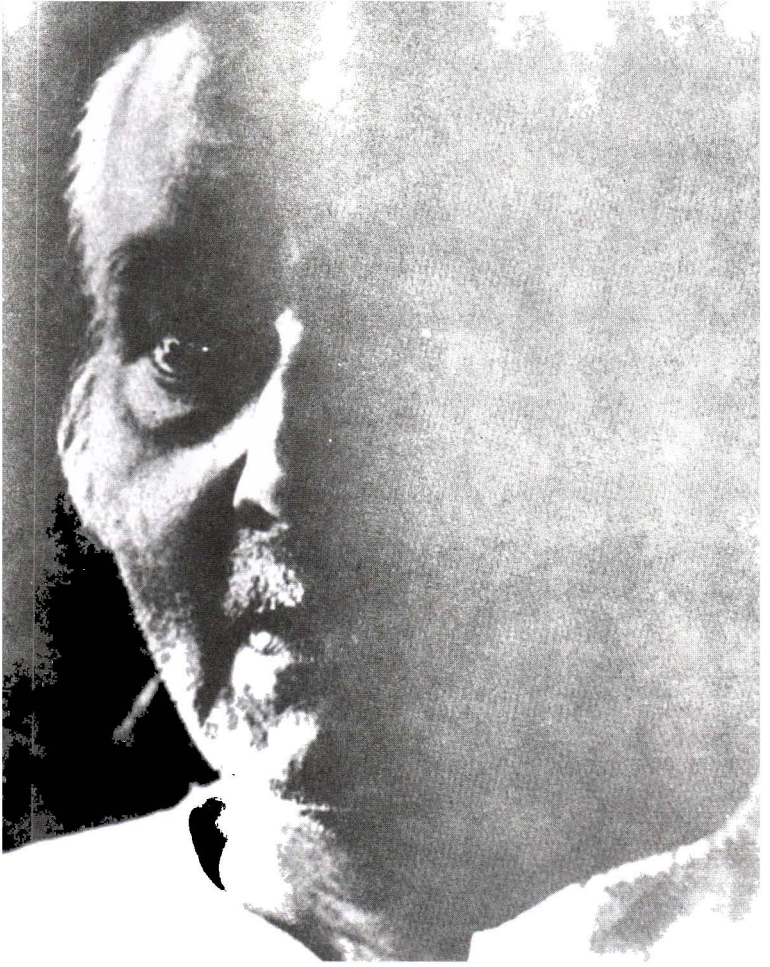
এক বিশেষ মুহূর্তে কবি

বাতায়ন-পাশে কবিভবনে

লন্ডনে চিকিৎসাধীন কবি ও কবিপত্নী

লন্ডনে নজরুল, ১৯৫৩ সালে চিকিৎসার জন্য

কবিভবনে নজরুল-সান্নিধ্যে কবির দুই বন্ধু ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ও মীজানুর রহমান (ডান থেকে বামে)
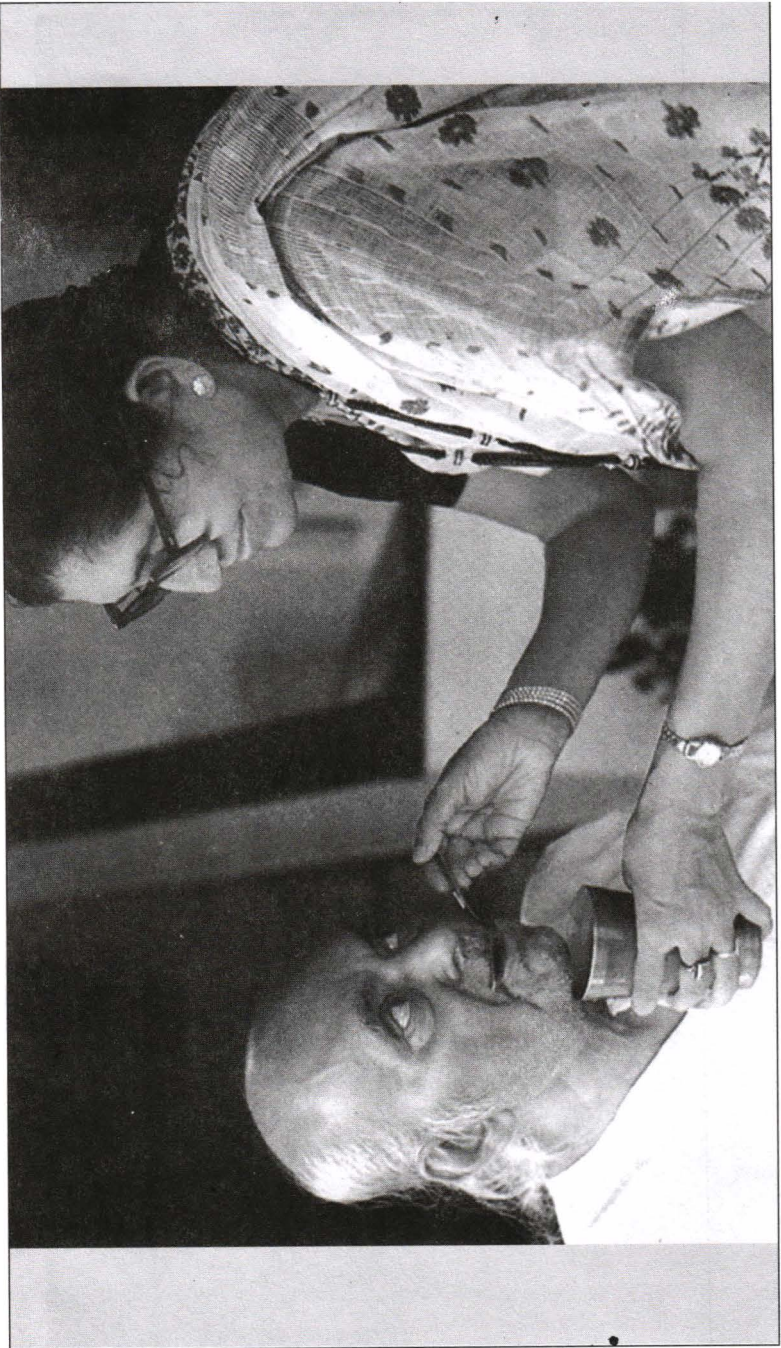
কবিকে খাওয়াচ্ছেন রেণু ভৌমিক

১৯৬১ সালে কলকাতায় কবির বাসভবনে নজরুল, সব্যসাচী, হুসনাবানু খানম (সঙ্গীত পরিবেশন রত), আসাদুল হক (তবলা সঙ্গতে), ফতেহ লোহানী (চলচ্চিত্র অভিনেতা) এবং প্রখ্যাত সুরকার আবদুল আহাদ। সৌজন্যে - আসাদুল হক

কলকাতায় দুই কবি : নজরুল ও গোলাম মোস্তফা

রোগশয্যায় নজরুল

সুরসুনার প্রতিভা গ্রন্থাগারের খাতায় লেখা নজরুলের কবিতা

স্নিগ্ধ-শ্যামা সাজে গ্রামের নিভৃত একান্তরে —
পাখী যেথায় সুরের সাথে আলাপ করে ডেকে
সূর্য-কিরণ গহন নীলে গাহন করি যথা
কোমল হয়ে এসে পড়ে, শুদ্ধ যথায় কথায়, —
জ্ঞান-সাধকের সেই তপোবন, সেই তো তীর্থ-ভূমি,
কুসুম সম ফোটে হেথায় দেউল-চূড়া চুমি।
বাহিরে চলে কোলাহলের বিরাট কর্মশালা;
শুভ্র-শান্তি আকাশ যেথায় নীল অমিয়-ঢালা;
নিত্য সুধা পিয়ে যেথা জ্ঞানের জ্যোতিকণে,
হেথায় বসে নীরব সাধক একমনা একমনে।
হেথায় বসে গোপনে সে আঁধার প্রাণের বাতি
আপনাকে সে ক্ষয় করি তার জ্বালায় দীপ সারা রাতি
আপন মস্তিষ্ক [illegible] বিপুল এদের দান
এরাই করে মানুষেরে মহান মহীয়ান।
সুন্দর হোক সার্থক হোক এই জ্ঞান-সাধনা,
আসুক হেথা যাত্রী শত জুড়াতে জ্ঞান-ক্ষুধা।
বন্দীর আশীষ ঝরুক হেথা সহস্র কিরণে,
জাগুক ইহার সঙ্গে সবাই নবীন জাগরণে।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৪ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৪০

১৯৩৪ সালে কলকাতার নিকটস্থ ২৪ পরগনার সুরসুনা গ্রামের প্রতিভা গ্রন্থাগার পরিদর্শনকালে কবি গ্রন্থাগারের খাতায় উপরোক্ত কবিতাটি লিখে দেন।

নজরুলের লেখনীতে প্রতিভা লাইব্রেরী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

"সুরসুনা প্রতিভা লাইব্রেরী" পরিদর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করে ধন্য হলাম। এ যেন শ্যাম তপোবনের তীর্থলোক। পল্লীর পাঠাগারে একসাথে এত ইংরিজি ও বাঙলা বইয়ের সমাবেশ খুব বিরল। এই জ্ঞান-দেউলের চেয়েও মহত্তর এর পূজারীরা। এঁদের সত্যকার জ্ঞান অর্জনের তৃষ্ণা আছে, তপস্যা আছে। বিরাট-প্রাণ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তাঁর অর্থে এই বাণী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করে শুধু পুণ্য সঞ্চয় না, অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। বহু লোকের মনে জ্ঞানের চির-জ্যোতির আলো দানের ত্যাগ স্বীকার করে তিনি যে মানুষত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাও তাঁর নাম বাণী-পূজারীদের কাছে শাশ্বত হয়ে থাকবে।

বাণী-পূজার আয়োজন আড়ম্বর শূন্য, নীরবে সাধকে হন এঁর পূজারীরা; মন্ত্রের ঐশ্বর্যই এঁদের তাই সম্বল; তবু মানুষকে মানুষরূপে দাঁড় করাবার সাধনা এঁদেরই।

প্রার্থনা করি, এঁদের জ্ঞানের তৃষা, আলোর পিপাসা, এই নীরব তপস্যা পূর্ণতর হউক। এই জ্ঞান-তীর্থে আরো শত শত তীর্থ-পথিক এসে ভিড় করুক। এই মন্দির আরো [illegible] হউক। — কাজী নজরুল ইসলাম

১৯৩৪ সালে কলকাতার নিকটস্থ ২৪ পরগনার সুরসুনা গ্রামের প্রতিভা গ্রন্থাগার পরিদর্শন কালে কবি গ্রন্থাগারের খাতায় উপরোক্ত শুভেচ্ছাবাণী লিখে দিয়েছিলেন। কোনো পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থে অপ্রকাশিত কবিতাটি ও শুভেচ্ছাবাণীটি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী জনাব জিয়াদ আলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। তিনি চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর সাথে সম্পৃক্ত।

ہے ستار - اے غفار - کر دے بیڑا پار
دریا پہاڑ جنگل - کرتے ہیں روز منگل
زمیں و آسماں کے ذرے ذرے کا عقیدہ ہے
تو ہے پالن ہار - تو ہے کھیون ہار - تو جو ہے کرتار - اے ستار
روزی دنیا کا کام ہے تیرا - سب سے اعلیٰ نام ہے تیرا
تو رحمٰن ہے - ذی شان ہے - سلطان ہے - اے ستار
درد دل تیرے سوا آہ سنائیں کس کو - میرا آقا ہے مرا خالق مرا معبود ہے تو
ہے ستار - اے غفار

অগ্রন্থিত কবিতা

১

ভগ্নস্তূপ

(ঐ) গাঁয়ের দখিনে দাঁড়ায়ে কে তুমি যুগ যুগ ধরি একা গো?
তোমার বুকে ও কিসের মলিন রেখা গো?
এ কোন্ দেশের ভগ্নাবশেষ?
কোন্ দিদিমার কাহিনীর দেশ?
যায় অতীতের আবছায়াটুকু পাষাণেরি গায় দেখা গো
তোমারি উরসে কোন্ চিতোরের চিতার ভস্মরেখা গো?

(ওগো) কে তুমি আমার পল্লিমায়ের দুখেরি কাহিনি কহিছ?
নীরব নিঝুম গভীর ব্যথাটি বহিছ?
মাতা নাকি ছিল রাজার দুলালি,
আজ অনাথিনী পথের কাঙালি,
স্মৃতির আগুন বুকে চাপি বুঝি ধিকিধিকি তাই দহিছ?
শত বরষের পুঞ্জিত জ্বালা বুক পেতে নিজে সহিছ।

(বুঝি) বক্ষে শোভিত 'নৌ-রতন' আর অগণিত শত 'বিহার'ই,
ছিল বুঝি রাজ-কেয়ারিটি পাশে ইহারই—
আঁকড়ের ঝোপ এখন তথায়
ঘিরেছে 'বোয়ান' 'আলগ্ লতায়'—
ফুটে ঝাড়খেত যথায় নিযুত, সুরভি ফুলের ঝিয়ারি,
বুক বেয়ে তার বেয়ে বেয়ে যেত পতি সাথে রাজ-পিয়ারি।

(বুঝি) তোমারে ঘিরিয়া করিত সোহাগ নহর, লহর নাচিত,
বাঁধা ঘাটে তার বধূর বাউটি বাজিত!
কোথা সে নহর? আঁধার গহর,
জানায় সে-কথা আটটি পহর,
শাখে কাক ডাকে, গাগরিটি কাঁখে চমকে বউটি আসিত,
সভয়ে কৃষক দেখায় আজিকে গড়ে আলেয়ার বাজিত।

(ওগো) তোমারি শিয়রে এখনো জাগিয়া বিশাল শিমুল গাছটি,
সব গেছে শুধু সেই তো ছাড়েনি কাছটি।
এখনো নিশীথে কে তার শাখায়
আকুল কাঁদনে গ্রামটি কাঁপায়,
স্বপনেরি ঘোরে চমকিয়া ওঠে মায়ের কোলের বাছটি,
কেউ জানে না রে কত যুগ ধরে শিয়রে গাছটি !

(বুঝি) একদিন ছিল লোক-মুখরিত বিরাট বিশাল নগরী,
(ছিল) খোশ্‌বাগ-ভরা কত যূথি আর টগরই
মর্ম্মর-বেদি তার মাঝে কত,
হর্ম্মশোভিত রাজপথে শত,
বিলাস-বিতানে বেড়াত যুবতী এলায়ে অলস কবরী
বধূ অজয়ের ঘাটে যেত ওগো নিয়ে কাঁখে তার গাগরি।

(ওগো) যে বর্গির নামে আজো সাধ জাগে হতে মার কোলে ছেলে রে,
(তারা) আঁধিয়ার রেতে ঘর-দোর দিল জ্বেলে রে !
হটিয়া আসিল রাজার সেপাই,
যত্ন সে বর্গি ঘিরে গড়খাই,
কচি শিশুটিরে মার কোল কেড়ে কাটে তায় অবহেলে রে,
জীয়ন্ বাঁধিয়া পুরবাসী সব, চিতা জ্বেলে দেয় ফেলে রে।

(ওগো) পোড়া ঝাউগুলি ছড়ানো রয়েছে আজ সারা গ্রাম ব্যাপিয়া,
উড়েছে কোথায় কপোত দোয়েল পাপিয়া !
ঝরে গেঁয়ো রাজারি চিতায়
শিশির-অশ্রু-মাখানো কি তায় ?
আঁকড় শিমুল ভোরে জাগি দেয় ফুলে সমাধিটি ঝাঁপিয়া,
ভেসে আসে কার মৃদু হাহাকার নৈশ সমীরে কাঁপিয়া।

(আজি) পল্লির পথে রাজারি কুঙারী, চোখে আসে জল ভরি, মা !
তবু নত শিরে আজ পায় গড় করি, মা !
উদাসী পবন ধীরে বয়ে যায়,
অতীতের স্মৃতি পরানে জাগায়,
তোরি শোকে পড়ে নিশির শিশির ঝর্‌ঝর্‌ঝর্ ঝরি, মা !
চোখে আসে জল নেহারি মা তোর আজ পূত গত গরিমা।

২

চড়ুই পাখির ছানা

মস্ত বড় দালান–বাড়ির উই–লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট্ট একটি চড়াই–ছানা কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছে মা'কে।
'চুঁ চা' রবে আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন–বায়ে,
মায়ের পরান ভাবলে—বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছা–য়ে।
অম্‌নি কাছের মাঠটি হতে ছুটল মাতা ফড়িং মুখে,
স্নেহের আকুল আশিস–জোয়ার উথ্‌লে ওঠে মা'র সে বুকে।
আধ–ফুরফুরে ছাটি নীড়ে দেখছে মা তার আসছে উড়ে,
ভাবলে আমি যাই না ছুটে, বসি গে' মা'র বক্ষ জুড়ে।
হৃদয়–আবেগ রুধতে নেরে উড়তে গেল অবোধ পাখি,
ঝুপ করে সে গেল পড়ে—ঝরল মায়ের করুণ আঁখি !
হায়রে মায়ের স্নেহের হিয়া বিষম ব্যথায় উঠল কেঁপে,
রাখলে নাকো প্রাণের মায়া, বসল ডানায় ছাটি ঝেঁপে।
ধরতে ছোটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে ;
ছুটছে পাখি প্রাণের ভয়ে ছোট্ট দুইটি ডানা মেলে।
বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন,
বুঝে না কেউ ক্লাসের ছেলে—মায়ের সে যে বুকভরা ধন !
পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে
একটি ছেলে দেখছে, আঁসু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।
মা মরেছে বহুদিন তার, ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ,
তবু গো তা মরম ছিঁড়ে উঠল বেজে করুণ বেহাগ।
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে,
ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশিস পরান খুলে।
অবাক–নয়ান মা'টি তাহার রইল চেয়ে পাঁচুর পানে,
হৃদয়–ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
পাখির মায়ের নীরব আশিস যে ধারাটি দিল ঢেলে,
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে !*

---

* শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে, কবি যখন রানিগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ–স্কুলের ছাত্র, তখন এই কবিতাটি রচনা করেন। —সম্পাদক

৩

করুণ গাথা

নয়ন গলিয়া বয় তপ্ত অশ্রুনীর,
অশ্রু নয়, সে যে ভগ্ন-মরম-রুধির।
নয় গো চোখের দেখা হৃদয়ে হৃদয়ে আঁকা
ভিজায়ে সেনেহ-ক্ষীরে তুষিত সোহাগভরে
ভকতি উথলি চিত করিত অধীর
মিহির-কিরণে ওগো শুষিল শিশির।

জলদি শুকায়ে যাও অনিল বয়ো না,
বসিয়া তমাল ডালে পাপিয়া গেয়ো না।
নিঝুম নিঝুম সব, থেমে যাক কলরব,
থামুক শিশুর হাসি, গোলোকে বেজো না বাঁশি,
সেনেহ মমতা আর ধরায় রয়ো না।
অপত্য পিতার কোলে যেয়ো না যেয়ো না।

রুদ্ধ বেদনা গো ছুটিছে মথিয়া হিয়া
কাঁদিতে জনম, মোরা কাটাব কাঁদিয়া।
সন্তানে ফেলিয়া পিতা, কখন যায় কি কোথা?
দিব না দিব না যেতে, কাঁদিয়া দাঁড়াব পথে;
দেখিব কেমনে যায় মোদের ঠেলিয়া;
হৃদয় বিদীর্ণ হও মরম চাপিয়া।

ললাটে লিখনবিধি এত কি কঠোর,
নিমেষে ছিঁড়িয়া ফেলে দৃঢ় স্নেহ-ডোর!
কল্পিয়া কতই আশা, বাঁধিনু সুখের বাসা,
সহসা বহিল বায়, কোথায় উড়িয়া যায়,
সে বাসা; নিরাশা শুধু হেরি এবে ঘোর।
সাধ না মিটিতে হলো সুখনিশি ভোর।

এতই উদার তুমি তরুণ বয়সে,
হৃদয় গলিয়া যেত মমতা পরশে।
সুধীকূল শিরোমণি, সেনেহ হীরক-খনি,
অটল করম-ক্ষেত্রে করুণা খেলিছে নেত্রে,

কর্তব্য সাধনে ধীর বীর সু-সাহসে ; —
ভোলানাথ ! যেয়ো না গো ত্যজি এ কৈলাসে।

সকলি ভুলিব কালে, রহিবে কীরিতি,
তোমার মহিমা গাথা গাউক ভারতী !
ধাও গো উন্নতি পথে চড়িয়া কীরিতি-রথে,
বরষি বিমল যশ ধরার কলুষ নাশ,
হও গো আঁধারে চির ইরম্মদ-জ্যোতি—
তোমার রুচির বাসে মাতুক এ-ক্ষিতি।

লাবণ্য শুকাল আজ সকলি ফুরাল,—
মঞ্জু-কুঞ্জবনে কলি ঝরিয়া পড়িল।
আড়ালে লুকাল চাঁদ, ধৈরয ভাঙিল বাঁধ,
থামিল সাগর জল, উড়ে গেল পরিমল ;
ক্ষণপ্রভা হেসে ঐ কোথায় লুকাল।
সাধ না মিটিল হায়, আশা না পুরিল।

মধুর স্বপন ভাঙি স্তব্ধ নিশীথে
করুণ বিলাপ গান গাহিল বাঁশিতে—
উঠ রে বালকদল মুছিয়া আঁখির জল
করে নে বরণ-ডালা দে গলে পরিয়ে মালা
চরণ ঢাকিয়ে দে রে প্রসূনরাশিতে ;
পাবি না আর যে কভু এ ভালোবাসিতে।*

৪

করুণ বেহাগ

(ওগো) বিদায়-বেদনা-বিজড়িত এই সেদিনের সেই স্মৃতি
না মুছিতে হায় পুন জেগে ওঠে—জেগে জেগে ওঠে নিতি।

---

* সিয়ারসোল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু ভোলানাথ স্বর্ণকার বি.এ. মহাশয়ের বিদায়-উপলক্ষে ১৯১৬ সালের ১৩ই জুলাই এই অভিনন্দন-পত্র পড়া হয়। তখন নজরুল ইসলাম উক্ত স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। —সম্পাদক

মূরছি মূরছি সেই মূর্ছনা—বিনায়ে করুণ সুরে,
হৃদি নিঙাড়িয়া রক্ত-অশ্রু বক্ষ বহিয়া ঝরে !
কিশোর দীর্ণ ভাঙা পঞ্জরে লুকাল জিয়ারি ক্ষীণ
শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠিছে গো আজি, কাঁপিছে মর্মবীণ !
থামে না, হৃদি-স্পন্দন ঘন দু'হাতে বক্ষ চাপি,
আকুলিবিকুলি দুরুদুরু ওগো থরথর ওঠে কাঁপি।

আজো সেদিনের করুণ গভীর রাগিণীটি বাজে বুকে,
ওই অনুলোমে বিলোবে গো তবে উতল বাতাস মুখে।
ভেসে আসে কার ভগ্নবীণার চূর্ণ বিলাপ-গান?
কর্ণে পশিয়া মরম ছুঁইয়া আকুল করে গো প্রাণ !
মেশে নাই আজও (কাঁদিও না আর কাঁদায়ো না) ভাঙা গীতি,
বিদায়-বেদনা-বিজড়িত এই সেদিনের সেই স্মৃতি।

(আজি) ছাড়ি যান একজন,
ভাইরে বড়ই স্নেহের সে গুরু, বড় যতনের ধন !
আকাশের মতো উদার হৃদয় রাখি-পূর্ণিমা রাতে,
তারকার মতো অমনি অযুত গুণ যুথ ফোটা তাতে।
ঋষি-নিন্দিত সুন্দর মুখে স্নেহ-বিজড়িত হাস,
যূথির চেয়েও দিঠিটা পেলব, বোল বোল সম ভাষ !
কুঞ্চিত কালো কেশ আধ-ঢাকা কুঞ্চিত জোড়া ভুরু,
চাঁদিমা-শুভ্র স্নিগ্ধ-কান্তি, পারুল চেয়েও চারু !
রুচির এ-সব স্মৃতির প্রীতি ! যেয়ো না ভুলায়ে চলি,
পারিবে কি যেতে স্নেহের অযুত বাহু-বন্ধন খুলি?
যাও যদি ওগো লঙ্ঘিতে হবে শিশুর আঁসুর স্রোত,
পারিবে কি? তবে যাও দেব, আর রুখিব না তব পথ !

বক্ষ চিরিয়া রুধির-রক্ত কলিজা টানিয়া মুখে
দাঁড়াই যদি গো পথ আগুলিয়া, চাপি অঞ্চল চোখে,
চলে যেতে পারো? চলে যাও, দেব ! কিছু বলিব না আর,
হাসিতে হাসিতে ঢেলে দেব শিরে প্রাণের অর্ঘ্যভার !

বনফুলহার দেবতার গলে সাজিবে না ওগো ভালো,
আনিয়াছি তাই মন-ফুলে ছোট সাজিখানি করি আলো।
কি দিব গো আর, কি দেবার আছে, আমরা বড়ই দীন,
বিনা এ হৃদির করুণ গভীর আসার-বিন্দু তিন !

একটি মিনতি, নূতনের মাঝে ভুলি চির পুরাতন
দিয়ো নাকো ব্যথা দরদের বুকে ! বিশেষ আকিঞ্চন !

নে ভাই চক্ষে বসন চাপিয়া, অথবা উপাড়ি দে,
চলে যান আজি মোদের একটি শ্রেষ্ঠ গুরু যে রে !
নে ভাই চক্ষে বসন চাপিয়া অথবা উপাড়ি দে ! !*

৫

কবিতা-সমাধি

পরিশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম, সারা নিশি জেগে
ভাব-শিরে মুহুর্মুহু লাঠ্যাঘাতি রেগে
সে কি লেখা লিখিলাম মহা মহা পদ্য,
অক্ষর একুন করি যোজিলাম চৌদ্দ।

মৃচ্ছকটিক আর শব্দসার ভ্রমি
আনিলাম কাব্য এক শব্দকল্পদ্রুমি !
রচিলাম কি বিকট শব্দ বাছি বাছি,
জাহাজে বেঁধেছে যেন শত শক্ত কাছি।
কবিদের ভাব সব 'না-বলিয়া-নিয়া'
সাহিত্য আসরে এনু গুম্ফ আস্ফালিয়া !
এ লেখা কি ব্যর্থ হয়। তবে নাম মিছে !
'বাঃ ভাই'—বন্ধুরা কয় দন্ত-সঙ্ঘ খিচে।

চাটু বাক্যে লুব্ধ হয়ে কবিতারাশিকে
পাঠালাম ছোট বড় সকল মাসিকে।
সম্পাদক অভদ্র সে না দেয় উত্তর ;
বিষম রুখিয়া শেষে লিখিনু, 'দুত্তোর !
টিকিট খেয়েছে মম,—যেতে দাও ; এবে
হে ভদ্র, কবিতাগুলি ফিরিয়ে কি দেবে ?'

---

* সিয়ারসোল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর মিশ্র বি.এ. মহাশয়ের বিদায় উপলক্ষে কবি এই কবিতাটি তাঁহার ছাত্র-বয়সে রচনা করেন। —সম্পাদক

শেষে সে সহস্র-পত্র লেখার দরুন
'রিপ্লাই' আসিল ওহো, ভীষণ করুণ !
'অবশ্য, কিছুও তার পাই যদি ঘেঁটে
কবিতা-সমাধি-পূত পেপার-বাস্কেটে ! !'

৬

অবেলায়

এক

অবেলায়—
অবেলায় প্রিয়তম এ যে অবেলায় !
তেয়াগিয়া বালিকার শরম (ভরম) সব লাজ
খুলে দিলে হৃদয়ের চির-রুদ্ধ দ্বার যবে আজ,
সংকোচের নিষ্ঠুরতা দলি দুটি পায়
আত্মপ্রকাশিলে এসে দীপ্ত গরিমায়,—
মরমের কথা
চাপা ব্যাকুলতা
স্রোত হয়ে বয়ে গেল ক্ষিপ্ত বেদনায়,—
অবেলায়—
অবেলায় প্রিয়তম এ যে অবেলায়।

দুই

দুনিয়ার বিষ-মাখা শত তীক্ষ্ণ তীর
কলিজা করেছে চৌচির,
নীল হয়ে গেছে সারা বুকের রুধির,—
বেদনার অবিশ্রান্ত ঘায়ে
সোনার দেউল গেছে চুরমার হয়ে,—
তবুও একাটি এই জীবনের তীরে
রাখিয়াছি প্রাণপণে সারা বক্ষ ঘিরে
তোমারে সে নিবেদিত মম অর্ঘ্য-ডালি,
ওগো দেবি, আজো শুধু পূত অশ্রু ঢালি !
সে ব্যথা কি এতদিনে বেজেছে হিয়ায় ?

কেন এলে পথে পুন জীবন–সন্ধ্যায় ?
অবেলায়—
অবেলায় প্রিয়তম এ যে অবেলায় !

তিন

মনে পড়ে যৌবনের পশরাটি শিরে
যখন আসিতেছিনু নিরাশায় ফিরে,—
অজয়ের কূলে
কি জানি কেমনে দুটো গুলঞ্চের ফুলে
সব গেনু ভুলে !
বিনা–মূলে
শত সাধনার সেই হিয়াখানি মম
বিকানু তোমার পায়ে, ওগো প্রিয়তম !
লাজ–মৌন তুমি
মাথা নত করে ছিলে বনলতা চুমি,—
তারপর ?
তারপরে, হায়।
তুমি কোথা ভেসে গেলে, আমি বা কোথায় !
আজো সেই প্রশ্ন জাগে, 'কোথায় ? কোথায় ?'
মাঝ–পথে কোথা হতে এসে
'আসিয়াছি' বলি প্রিয় ডাক দাও হেসে,—
ছি ছি হাসি যাবে পুন আঁখি–নীরে ভেসে
ঐ শোনো ডাক যত বন–লতিকায়,—
অবেলায়—
অবেলায় প্রিয়তম এ যে অবেলায় !

চার

মনে পড়ে, অদেখার কত সে বরষ,
স্বপনের ব্যথা–ভরা কত সে হরষ,
স্বপ্ন–অবসানে পুন সারা বিশ্ব জুড়ে
সে কি কান্না ব্যর্থতার মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে—
আজ প্রিয় সব মনে পড়ে।
তারপর !
তারপর মূঢ় এক শান্তি এল নেমে,—
প্রিয়তম, আজ সব চাওয়া গেছে থেমে।

বেদনার মাঝে সুপ্ত আনন্দের রেখা
আজি এ শেষের দিনে দিয়াছে সে জ্যোতি হয়ে দেখা।
কোথা ছিল এত আলো এত আঁধিয়ায়?
আর কেন দেবি ঐ ডাক শোনা যায়
সব-ভালো দেশ হতে 'আয় আয় আয়!'
(মম) একা পথে একা সুর এক বাজি যায়—
অবেলায়—
অবেলায় প্রিয়তম এ যে অবেলায়!

'সাধনা'
কার্তিক ১৩২৭

৭

কবির চাওয়া

এমন করে কবির চোখের গভীর চাওয়া দিয়া
তোমায় এমন সুন্দর করি কেউ দেখেনি, প্রিয়া!
পূজারী সে অনেক তোমার, জানি,
তব চরণ-তলে অর্ঘ্য দানে আনি;
তোমায় ভালো তারা কেউ বাসেনি, রানি,
এমন আমার মতন হিয়ায় চাপি হিয়া।

বলতে পারো সখি
এমন করে কবির বাণীর গভীর সোহাগ দিয়া
তোমায় এমন মিষ্টি করে কেউ ডেকেছে প্রিয়া!
ওরা যতই কেন সুন্দর হোক সই,
তোমায় যতই কেন বাসুক তারা ভালো,—
ওদের আমার মতন প্রেম-পিয়াসী কবির আঁখি কই?
তোমার রূপ যে ওরা দেখবে ওদের কই সে প্রাণের আলো?
এমন জেনেও তোমায় নেইকো পাবার আশা
ওদের বাসে কি কেউ সত্যি ভালোবাসা?
ওগো তারা যে চায় সুধা তোমার, আমি সর্বনাশা
চাইনে সুধা, মরণ মাগি গরলটুকুই পিয়া!

সেকি পড়বে সেদিন মনে
এমন করে কবির বুকের নিবিড় পরশ দিয়া
তোমায় এমন গভীর করে কেউ চুমেনি, প্রিয়া !
ওরা যতই বলুক 'ভালোবাসি', কেউ বাসে না ভালো ;
ওদের শুধু চোখের নেশা, দেহের ক্ষুধা, জানি !
যদি একটুখানি প্রাণের তোমার দীপশিখাটি জ্বালো,
রানি দেখবে ওদের বুকের তলায় প্রেম সে কতখানি !
ওদের ঘরেই সুধা, যায়নি ক্ষুধা তবু,
ওরা ভালো কি হায়, বাস্‌তে পারে কভু ?
হে মোর প্রেমের গরবিনী, বাঁধন-হারার প্রভু !

লো বালিকা বিজয়িনী ! গর্ব তোমার শুধু
এই পলাতক পথিক কবির রথটি কাড়ি নিয়া
ঐ মিষ্টি তোমার চঞ্চলতা দুষ্টুমিটি দিয়া।
সত্য করে কও দেখি মোর প্রিয়তমা,
কোন্ চির-জয়ী এমন করে রিক্ত করি হিয়া
শুধু তোমার দ্বারেই দাঁড়িয়ে হাতে ভিক্ষা-পাত্র নিয়া ?

এমন করে কবির চোখের গভীর চাওয়া দিয়া
তোমায় এমন সুন্দর করি কেউ দেখেনি প্রিয়া !

'সাধনা'
ভাদ্র ১৩২৮

৮

ফুল-ছড়ি

গোলাপ-কুঁড়ির ডাক শুনেছে আজ বঝি বুলবুল,
তাই তো এত গুনগুনানি সব কাজই ভুল ভুল !
হুর-কুমারীর খত্ পেয়েছে আজ বুঝি বুলবুল।।

পরীস্থানের কোন্ পরী
কোন্ সে কোকাফ্-সুন্দরী
চোখ-ইশারায় ডাক দিল তাই মন করে চুলবুল,

খোশ-খুমারে সুর্মা-ডাগর চোখ করে ঢুলঢুল।
ভোরের বাঁশির সুর শুনেছে ওই খ্যাপা বুলবুল॥

মন ছুটে যায় আসমানে,
আজ তা কি আর রাশ মানে?
লাল পরীকে আনতে দুল্‌হার ছুটেছে দুলদুল,
উড়ছে আতর, পুড়ছে দেদার ধূপ-ধুনো গুগ্‌গুল;
বেহেশ্‌তি খত্‌ পেয়ে সারা দুনিয়াটা মশগুল॥

সওদা খুশির আজকে ভাই,
বাৎ বেহুদা কইতে নাই;
একটা কথা, কওসর এ ভাই নয় শুধু বিলকুল,—
কাদাও লাগে, কাঁটাও ফোটে তুলতে কমল-ফুল—
কাছকে ছেড়ে দূরকে চাওয়া সেই সে সেরেফ্‌ ভুল॥

আস্‌লে ব্যথা চোখের জল
তাকেই করো শোকের বল,
মন দিয়ে মন পাও যদি সেই সাতশো রাজার তুল।
কাছকে ছেড়ে দূরকে চাওয়া সেই সে সেরেফ্‌ ভুল॥

এই অজানার এই যে হাত
আনতে পারে আবে-হায়াত,
এ হাত ধরেই তরবে জীবন পুল-সেরাতের পুল।
ভয় কি তবে বাজাও বগল, আমরা ছড়াই ফুল॥

৯

কালোর উকিল

কালো 'আমি'র কনে হলো সুন্দরী এক মেয়ে,
রঙটি গো তার হিঙুলবরণ দুধে-আলতার চেয়ে।
তাই না দেখে বৌদিদিরা বললে সেদিন হেসে,
'পাকা দাড়িম করলে চুরি দাঁড়কাকে এক এসে।'
কইনু আমি বৌদিদিদের,—'এ তোমাদের ভুল,
তার চেয়ে কও গোলাপ-কলি তুলেছে বুলবুল।'

'শালাজ'রা কন, 'না—না, এ ঠিক টিকের মুখে আগুন !'
চাষাদের বৌ কয়, 'আহা, এ বানরের হাতে বাগুন !'
প্রিয়া আমার কইলেন, 'বেশ, ভোমরাও তো কালো।'
কোকিল কালো, কাজল কালো, কালো সবই ভালো
এই না শুনে কূজন ধরে অহম্ কালো কোকিল,
চুম্বনেরি 'ফি' দিয়ে তাঁয় কইলে, 'সাবাস উকিল !'

১০

বকুল

আকুল বকুল ! মুকুল টুটে ফুটলি কেন তুই ?
তার চেয়ে যে অনেক বড়—অনেক ভালো জুঁই !
খুলল কে তোর পাপড়ি রে,
কুঁড়ির 'নাজুক' খাপ চিরে ?
কে গেল তোর বুকের বসন এমনি করে ছুঁই ?
হায়, ছড়িয়ে দিলি ছোট্ট বুকের সকল রঙটুকুই !
বাঁশের বাঁশি কোন্ জনার
করল তোরে উন্মনা ?
মাঠের গানের সকল সুরে ঝর্‌লে পরাগ-লুই।
ও ফুল, পল্লিমাঠের কোন্ বেদনের রেশ্ যাবি তুই থুই ?
জল-ভরা এই বর্ষাতে
হায় কারে সে তর্‌সাতে
পল্লি হতে আনবি বয়ে অশ্রু গোটা দুই,
আর, চোখের জলে ভিজিয়ে দিবি রাজবাগানের ভুঁই।
পরীস্তানের খোশ্‌বাগে
খোশবু লাখো গুল জাগে,—
কোন্ সাহসে ফুটলি সেথা ছোট্ট বকুল তুই ?
ওরে স্থান পাবে কি জলসাতে তোর একজেরা খোশ্‌বুই ?
নাই নিল তোর খোশবুরে
হুর-পরীরা বুক ভরে,
ভোরে ঝরে দিস্ রে ঝেঁপে রাজকেয়ারির ভুঁই,
আর, যাবে পথিক বুক বেয়ে তোর পরশ নিবি তুই।
ও ভাই, ছোটর এতে সার্থকতা,—এই বেদনটুকুই।

১১

আজান

অকাজের সে-কাজের মাঝে ডুবে যখন থাকি,
ভাবি নাকো কি যে ছিলুম, আবার হবোই বা কি।
শুধু মোহ চোখের কালো মায়ারই জাল বুনে,
কাঁচা বুকের 'খুন' পিয়ে নেয় বিষাক্ত কাম-ঘুণে।
বুঝেও বুঝি নাকো এ যে এক এক পা করে
পলে পলে গোরের দিকেই যাচ্ছি ক্রমে সরে।
শুনি তখন আজানের কি বজ্র-গভীর স্বর—
'আল্লাহু আকবর'—'আল্লাহু আকবর !'

বুঝি আর সে নাই-বা বুঝি, তবু প্রাণের মাঝে
চঞ্চল সে গুম্‌রে মরে কী আকুলতা যে !
অবুঝ হিয়ায় উদাস-করা কি জানে এ ডাক,
প্রাণের মাঝে ফাঁকা বেদন খায় শুধু ঘুরপাক !
কি সে বেদন প্রাণই জানে, কইতে কিছু নারি,—
তবু বিয়োগ-ব্যথায় কিসের মন হয় হায় ভারি !
ছেড়ে যেতে হবে রে হায় এ-বিশ্ব সুন্দর,
'আল্লাহু আকবর' ঐ শোনো—'আল্লাহু আকবর !'
ওগো পাগল-উদাস-করা পবিত্র আহ্বান,
কেমন করে ভক্তি-ক্ষীরে ডুবিয়ে দাও জান্‌ !
বক্ষে কিসে পাগল-ঝোরার উজান বয়ে যায়,
ভোরবেলাকার আবছায়া আর সাঁঝের ম্লানিমায় ;
দুপুরবেলার রোদ আর বৈকালের পূরবীয়
রাতের ডাকে ছড়াও বিশ্ব কতই সুরভিই !
মাটির মানুষ প্রভুর কাজে পাছে করি হেলা,
তাইতো তুমি ডেকে ডেকে জাগাও পাঁচই বেলা।

তোমার ডাকে একটি বেলা না দিলে যে সায়,
বক্ষ বিঁধে অনুতাপের তীক্ষ্ণ ছুরিকায় !
তুমি আছ 'ইসলাম' তাই তেমনি আজো জেগে,
ডুবেনিকো অবহেলার ঘোর ঝাপ্‌টা লেগে।
ওগো পূত ! ওগো গভীর ! ওগো উদাস ডাক !
ওগো আজান ! তোমার বিষাণ বিশ্বে বেজে যাক—

যতদিন না ইসরাফিলের প্রলয়-বিষাণ বাজে,
এম্‌নি করে ব্যাকুল স্বরে দিন-দুনিয়ার মাঝে।

১২
লাল সালাম

বাস্ রে বাস
কোন্ উদাস
উঠল আজ
মোদের মাঝ।
আজ নূতন
উদ্বোধন
বীণ্-পাণির
সুর-বাণীর।
দুব্-ঘাসে
কোন্ হাসে ?
নারকেলের
পত্রে ফের
বয় বাতাস,
চায় আকাশ।
জারুল ফুল
পারুল ফুল
ফুটল রে,
আসল কে ?
এই মাঠে
এই নাটে
কোন্ পরী
পাঁচ-নোরি
বাজিয়ে যায়
চমকে চায় ?
আজ মোদের
মুখ-চোখের
ভাব হাসি
নেয় আসি

ঐ অথির
ভোর-সমীর।
আজ কাঁঠাল
ভরল ডাল।

বাহ্বা কি
সব পাখি
গাচ্ছে গীত
ভাব-মোহিত।

বুলবুলি
বিল্‌কুলি
সুর-মগন
আজ লগন
কার বিয়ের?
কার ঝিয়ের?
সোনার ফুল
তাই আকুল
ঐ তো বোন
হল্‌দে কোণ
তার শাড়ি
যায় নাড়ি।
তার চোখের
অশ্রু ঢের
মন-পাতায়
টল্‌মলায়।

শোন্‌রে শোন্‌
আজকে কোন্‌
মন-মোহন
এই মিলন।
আজকে কোন্‌
সাবাস জন
লুট্‌বে তার
পুরস্কার—

গুণ আদর
আর কদর।
সাবাস ভাই
এই তো চাই,
হর বছর
এম্‌নি জোর
নেবই সই
কাপড় বই।

বাহ্‌বা রে
আজ কারে
মিলন বই
বল্‌ল সই !
লক্ষ্মী ভাই
হওয়াই চাই,
নইলে ছাই
মিলবে নাই ;
গুরুজনে
সদা মনে
ভক্তি চাই,
নইলে ভাই
সুখ সে নাই
কোনোই ঠাঁই।
এই সভায়
আজ সবায়
কর প্রণাম
লাল সালাম।
বাহবা কি
আজ খুশি !
এম্‌নি জোর
সব বছর
চাই হাসি
আর খুশি।
আজকে তবে বিদায় ভাই,
লক্ষ্মী মেয়ে হও সবাই।

১৩
আনন্দময়ীর আগমনে

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,—আসবি কখন সর্বনাশী?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?

বিষ্ণু নিজে বন্দি আজি ছয়-বছরি ফন্দি-কারায়,
চক্র তাহার চরকা বুঝি ভণ্ড-হাতে শক্তি হারায়!
মহেশ্বর আজ সিন্ধুতীরে যোগাসনে মগ্ন ধ্যানে,
অরবিন্দ চিত্ত তাহার ফুটবে কখন কে সে জানে!
সদ্য অসুর-গ্রাসচ্যুত ব্রহ্মা-চিত্তরঞ্জনে, হায়,
কমণ্ডলুর শান্তি-বারি সিঞ্চি যেন চাঁদ নদীয়ায়।
শান্তি শুনে তিক্ত এ-মন কাঁদছে আরো ক্ষিপ্ত রবে,
মরার দেশের মড়া-শান্তি সে তো আছেই, কাজ কি তবে?
শান্তি কোথায়? শান্তি কোথায় কেউ জানি না
মাগো তোর ঐ দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্তি বিনা!

দেব্‌তারা আর জ্যোতিহারা, ধ্রুব তাঁদের যায় না জানা,
কেউ বা দেব-অন্ধ মাগো, কেউ বা ভয়ে দিনে কানা।
সুরেন্দ্র আজ মন্ত্রণা দেন দানব-রাজার অত্যাচারে,
দম্ভ তাঁহার দম্ভোলি ভীম বিকিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজারে।
রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে,
সে কর শুধু পশল না মা অন্ধ কারার বন্ধ ঘরে।
গগন-পথে রবি-রথের সাত সারথি হাঁকায় ঘোড়া,
মর্তে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া।

বারি-ইন্দ্র বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়,
বুড়িগঙ্গার পুলিন বুকে বাঁধছে ঘাঁটি দস্যু-রাজায়।
পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায় দানব-জুতো,
মুখে ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডাণ্ডা-গুঁতো।

দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,
নাইকো খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এ-সব বন্দি-গড়ে।

'লানত' গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে,
ধর্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, 'গলিজ' মুখে কোরান ভাঁজে।
তাজ-হারা যার নাঙ্গা শিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি,
ধর্ম-কথা বলছে তারাই, পড়ছে তারাই কেতাব-পুঁথি।
উৎপীড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি,
হিজ্‌ড়ে ভীরুর ধর্ম-কথার ভণ্ডামিতে আসছে বমি।
টিকটিকির ঐ লেজুড় সম দিগ্বিদিকে উড়ছে টিকি,
দেব্‌তার আগে পূজে দানব, তাদের কাছে সত্য শিখি !
পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগলি খেলে ভরায় উদর,
টিকটিকি হয়, বিষ্ঠা কি নাই—ছি ছি এদের খাদ্য ক্ষুধার।
আজ দানবের রঙমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
লাথি খায় আর চ্যাঁচায় শুধু, 'দোহাই হুজুর, মলাম মলাম।'

মাদিগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা-বোল নাকি-নাকি,
খাঁড়ায় কেটে কর্ মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি !
হান্ তরবার, আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদিগুলোয় কর্ মা পুরুষ, রক্ত দে মা, রক্ত দেখা !
লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তোর আয় মা রেখে কমল-বনে,
বুদ্ধি-বুড়ো সিদ্ধাদাতা গণেশ-টনেশ চাই না রণে।
ঘোমটা-পরা কলা বৌ-এর গলা ধরে দাও করে দূর,
ঐ বুঝি দেব-সেনাপতি, ময়ূর-চড়া জামাই ঠাকুর ?
দূর করে দে, দূর করে দে এ সব বালাই সর্বনাশী,
চাই নাকো ঐ ভাং-খাওয়া শিব, নেক দিয়ে তাঁয় গঙ্গামাসি !
তুই একা আয় পাগ্‌লি বেটি তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে,
রক্ত তৃষায় 'ম্যয় ভুখা হুঁ'-র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে।
'ম্যয় ভুখা হুঁ'-র রক্তক্ষেপী ছিন্নমস্তা আয় মা কালী,
গুরুর বাগে শিব-সেনা তোর হুঙ্কারে ঐ 'জয় আকালী !'

এখনো তোর মাটির গড়া মৃন্ময়ী ঐ মূর্তি হেরি
দু'চোখ পুরে জল আসে মা, আর কতকাল করবি দেরি ?
মহিষাসুর বধ করে তুই ভেবেছিলি রইবি সুখে,
পারিস্‌নি তা, ত্রেতা যুগে টল্‌ল আসন রামের দুখে।

আর এলিনে রুদ্রাণী তুই, জানিনে কেউ ডাকল কি না,
রাজপুতনায় বাজল হঠাৎ 'ম্যয় ভুখা হুঁ'-র রক্তবীণা।
বৃথাই গেল সিরাজ, টিপু, মীর কাসিমের প্রাণ-বলিদান,
চণ্ডি ! নিলি যোগমায়া-রূপ, বলল সবাই বিধির বিধান।

হঠাৎ কখন উঠল খেপে বিদ্রোহিণী ঝান্সি-রানি,
খ্যাপা মেয়ের অভিমানেও এলি নে তুই মা ভবানী।
এমনি করে ফাঁকি দিয়ে আর কতকাল নিবি পূজা ?
পাষাণ বাপের পাষাণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভুজা।

বছর বছর এ-অভিনয় অপমান তোর, পূজা নয় এ,
কি দিস্ আশিস কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে।
অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস্, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা ;
আয় পাষাণী, এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা !
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি-পূজা
দূর করে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভুজা।
সেইদিন হবে জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন-বাজনা, সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ম্যয় ভুখা হুঁ—মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী,
কৈলাস হতে গিরি-রানির মা-দুলালি কন্যা অয়ি !
আয় উমা আনন্দময়ী !

১৪

অদর্শনের কৈফিয়ত

বর্ষা বাদল মেঘের রাতে ঘনিয়ে যেদিন আসে,
সেদিন আমার পাওনা দেখা নিবিড় নীলাকাশে।
যেদিন হঠাৎ আকাশ জুড়ে বিপুল আঁধার মাঝে
পুচ্ছ আমার উড়িয়ে দিনু অলক্ষুণে সাঁঝে,
সেদিন তো ভাই নামটি শুনে সবাই বুঝেছিলে,
চলতে নারে ঘড়ির মতো লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।
বিজ্‌লি-মায়া উল্কা-জ্বালা শোঁ শোঁ বাদল ঝড়
সাধ করে যে সেথায় আমার বেঁধেছি ভাই ঘর।

সুযোগ সেথায় সকল বেলা হবেই এমন নয় ;
দুর্যোগ তার গেলেই আছে গোটা দুই চার ছয়।
সবাই লাঠি, সবাই ঝাঁটা, সবাই মারে লাথি,
উড়িয়ে দিয়ে মুচকি হেসে ফুলিয়ে দাঁড়াই ছাতি।
কিন্তু যদি কোষ্‌টো মুখে তোমরা দিবে গালি
তোমরা, আমার জীবন-আলো দেও যদি হাততালি,
সুদিন দেখে ফুরতি দিয়ে দুর্দিনে মুখ ভার
করবে যদি, মুখটি তবে চাইব বলো কার ?
জ্বলব নিতি জ্বলজ্বলিয়ে আকাশ আলো করে,
হয়তো দু'দিন মেঘের রাতে নাইবা পেলে মোরে।
এই যে কসুর, অসুর যারা মাফ দেবে না ভাই,
তোমরা শুধু সদয় থেকো, কুছ্ পরোয়া নাই।

১৫
আত্মকথা

জন্মাবধি আসছি বলে, আমিই শুধু আমার মতো ;
বাঁধতে তবু ব্যস্ত আছো নিয়ম-ফাঁসে তোমরা যত।
তোমাদের ঐ হাজার বাঁধন, হাজার কাঁদন, হাজার মরণ,
ভাবতে গেলেও শিউরে উঠি, দূরে যাক তার অনুকরণ।
তোমাদের ঐ লক্ষ কাঁদন, নিত্যি ভালো-বাসাবাসি,
আমি সিন্ধু-লহর মাঝে নিত্য ডুবি, নিত্য ভাসি।
নিত্যি শুনাই, 'লক্ষ্মীছাড়া নিয়ম-আগল মানেই না।'
কৈফিয়তের তলব তবু নিত্যি আসে, ছাড়েই না।
রুপার শিকল পরিয়ে পায়ে নিয়ম-খাঁচায় পুরতে যাওয়া,
আমার নিকট তেমনি, যেমন—পাহাড় ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া।
তোমরা হাজার ফুলের রাশি দেখবে, শুনবে মধুর বাঁশি ;
আমার তরে তৈরি সদাই মিষ্টি কারা, যষ্টি, ফাঁসি।
তাদের সাথে করতে প্রণয় সময় যে ভাই দেওয়াই চাই ;
তোদের তো ভাই মুখের পিরিত, তারা যে মোর প্রাণের ভাই।
ভুলব না ভাই তোদের তবু, মনে প'লেই আসব ধেয়ে,
একঘেয়ে ঐ নিয়ম-দড়ায় বাঁধিস্‌নে ভাই, রাখছি গেয়ে।

১৬

মোবারকবাদ

[মোহামেডান স্পোর্টিং-এর লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রাপ্তিতে]

এই ভারতের অবনত শিরে তোমরা পরালে তাজ,
সুযোগ পাইলে শক্তিতে মোরা অজেয়, দেখালে আজ !
এ কি অভিনব কীর্তি রাখিলে নিরাশাবাদীর দেশে,
আঁধার গগনে আশার ঈদের চাঁদ উঠিল যে হেসে !

আনিলে শুক্লা একাদশী তিথি একাদশ খেলোয়াড়,
আবার ঝলকি উঠিল খালেদ-তারেকের তলোয়ার !
শুষ্ক মনের সাহারায় যেন দজলা-ফোরাত বহে,
পিঞ্জরার বুল্‌বুল্‌ বসরার গোলাবের কথা কহে।
বিড়িওয়ালারাও দেখিয়াছে যেন ফিরদৌসের সিঁড়ি,
(যেন) মজনুঁ দেখেছে লায়লিরে, ফরহাদ দেখিয়াছে শিরি।
বীর খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তির দিলে নব পরিচয়,
মালা দিলে সেই বিজয়ীর, যার সাথে হলো পরাজয়।
হিন্দু-মুসলমানের তোমরা ভারতে রেখেছ মান ;
শক্তি যাহার দেখেছে, মানুষ তাহারেই দেয় প্রাণ !
যে চরণ দিয়ে ফুটবল নিয়ে জাগাইলে বিস্ময় ;
সেই চরণের শক্তি জাগুক আবার ভারতময়।
এমনি চরণ-আঘাতে মোদের বন্ধন ভয়-ডর
লাথি মেরে মোরা দূর করি যেন ; আল্লাহু আকবর !

১৭

মুকুলের উদ্বোধন

বীণাপাণির সুর-মহলের কোন্‌ দুয়ার আজ খুলল রে,
কোন্‌ সুখে আজ মন আমাদের দোদুল-দোলায় দুলল রে।
সবুজ শাড়ির ধানি আঁচল জারুল ফুলের বেগনি পাড়—
উড়িয়ে কে ঐ আসল রে ভাই আকাশ-বীণায় বাজিয়ে তার !
সোনার ফুলে লুটাল তার হল্‌দি-রাঙা উত্তরী,
খাপছাড়া এ মেঘগুলি যায় ভেসে তারি দূর তরী।

*　　*　দোয়েল কোয়েল গাচ্ছে তারি বন্দনা,
কাঁঠাল–পাকা আমের সুবাস তারি দেহের গন্ধ না!
কও দেখি বোন্ কোন্ মেয়ে এই আসল মোদের আঙিনায়—
এত স্নেহ উছ্‌লে পড়ে কাহার তনুর ভঙ্গিমায়?
এ যে মোদের ভারতী মা, টলেছে আজ আসন তাঁর—
আমরা যদি ডাক দি’ রে বোন্ রইতে কি মা পারেন আর?
গগন–জোড়া তাঁরি চাওয়া বুক–জুড়ানো মাটির কোল,
দখিন হাওয়ায় বাতাস করেন দুলিয়ে পাতার নীল আঁচল।
আয় বোন্ সব আয় মোরা আজ সালাম করি সে মাতায়,
দুলাল তার আজ আস্‌ল যারা সাজাই তাদের ফুল–পাতায়।
ছোট ছোট বোনগুলি সব আহ্লাদে আজ আটখানা,
কচি হাসির বাঁশি কাঁপায় পুলক দিয়ে মাঠখানা।
আজ কি বাণীর সোহাগটুকুন্ লুটলি তোরা লুটলি, হায়,
গরবিনী বোনগুলি মোর তোদের দেখে চোখ জুড়ায়!
কিসের এত আনন্দ আজ জানো কি তা জানো বোন্।
লক্ষ্মী যত মেয়েদের আজ জ্ঞান–মুকুলের উদ্বোধন।
যা পাও আজ হাত পেতে নাও, আবার যেন ফের বছর
এমনি মেলে গুণের আদর পুরস্কার সে তর–বেতর।
রাখব মনে আমরা সবাই সব ঠাঁই যদি লক্ষ্মী হই,
দুখের ধরা সুখের হবে, নারী যে বোন দুঃখ–জয়ী।
মেয়েই ঘরের লক্ষ্মী—মোরা** ফুল ফুটায়,
মঙ্গল আর কল্যাণ সব নারীর পায়েই মুখ লুটায়।

তোমরা এখন কচি মেয়ে এসব হয়তো বুঝবে না,
ভালো যদি না হই রে বোন্, কেউ তাহলে পূজবে না।
পড়ালেখার সকল কাজে হব মোরা লক্ষ্মী সব,
দেখবে তখন কুটির মাঝেই ফুটবে এসে রাজ–বিভব।

সভায় মোদের স্নেহের বলে এলে যে সব মহান–প্রাণ,
তাঁদের পায়ে প্রণাম করে গাও গো তাঁদের বোধন–গান।
আয় বোন্ সব আয় তবে আজ গাঁথব স্নেহের পুষ্পহার,
আনব কেড়ে লক্ষ্মী–মায়ের পদ্ম–বাণীর সুর–বাহার।

---

*　মনে হয়, কোনো বালিকা–বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী অনুষ্ঠানে কবিতাটি পঠিত হয়েছিল। তারকা–চিহ্নিত শব্দগুলির পাঠ উদ্ধার করা গেল না। —সম্পাদক

১৮
স্বদেশ

আজি আষাঢ়ের বজ্র-গর্ভ নবীন নীরদ-সম
গরজি উঠুক, হে স্বদেশ, তব মন্ত্র নবীনতম !
আনো খরতর প্রাণদা বন্যা, আনো পশ্চিমি হাওয়া—
টানি লয়ে যাও কঠোর সমুখে, ভোলাও পিছনে চাওয়া।
বাধা-নিষেধের বিপুল প্রাচীর-ঘেরা যুগ-সঞ্চিত
আবর্জনারে—তব গতি-বেগে করো করো বিদূরিত।
'স্বদেশ' 'স্বদেশ' চিৎকার শুনি, শুনি নিতি নব গাথা,
হেরি সহস্র ভক্ত নোয়ায় স্বদেশ-শরণে মাথা ;
স্বদেশ তাহারা ভালবাসে শুধু, স্বদেশবাসীরে নহে—
মানচিত্রের ভারতবর্ষে তাহারা স্বদেশ কহে।
মনে মনে হায় স্বদেশের এক দেবী প্রতিমারে গড়ি
দেশ-বিলাসীরা তারি পূজা আজো করিছে জীবন ভরি ;
'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু' বলি জানে সব তারা খাঁটি,
পূজা করে তারা স্বদেশের জল বায়ু তরু লতা মাটি।

পাপে ও পুণ্যে ভালো ও মন্দে মেশা যে স্বদেশবাসী,
সেই মানুষের ভারতবর্ষ রহে তাই চিরদাসী।
দেশসেবা করে কেহ মন্দির, কেহ মসজিদ লাগি—
স্বদেশের লাগি অজাত-ধর্ম এল না বেদনা-ভাগী।
পঙ্গু খিন্ন শোষণে শাসনে ভারতের নরনারী,
সকল দুয়ার বন্ধ তাহার, দ্বারে দ্বারে প্রতিহারী
বাধা-নিষেধের সংস্কারের, সেই কূপমণ্ডুকে
ভগবানে তারা ডাকে আর শুয়ে ঘুমায় শান্ত সুখে।
বেদনা-পীড়নে ক্ষণেক কাঁদিয়া আবার ঘুমায় তারা,
নাই প্রতিশোধ, নাই প্রতিবাদ, হায় রে সর্বহারা !
মরিতে মরিতে ইহাদের মাঝে মানুষের ক্ষীণ স্মৃতি
রহিয়াছে আজো, জিয়াবে, কে তারে, কে গাবে তেমন গীতি !

'দৈব' 'ভাগ্য' বলে কিছু নাই, কে জাগাবে এই বোধ,
তাহারাই পারে তাহাদের 'পরে পীড়নের নিতে শোধ।
যে-লাঙল দিয়া বন্ধ্যা ধরারে নিপীড়িয়া আনে দান,
পাতাল ফুঁড়িয়া ছুটে আসে ভয়ে ফুল-ফসলের বান।

কর্ষণে যারা অনুর্বর এ ধরা করে উর্বর,
বর্বর এই লোভী মানুষেরে কেন তাহাদের ডর !

খেয়ে তাহাদেরই রক্ত—বাড়িছে যে রক্ষ দিনে দিনে,
নিঙাড়িয়া নিতে পারে সে-রক্ত যদি রাক্ষসে চিনে।
তাহাদেরই গড়া দুর্গ হইতে তাহাদেরই নির্মিত
অস্ত্র হানিয়া তাদেরই যারা করিছে নির্বাপিত,
সন্ধান তার দিতে তাহাদেরে, সাহসে জাগাতে প্রাণ,
এল নাকো কেহ, ব্যর্থ হইল তাই এত প্রাণদান !
ব্যর্থ হইয়া খাওয়ায় তাদেরে ধর্মের গঞ্জিকা,
স্বদেশের লাগি বাড়িতেছে তাই কেবলই শ্মশ্রু-শিখা !
পীড়িতের নাই জাতি ও ধর্ম, অধীন ভারতময়
তারা পরাধীন, তারা নিপীড়িত, এই এক পরিচয় !
পশুরাজ যবে পশিয়াছে গ্রামে, লেগেছে আগুন ঘরে—
কে রবে তখন মন্দির আর মসজিদ তার ধরে ?

শোনাও এ বাণী পীড়িত স্বদেশে, পীড়িত মানুষ ছাড়া
কোনো কিছু নাই, এরই প্রতিকারে জাগুক পরানে সাড়া।
এই বাণী, এই চেতনা লইয়া স্বদেশ জাগিবে যবে,
মহা-মানুষের মহা-ভারতের সেদিন সৃষ্টি হবে।

'স্বদেশ'
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা,
আষাঢ় ১৩৩৮

১৯

দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ

এক

সুন্দর তুমি নয়ন তোমার মানস-নীলোৎপল,
তনু-ভরা ঝলে রূপ-তরঙ্গ চন্দ্রমা-ছলছল।
চাহিছে আকাশ আনত-নয়ন সুন্দর তব চোখে,
রজনীগন্ধা তব মুখে চেয়ে বিকাশে কাননলোকে,

আকাশ-গঙ্গা নামিয়া এসেছ সন্ধ্যারানির রূপে,
তব রূপ-শিখা চুরি করে চায় প্রভাতী তারকা চুপে।
ঢলঢলে তব লাবণি কোমল কমল-পরাগ মাখা,
জোড়া ভুরু যেন গাঙচিল ওড়ে—নয়নে সাগর ঢাকা।
শুভ্র তোমার ললাটে শোভিতে ওঠে কি সন্ধ্যাতারা,
নয়নে তোমার কাজল পরাতে ঘোরে মেঘ দিশাহারা ?
তুমি সুন্দর স্রষ্টার যেন মানসী কন্যা প্রিয়,
গোধূলি-লগনে দোলে কি গগনে তোমারই উত্তরীয় ?
নামিয়া আসিলে দিবালোকে ভুলে, হে স্বপন-বিহারিণী !
মম গানে মম সুরে ও ধেয়ানে, হে রানি, তোমারে চিনি।

দার্জিলিং
১৪-৬-৩১

দুই

আমার ধেয়ান-কমলে আলতো রাখিয়া চরণখানি
উদিলে বিশ্ব-রমা কি গো আজ, রূপ ধরে এলে বাণী ?
কত বিনিদ্র বরষ মাস অদেখা যে লক্ষ্মীরে
রচিয়া তুলেছি কবিতায় গানে—সে কি আজ এল ফিরে ?
আমারে বেদনা হানিয়া যাহারা চলে গেছে দূর পথে,
তাদের গোপন বেদনা তুমি কি এসেছ উজান স্রোতে ?
গানের দীপালি জ্বালিয়া, ছিলাম যার পথ পানে চাহি
দীপ নিবে যায়—হায় এতদিনে সে এল স্বর্গ বাহি ?
নয়নের জল গিয়াছে শুকায়ে, বুকে দাহ সাহারার,
আজ কেন এলে হে শেষ অতিথি পার হয়ে পারাবার ?
নয়নের কূলে অশ্রুর চরে গানে চখা ও চখি
ডাকে অনুখন—অনন্ত নিশি ! তার মাঝে তুমিও কি
ভুলে-যাওয়া মোর কোন জনমের সাথী এলে সেই তীরে
প্রভাত হবে না, হেথা শুধু রাতি, পাখি মোর, যাও ফিরে !

তব সুখ-নীড়ে যাও ফিরে, এ যে বেদনা-বিহার-লোক,
অশ্রু কাহারে কয় জানে না তো আজো ও কাজল চোখ !
ধেয়ানে ধরিতে যারে—মনে হয় বুঝি ওর ব্যথা লাগে,
সে কেন আসিলে দিনের আলোকে এই কণ্টক-বাগে ?...

তুমি তো তোমারে জানো না, তুমি যে কবির প্রথম ধ্যান,
নীহারিকালোক হতে ভাঙিয়াছি ঘুম, গাহি শত গান।
আমার বাণীর পদ্মপত্রে, হে ভোরের হিমকণা,
আনমনে আস আনমনে যাও—চঞ্চল বঞ্চনা!
চোখে লাগে বড় দিবসের দাহ স্বপ্ন-টুটানো আলো,
অন্তর-ছায়ালোক-বিহারিণী! আঁধারই আমার ভালো।
চিনিতে-না-দেওয়া চির-ছায়া-ঘন মায়ালোকে থাকো তুমি,
কল্প-লোকের ক্লান্ত পথিক, ঘুমালে যাইও চুমি।
গানের প্রদীপ হাতে করে খুঁজি বেদনা-আঁধারে পথ,
এ মোর নিয়তি। হে রানি, ফিরায়ে লয়ে যাও তব রথ।

বহুদিন হলো—মনে লাগে যেন বহু সে জনম আগে—
তোমারি মতো সে এসেছিল এক বিজয়িনী অনুরাগে;
সেদিন ছিল না ভিক্ষার ঝুলি, নিরশ্রু ছিল চোখ,
সব হয়ে সেই ব্যথা-বীণাপাণি চলে গেল নিজ-লোক।
শুধাইয়াছিনু তাহারে—'আমারে কি দিলে তোমার দান?'
চলে যেতে যেতে বলে গেল—'জল চক্ষে, কণ্ঠে গান!'
বন-পথ ছিল ছায়া-ঘন, ছিল মন-পথ অ-মলিন,
জাগিয়া হেরিনু ছায়া গেছে কোথা, রৌদ্র-দগ্ধ দিন।
স্বপন-জড়িত চক্ষে আঁধারে দেখিতে পাইনি তারে,
শুনেছিনু শুধু কণ্ঠ ক্ষণিক নীরবের পারাবারে।
কণ্ঠে কণ্ঠে খুঁজি সেই স্বর, সকল কণ্ঠে তাই
তার-উদ্দেশে-রচা মোর এই গানগুলি রেখে যাই।
তুমি কি আমার অদেখা অচেনা সেই মানসীর কেহ?
ক্ষীণ হয়ে আসে অতীতের স্মৃতি, তবু জাগে সন্দেহ!

দার্জিলিং
১৫-৬-৩১

তিন

সুন্দর তনু, সুন্দর মন, হৃদয় পাষাণ কেন?
সেই ভুলে-যাওয়া অবহেলা এলে সুন্দর রূপে যেন!
নারী কি দেবতা? কেবলি কি তারা পাষাণ নির্বিকার?
পদতলে তার পূজার অর্ঘ্য নিতি হয়ে ওঠে ভার।

কত সে হৃদয় দলিয়া চরণে আলতা পরেছ, রানি?
ধরা নাহি দিলে, তোমারে খুঁজিছে কত সে কবির বাণী?
আমার গানের একা তরণীতে আজো আছে আছে ঠাঁই,
তোমার পরশে সোনা হয়ে যাবে, এড়ায়ে চলিছ তাই?
আমার সুরের শতদলে তবে চরণ রাখিলে কেন,
না ছুঁতেই যদি চলে যাবে দূর ভুলে-যাওয়া-লোকে হেন?
নয়নের জল থাকুক আমার—সে মোর বন্ধু, প্রিয়,
থাক মোর গান—যদি মনে লাগে গানেরে ভালোবাসিও।

দার্জিলিং
১৬-৬-৩১

চার

আমার অশ্রু-বর্ষার শেষে ইন্দ্রধনুর মায়া
কেন এলে, যদি ছুঁইতে লুকাবে গগনে রঙিন কায়া?
আমি তো তোমারে চাহিনি আমার সাজাতে বাসর ঘর,
আমি চেয়েছিনু করিতে তোমারে আরো সুন্দরতর।
যত রঙ আছে মোর মনে, প্রাণে আছে মোর যত গান,
রঙে রূপে গানে সুরে ও লেখায় তোমারে করাব স্নান—
ইহার অধিক চাহিনি তো কিছু; আমার কাব্যে গীতে
আমি চেয়েছিনু তোমারে হে প্রিয় চির-অমরতা দিতে।
চলে যাব যবে এই ধরা ছাড়ি অজানা গ্রহের দেশে
রবে শুধু মোর কবিতা ও গান, মোর স্মৃতি যাবে ভেসে—
সেদিন সকলে খুঁজিবে আমার অতীত কাহিনী কথা,
গাওয়াল কে গান আমার পরান-বীণায় হানিয়া ব্যথা।
অশ্রুমতী কে কবির প্রিয়া সে—যার তনু-মন ঘিরে
গেয়েছিল কবি এত গান বসি বেদনা-সিন্ধু তীরে।
আমি জানি তব নিরশ্রু চোখে সেদিন নামিবে ঢল
দূর তারা-লোকে খুঁজিবে আমায় বাণীহীন অচপল।...

কানন যখন ভরে ওঠে রাঙা ফুলে ফলে পল্লবে,
বিহগ-কণ্ঠ ভরে ওঠে, কেন কে জানে, গানের স্তবে।
বাধা তো হানে না কানন তাহারে। আমিও তেমনি করি
তোমার শাখায় বসেছিনু তারে গানে গানে দিতে ভরি।

চৈতী নিশীথে আকাশে যখন ওঠে গো পূর্ণ শশী,
চকোর-কণ্ঠে তারো অজানিতে ওঠে গীত উচ্ছ্বসি।
ঘনঘটা ঘোর ঘিরিলে গগন চাতক ফুকারি ওঠে,
ধরণী ভরিয়া সেই আনন্দে কত না কুসুম ফোটে।
তেমনি পুলকে তোমারে হেরিয়া গেয়ে উঠেছিনু গান,
সুন্দর হেরি বীণা সম বেজে উঠেছিল মোর প্রাণ।
কোনো ক্ষতি তব করিনি তো প্রিয়, বহু সে ঊর্ধ্বে তব
তোমার উদয়ে ভরত পাখির মতো গেয়েছিনু স্তব।

কেন থামাইলে সে গান আমার, কেন দিলে অবহেলা?
তুমিও কি মোর অস্ত-আকাশে ক্ষণিক রঙের খেলা?

আমি জানি, তব বন্ধু যাহারা আছে তব মন ঘিরে,
কোলাহল করি বায়সের মতো নিজ নীড়ে যাবে ফিরে।
সেই কোলাহলে ডুবে যায় মোর ক্ষীণ কণ্ঠের গান,
তবু এই গান করিবে তোমারে চির-অমরতা দান।
কোলাহল তারা জানে শুধু, তারা জানে না অমৃত-সুধা,
তাহারা মিটাতে পারিবে না তব অন্তরতর ক্ষুধা।

তোমারে ঘিরিয়া গুঞ্জন করি ফিরিছে মোর যে গীতি—
কমল-কাননে মধুপ যেমন গান করে ফেরে নিতি—
সে গান বাজিবে আমাদেরও পরে বাণীর কমল-বনে,
অনাগত যুবা যুবতী প্রেমিক প্রেমিকা ধ্যানে স্বপনে
গাহিবে সে গীত; আমার সহিত স্মরিবে তোমারে তারা,
হয়তো মোদের স্মরিয়া তাদের ঝরিবে নয়ন-ধারা।
আমরা বাঁচিয়া থাকিব তাদের প্রণয়ে-অশ্রুজলে।
লিখি প্রিয় তারি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী এ ধরাতলে।

দার্জিলিং
২৮-৬-৩১

পাঁচ

ওপার হইতে আসিয়াছে ভেলা, বাজিছে বিদায়-বাঁশি,
প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম মোর, আজ তবে আমি আসি!

কত সে দিবস নিশীথ ধরিয়া কত শত অপরাধ
করেছি আমারো অজানিতে, কত হানিয়াছি সুখে বাদ।
কত অশান্তি সৃজিয়াছি, করি দিবানিশি কোলাহল
শান্ত তোমার কুলায়খানিরে করিয়াছি চঞ্চল।
আজ চলে যাই—রাখিও না মনে অপরাধ যত মোর,
ঝড় এসেছিল নিশীথে, আবার আসিবে তোমার ভোর।
দুঃস্বপ্নের সম এসেছিনু, স্বপ্ন টুটায়ে যাই,
ভুলে যেয়ো যদি সে দুঃস্বপ্ন যায় ব্যথা হানিয়াই!
যদি ভুল করে মোরে মনে পড়ে ব্যথা করে ওঠে বুক,
সে ব্যথা ভুলিও—আমি এসেছিনু কেবলি হানিতে দুখ।
আমি চলে যাই—রাখিয়া গেলাম আমার ব্যথিত শ্বাস,
শ্বসিয়া ফিরিবে সে শ্বাস আমার ঘিরি তব চারিপাশ।

আকাশ নিঙাড়ি ঝরিবে যখন আকুল বরিষা-ধারা,
মনে করো, প্রিয়, জল নয়—মোর অশ্রু-সলিল তারা।
পূবালি বাতাস হু হু করে এসে আঘাত হানিলে দ্বারে
মনে করো আমি লুটাইয়া পড়ি কাঁদিতেছি হাহাকারে।
আমার রচিত কোনো গান যদি শোনো গো কাহারো কাছে
মনে করো—ঐ কণ্ঠে আমারি ব্যথিত কাঁদন আছে!
না জানিয়া আমি না জানি তোমার পথে বাধা হানিয়াছি,
রাহুর মতন তোমারে কেবলই চাহিয়াছি কাছাকাছি।
আজ ভুলে যেয়ো সে সব, আজিকে বিদায়-বিধুর ক্ষণে
ভুলে যাও এই রাহুর প্রণয়, রেখো নাকো কিছু মনে।
আজ হতে হলে মুক্ত আমার মাধবী রাতের শশী!
আর তব পথে হানিব না বাধা, হাসিবে গগনে বসি।
নিশীথে যখন ঘুমাবে এ ঘরে, রবো না কেহ ও ঘরে,
আমারে ডাকিয়া পাইবে না সাড়া, তখনো আকুল স্বরে
ডাকিবে কি আর? হয়তো ডাকিবে, পাবে নাকো উত্তর
হয়তো আমার স্মৃতি-কণ্টক বিঁধিবে ও অন্তর।
কত সে গানের পাখি আসে, এসে গান গায় ফুল-বনে,
উড়ে যায় পুন অজানা অদূরে—কে রাখে তাদেরে মনে?
আমি এসেছিনু তোমার কাননে তেমনি গানের পাখি,
গান-শেষে পুন উড়ে যাই দূরে, সে গানের স্মৃতি রাখি,
তোমার কণ্ঠে দিয়ে যাই মোর গানের কণ্ঠহার,
তারপর যদি বহে গো বহুক মাঝে সাত পারাবার।

ও কূলে থাকিয়া তোমার স্মরণে গাহি নিতি নব গীতি
তোমারে স্মরিব ! এপারে তোমার থাকুক শুক্লা তিথি।
হৃদয়ে তোমারে না-ই যদি পাই, কণ্ঠে দিলাম মালা,
সেই সুখে প্রিয় ভুলিব আমার নীলকণ্ঠের জ্বালা !
থাকুক আমার আঁধার নিশীথ, কণ্ঠে ফেনিল বিষ,
তুমি সুখী হও, মম প্রেম রবে ঘিরিয়া অহর্নিশ।

দার্জিলিং
২৯-৬-৩১

ছয়

—তুমি বুঝিবে না মোরে,
স্বপন-কুমার স্বপ্নে আসিয়া চলে যাই ঘুম-ঘোরে।
গানের বিহগ এসেছিনু—ফুল ফুটেছিল তব বনে,
ডেকেছিলে তুমি তোমার ফুলের সুরভি-নিমন্ত্রণে।
মিটিয়াছে সাধ—শুনিয়াছ গান, ফুরায়েছে প্রয়োজন,
বাসি লাগে আজ তব কানে মোর সংগীত-গুঞ্জন।
ধরার মানবী—অমরাবতীর তুমি তো অমরা নহ,
ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছ তাই শুনি গীত অহরহ।
হে আমার ভীরু ! আমার সহিত ঊর্ধ্বে পক্ষ মেলি
উড়িতে তোমার ভয় জাগে মনে, তাই মোরে অবহেলি
চলেছ নিম্নে মাটির দেশের ভঙ্গুর প্রেম মাগি
তুমি ধরণীর—নাই তব তৃষ্ণা স্বর্গ-অমৃত লাগি !
হে প্রিয়, বিদায় দাও !
স্মৃতির শুষ্ক ফুলগুলি মোর বিদায়-পথে বিছাও।...

স্বপ্ন তোমার রঙিন করেছি আমার স্বপন দিয়া,
জীবনে তোমার উঠিয়াছে রবি—স্বপ্ন যাই টুটিয়া।
যত ফুল তুমি দিয়াছিলে তাহা শুকাইয়া যদি গেল,
সে শুষ্ক ফুলে রাখিয়া চরণ যাবার সময় এল।
আমার প্রাণের রঙে রাঙায়েছি তব বন্ধুর পথ,
নীরবে এসেছি—নীরবে ফিরায়ে লয়ে যাই মোর রথ।
কাব্যে আমার, সংগীতে মোর যাহারে খুঁজিয়া ফিরি,
সেই মানসীর ছায়া হেরেছিনু ছিল তব তনু ঘিরি।

তোমারি মতন মায়া নিয়া, প্রিয়, এল গেল কতজনা
বুঝিল না আমি কি চাই—চলিয়া গেল তাই আনমনা।
শরতের মেঘ সম তারা হায় ক্ষণেক কাঁদিয়া শেষে
চলে গেল দূর তুষার-গিরিতে বিস্মরণের দেশে।
মোরই অপরাধ—মাটির মায়ায় শ্যামল যাদের মন,
নভোচারী মোর সাথে নীলাকাশে রবে তারা কতখন।

তার কপোলের মতো তব গালে থল-কমলীর আভা,
ভুরু দুটি যেন গগনের রেখা দূর দিগন্তে নাবা।
তোমার কপোলে পরাগ মাখাতে যত বন উপবন
যুগ যুগ ধরি যেন গো কুসুম ফোটায় অনুক্ষণ।
তোমার ও রাঙা কপোল-পরশ নাহি পেয়ে অভিমানে
ফুটিয়া তাহারা ঝরে ঝরে পড়ে যেন গো হতাশ প্রাণে।
অধরে তোমার আজিও যেন গো অমরার সুধা মাখা,
কোন সে দেবতা-কবির গভীর রাঙা অনুরাগ-আঁকা।
চৈতি সাঁঝের পহেলি চাঁদের মতো সে রুচির শুচি
তোমার শুভ্র হাসিখানি, তাহে ঝরে জোছনার কুচি।
নিশাসে তোমার ফেনিল মদির অমরার তীব্রতা,
মদালস করে তনু মন প্রাণ সে সুরভি-বিধুরতা।
তোমার ভাষায় ভালো যে বাসায় চির-উদাসীরে, প্রিয় !
কবির হৃদয়-রক্তে ছোপানো তোমার উত্তরীয়।
মেঘলা-সাঁঝের তমাল-বনের গভীর-কাজল-ছায়া
তোমার দীঘল আঁখি-পল্লবে বিছায়েছে তার মায়া।

দৃষ্টি তোমার সৃষ্টিরে যেন করে সুন্দরতর,
সে যেন কুসুম ফুটাতে পারে গো বন্ধ্যা তরুর 'পর।
বিষাদ-বরষা নামে যবে মোর শ্রাবণ-গগন ভরি,
ঈষৎ চাহিয়া ফোটাও ইন্দ্রধনু সে মেঘের পরি।
মৃত্যু-বিধুর বিশ্ব যেন গো ভয়ে উড়ে যেতে চায়,
তব সুন্দর বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
শুভ্র লিলির রাশিতে কে যেন গাঁথিয়াছে গোড়ে মালা,
গড়ায়ে পড়েছে দুধারে তোমার—তব দুটি বাহু, বালা !
আনিয়াছ তুমি নব পারিজাত-কোরক করিয়া চুরি
স্বর্গ হইতে, রাখিয়াছ তাহা গোপনে বক্ষে পুরি।

ও যেন তোমার সোনার হৃদয়-দেউলের হেম-চূড়া,
অথবা কুসুমে ঢেকেছ তোমার বক্ষ বেদনাতুরা।
চরণে তোমার আলতা পরাতে মেঘে ঐ রঙ ফোটে,
তোমারে হেরিতে তারাদল নভে উল্কা হইয়া ছোটে।
নিষ্কলঙ্ক তব রূপ হেরি কলঙ্ক হলো চাঁদে,
হিংসায় সে গো কৃষ্ণপক্ষে মুখ ঢাকি আজো কাঁদে।

এত রূপ যার শোভা-সম্ভার বিশ্বের বিস্ময়,
মৃন্ময়ী ধরা ধরিয়া যাহার হইয়াছে চিন্ময়,
যাহার রূপের জ্যোতিতে বুঝিবা দেবলোক হয় ম্লান,
কে জানিত হায় সে অপরূপায় শুধু রূপ, নাহি প্রাণ।
সুন্দর এই সোনার দেউলে, কে জানিত, দেবী নাই,
এ শুধু রূপের মরুশিখা—হানে ছলনা সর্বদাই।
রূপ নয় এ যে রূপের শিখা গো, কেবলি দাহন করে,
দলিত হৃদয়ে রাখিয়া চরণ নেচে চলে লীলা-ভরে !...

মনে পড়ে সেই দিন—
মেঘলোক হতে তুমি নেমে এলে মায়া-কুহেলিকা-লীন।
তুষার-মাখানো তনুতে তখনো শুভ্র মেঘাবরণ,
রহস্যলোক পার হয়ে এলে—রহস্য-ভরা মন।
চাঁদের কিরণ জমাট বাঁধিয়া তোমার ও তনু ভরি—
পথ ভুলে যেন নামিল ধরায় চাঁদের সতিন পরি !

চোখ-ভরা শুধু জিজ্ঞাসা যেন, খোঁজে কোন বন্ধুর
আসিয়াছ যেন ছাড়িয়া চন্দ্রলোক এ ধরা সুদূর।
দীঘল নয়নে মেঘের কাজল, পল্লব-মাখা মায়া,
রূপের সিন্ধু-তরঙ্গ যেন তোমাতে পেয়েছে কায়া।

—সহসা ডাকিলে মোরে,
আধো ঘুমে আধো জাগরণে ডাকে স্বপন যেমন করে।
না-দেখা তোমার বন্ধুর দেখা পাইলে কি মোর মাঝে?
শুধাইতে যাই—ভাষা নাহি পাই, মরি মনে মনে লাজে।
রূপের কুমার আমি নই, আমি রূপের দেশের পাখি,
রূপের কুমারী হেরিলে তাহারে সংগীতে শুধু ডাকি।

সুন্দরে হেরি কণ্ঠে আমার গানের জোয়ার জাগে,
তবে কি আমারে ডেকেছিলে তুমি মোর গীত-অনুরাগে ?
সুরের দেশের পথভোলা পরি—হয়তো কণ্ঠে মম
তোমার দেশের সংগীত-রেশ শুনিয়াছ নিরুপম।
বুঝিলাম—মোরে বাস নাই ভালো, ভালোবাসিয়াছ তুমি
কণ্ঠের মোর সংগীত, মোর কবিতা-কানন-ভূমি।

বুক-ভরা ব্যথা-অভিমান লয়ে তবু গাহিলাম গান,
আমার সে সুর-সুরধুনী-স্রোতে তোমারে করানু স্নান।
তোমার রূপের শিখারে স্নিগ্ধ করিলাম আঁখি-জলে,
বসালাম মোর কবিতা-কুঞ্জে ঘন তৃণ-বীথি-তলে।
বলিলাম—'প্রিয়, রূপ নাই আজ, রূপের ভস্ম-শেষ,
আসিয়াছ শেষ অতিথি আমার ভগ্নাবশেষ দেশ !
রূপ নাই, আছে রূপের তৃষ্ণা, রূপ-সৃষ্টির প্রাণ,
বুক-ভরা আছে অ-লেখা কবিতা, কণ্ঠে না-গাওয়া গান।'
তবু তুমি এলে, বসিলে কাননে, তব কর-ইঙ্গিতে
কানন আমার কাঁদায়ে তুলিনু সকরুণ সংগীতে।
যত ফুল ছিল গানের কাননে—তারা সব ঝরি ঝরি
সংগীতে মোর পড়িল তোমার রাঙা চরণের পরি।
কোনোটিরে তার আদর করিয়া খোঁপায় তুলিয়া নিলে,
কোনোটিরে লয়ে ছোঁয়ালে অধরে, কোনোটি ফেলিয়া দিলে।
গানের নেশায় গাহিলাম গান—খুঁজিয়া সে দেখি নাই—
সে গান আমার পাইল আশয় অথবা গাহি বৃথাই।

আমার গানের সুর-হিন্দোল, বাণীর পুষ্প-রথে
তোমারে লইয়া উধাও হলাম অমরাবতীর পথে।

সহসা পিছনে চাহি—
তুমি নাই—কবে নামিয়া গিয়াছ ধরণীর পথ বাহি !—
গন্ধর্ব-দেশের কুমার সে কাহার অভিশাপে
ধরা-মা'র কোলে লভেছি জনম, হেথা দিবা-দাহ-তাপে
কল্পনা মোর ম্লান হয়ে যায়, সারাখন লাগে ধূলি,
কত না যতনে বাঁচাই কল্প-লোকের কুসুমগুলি,
সে কুসুম লয়ে যারে দিতে চাই সে-ই হানে অনাদর,
হায় রে ধরণী—চাহে নাকো ফুল, চাহে শুধু ফুল-শর !—

আমার পুষ্প-রথ চলে একা অমরাবতীর পথে,
জানি ধরণীর কন্যার নাই নাই ঠাঁই সেই রথে।
গানের দেশের যে-সাথীরে খুঁজি ধরণীর কূলে কূলে,
দেখি নাই তারে, হয়তো জীবনে দেখিব না তারে ভুলে।

ফুল হেরি শুধু ভুল করি—এই পারিজাত মোর বুঝি,
ঝরি যায় ফুল, ভেঙে যায় ভুল, আবার সাথীরে খুঁজি।
বন্ধু করিও ক্ষমা !
আমি উড়ে যাই—কণ্ঠে তোমার মোর গান থাক জমা।
দূর আকাশের উদাসী বিহগ—গাহিতে আসিয়া গান
আহত কণ্ঠে চলিলাম ফিরে আমার দূর বিমান !
হয়তো নিশীথে, ম্লান সন্ধ্যায়, সকরুণ নিশিভোরে—
সহসা হেরিবে আমারে আমার করুণ কণ্ঠস্বরে।
হয়তো পড়িবে মনে—কোনোদিন এই সে গানের পাখি,
তোমার চাঁপার ডালে বসে গেছে কত প্রিয় নামে ডাকি ;
চোখে জল ভরে আসে যদি, তব বন্ধুর গলা ধরি
ভুলিতে আমারে যাচিয়ো আদর আরো আরো বেশি করি।
হৃদয়ের চির-পান্থশালায় কত মুসাফির আসে,
কেহ গাহে গান, কারো অভিমান, কেহ আঁখিজলে ভাসে।

মুসাফির চলে যায় নিজ পথে, হৃদয়-পান্থশালা
নূতন পথিকে লয়ে খেলে পুন হাসিকান্নার পালা।
কি হবে কাঁদিয়া মিছে—
সুমুখে হাসিছে সুখ-ইঙ্গিত, দুঃখ কাঁদুক পিছে !
আমার মনের রাঙা রঙ দিয়ে তোমার শুভ্র রূপ
রাঙায়ে গেলাম বিদায়-গোধূলি-মেঘ সম নিশ্চুপ।
আসিবে নতুন পথিক তোমার এই রাঙা রূপে ভুলি,
মানুষ-তোমারে আঁকিয়াছে নব রূপে সে আমার তুলি।
হয়তো জানো না তুমি, জানে সবে—আজিকার রূপ তব,
শুধু তব নয়—উহারে দিয়াছি আমি রঙ রূপ নব।
বেদনার দিনে স্মৃতি যদি বেঁধে—করিও অহঙ্কার
কাব্য-আসনে বসেছ কবির, লভেছ কণ্ঠ-হার !

৮-৮-৩১

সাত

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া !
আমি কালো মেঘ—নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টি-ধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে !
সুখ-বিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল-রাতের পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা—নয়নের জল দুর্বিষহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত ফুকারি ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্র-তপ্ত ঠোঁটে।
জানি না সে ভাষা, হয়তো বা জানি, ছল করে তাই হাসিতে চাহি,
সহসা নিরখি—নেমেছে বাদল রৌদ্রোজ্জ্বল গগন বাহি।

ইরানি-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি করি ভরি ও রাঙা তনু,
আমি ভাবি—বুঝি আমারি বাদল-মেঘশেষে এল ইন্দ্রধনু।
ফণির ডেরায় কাঁটার কুঞ্জে ফোটে যে কেতকী, তাহার ব্যথা
বুঝিবে না তুমি ; ধরণী তো তব ঘর নহে, এলে জমিতে হেথা।
ভ্রম করে তুমি ভ্রমিতে ধরায় এসেছ ফুলের দেশের পরি,
জানিতে না হেথা সুখ-দিন শেষে আসে দুখ-রাতি আঁধার করি,
রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ, চপলতা-ভরা চিত্র-পাখা,
জানিতে না হেথা ফুল ফুটে ফুল ঝরে যায়, কাঁদে কানন ফাঁকা।
যে লোনা-জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
সেই সমুদ্রে জনম আমার, আমি সেই মেঘ-সলিল-ভরা।
ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে, তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি,
সেই অশ্রুর সপ্ত পাথারে, পারায়ে ব্যথার শতেক গলি।
ভুল করে প্রিয়া এ ফুল-কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
এ বন বাদল-অশ্রু যূথীর ; এ নহে মাধবীপুষ্প নব।

মাটির করুণা-সিক্ত এ মন, হেথা নিশিদিন যে ফুল ঝরে—
তারি বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিতে তাদেরি অশ্রু ক্ষরে।
সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের খেলা,
জাগিয়া তাহারি স্মৃতি লয়ে কাটে আমার সকাল সন্ধ্যাবেলা।
এ মোর নিয়তি, অপরাধ নহে আমারও তোমারও—স্বপন-রানি !
আমার বাণীতে তোমার মূরতি বীণাপাণি নয়—বেদনা-পাণি।

তোমার নদীতে নিতি কত তরী এপার হইতে ওপারে চলে,
কাণ্ডারিহীন ভাঙা তরী মোর ডুবে গেল তব অতল তলে।
ওরা শুধু তব বুক বেয়ে যায় সুখের আশার বণিক ওরা,
আমি ডুবে তব দেখিলাম তল জল–শেষ চোরাবালুতে ভরা।
ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরী তব বিস্মৃতি–বালুকাতলে
দু দিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে।

কুড়াতে এসেছ দুখের ঝিনুক ব্যথার আকুল সিন্ধু–কূলে,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে হয়তো ফেলে দিবে কোথা মনের ভুলে।
তোমাদের ব্যথা কাঁদন যেটুক সে শুধু বিলাস, পুতুল–খেলা,
পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।
মোর দেহ মনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রু–সজল নীরদ মাখা,
কি হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রানি, তব ধ্যান ঐ চন্দ্র রাকা।
সে চাঁদ উঠিছে গগনে তোমার আমার সন্ধ্যা–তিমির–শেষে,
আমি যাই সেই নিশিথিনী–পারে যেথায় সকল আঁধার মেশে।
আমার প্রেমের বরষায় ধুয়ে তব হৃদি হলো সুনীলতর
সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ—উজ্জ্বলতর তাহার কর।
যদি সে চন্দ্র–হসিত নিশীথ বিস্বাদ লাগে তোমার চোখে,
তোমার অতীত তোমারে খুঁজিও আমার বিধুর গানের লোকে।

সেথা ব্যথা রবে, রবে সান্ত্বনা, রবে চন্দন–সুশীতলতা,
যে ফুল জীবনে ঝরে না—সে ফুল হইয়া ফুটিবে তোমার ব্যথা।
আমার গানের বিষ–দাহ যাহা সে আছে গো নীলকণ্ঠে মম,
বিষ–শেষে এল যে অমৃত–বাণী, দিনু তা তোমারে হে প্রিয়তম !
আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার ঊর্ধ্বে তুমি যে ফুল,
আমি ফুটায়েছি তোমারে কুসুম করিয়া, সে মোর সুখ অতুল।
বিদায়–বেলায়, এই শুধু চাই, হে মোর মানস–কানন–পরী,
তোমার চেয়েও তব বন্ধুরে ভালোবাসি যেন অধিক করি !

২০

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের তিরোধানে

'দেশপ্রিয় নাই' শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি ;
আকাশে ললাট হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির–অভাগী॥

মায়ের লাগিয়া প্রাণ দিয়া রণে মার কোলে মাথা রাখি
ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী, জাগায়ো না তারে ডাকি।
দেশের লাগিয়া দিয়াছে সকলি, দেয়নি নিজেরে ফাঁকি,
তাহারি শুভ্র শান্ত হাসিটি অধরে রয়েছে লাগি॥

স্বার্থ অর্থ বিলাস বিভব গৌরব সম্মান
মায়ের চরণে দিয়াছে সে ধীরে অকাতরে বলিদান ;
রাজ-ভিখারির ছিল সম্বল শুধু দেহ আর প্রাণ,
তাই দিয়ে দিল শেষ অঞ্জলি দানবীর বৈরাগী॥

আপনার ঘরে পায়নি থাকিতে প্রিয় স্বজনের পাশে,
কাটাল জীবন রুদ্ধ ভবনে বদ্ধ প্রাচীর-গ্রাসে ;
আজ সে মুক্ত, বিধি-নিষেধের উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে হাসে,
বন্ধন হলো নন্দন-ফুলহার তার ছোঁয়া লাগি॥

দেশবন্ধুর পার্শ্বে জ্বলিছে দেশপ্রিয়ের চিতা,
এতদিন পরে বক্ষে এসেছে দুঃখের সাথী মিতা ;
ঐ সাথে জ্বলে ভারত-ভাগ্য, শোকে দীপান্বিতা,
নিভে যাবে চিতা, রয়ে যাবে ধূম চিরদিন বুকে জাগি॥

তুমি এসেছিলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হেতু,
পদ্মা ও ভাগীরথীর মাঝারে তুমি বেঁধেছিলে সেতু,
দুর্দিনের এ ভগ্ন দুর্গে তুমি ছিলে জয়কেতু,
ফিরিয়াছ দ্বারে দ্বারে সন্ন্যাসী ঘরে ঘরে ঘুম ভাঙি॥

এক যতীন্দ্র অযুত পরানে ছড়ায়ে পড়েছে আজি,
জনসমুদ্র-কল্লোলে তারি শঙ্খ উঠিছে বাজি ;
হে বীর, তোমার সাধ অপূর্ণ, মোরা যেন পারি করিতে পূর্ণ ;
মৃত্যুতীর্থ হতে এনো তুমি অমর জীবন মাগি॥

'মাসিক মোহাম্মদী'
ভাদ্র ১৩৪০

২১

আঁধার

অমানিশায় আসে আঁধার তেপান্তরের মাঠে ;
স্তব্ধ ভয়ে পথিক ভাবে,—কেমনে রাত কাটে !

ঐ যে ডাকে হুতোম-পেঁচা, বাতাস করে শাঁ শাঁ !
মেঘে ঢাকা অচিন মুলুক ; কোথায় রে কার বাসা ?
গা ছুঁয়ে যায় কালিয়ে শীতে শূন্য পথের জু জু—
আঁধার ঘোরে জীবন-খেলার নূতন পালা রুজু।

২২

অপরূপ সে দুরন্ত

ভাব-বিলাসী অপরূপ সে দুরন্ত,
বাঁধন-হারা মন সদা তার উড়ন্ত !
সে ঘুরে বেড়ায় নীল আকাশে।
চাঁদের সাথে মুচ্‌কি হাসে,
গুঞ্জরে সে মৌ-মক্ষীর গুঞ্জনে,
সে ফুলের সাথে ফোটে, ঝরে পরাগ হয়ে অঙ্গনে।
তার চোখের পলক ভোরের তারায় ঝলে,
ধূমকেতু তার ফুলঝুরি, সে উল্কা হয়ে চলে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত।
সে প্রথম-ফোটা গোলাপ-কুঁড়ির সনে—
হিঙুল হয়ে ওঠে লাজে হঠাৎ অকারণে।
ধরা তারে ধরতে নারে ঘরের প্রদীপ দিয়ে,
সে শিশির হয়ে কাঁদে, খেলে পাখির পালক নিয়ে।
সে ঝড়ের সাথে হাসে
সে সাগর-স্রোতে ভাসে,
সে উদাস মনে বসে থাকে জংলা পথের পাশে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত
সে বৃষ্টিধারার সাথে পড়ে গলে,
অস্ত-রবির আড়াল টেনে লুকায় গগন-তলে।
দীপ্ত রবির মুকুরে সে আপন ছায়া দেখে,
সে পথে যেতে যায় যেন কি মায়ার মোহ এঁকে।
ঝরা তারার তীর হানে সে নিশুত রাতে নভে,
ঘুমন্তরে জাগিয়ে সে দেয় বিপুল বজ্র-রবে।

অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত !

সে রঙিন প্রজাপতি
কভু ফুলের দিকে মতি,
কভু ভুলের দিকে গতি
তার রুধির-ধারা নদীর স্রোতের মতো
দেহের কূলে বদ্ধ তবু মুক্ত অবিরত।
রূপকে বলে সঙ্গিনী সে, প্রেমকে বলে প্রিয়া,
রূপ ঘুমালে ঊর্ধ্বে ওঠে আত্মাতে প্রেম নিয়া।

অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত !

মরণকে সে ভয় করে না, জ্ঞানীর সভায় ভয়,—
ভাবের সাথে ভাব করে সে অভাব করে জয়।
তার তরল হাসি সরলভাবে মুগ্ধ সবার মন,
মন ভরে না জ্ঞানীর, করে অর্থ অন্বেষণ।
চোখ আছে যায়, তারি চোখের পাতা টিপে ধরে,
হাতিশালায় যায় না, যায় ফুল ফোটে যে-ঘরে।
তার পথের পথিক সাথী,
তার বন্ধু নীরব রাতি,
খ্যাতির খাতায় চায় না চাঁদা, চাঁদের সাথে খেলে,
সে কথা কহে, মুক্ত-পাখা পাখির দেখা পেলে।

অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত !

তারে জ্ঞান-বিলাসী ডাকে না, তায় গাঁয়ের চাষি ডাকে,
তৃষার জলের পাত্র-সম জড়িয়ে ধরে তাকে।

সে রয় না আন্দোলনে,

যেথা আনন্দ হয় আন্দোলিত যায় সে গোপন বনে।
সে চাঁদের আলো, বর্ষা-মেঘের জল,
আপনার খুশিতে ঝরে আপনি সে চঞ্চল।

সে চায় না ফুলের মালা, সে ফুলের মধু চায়,

সে চায় না তাহার নাম,

দান দিয়ে সে পালিয়ে বেড়ায়

চায় না তাহার দাম।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত !

কেউ যদি তায় ভালো বলে, আলোর বুকে হয় সে লয়,
বলে, 'ওগো সুন্দর মোর, তোমায় বলে, আমায় নয় !'
ছন্দ তাহার স্বচ্ছন্দ, দ্বন্দ্ব মাঝে রয় না সে,
যে বড় তাঁর সুনাম নিয়ে ক্ষুদ্র কথা কয় না সে।
তার মন্দ শোনার নাইকো সময়,
রসের সাথে নিত্য প্রণয়,
তারে নিন্দা দিলে চন্দন দেয়
সে নন্দন-জাদুকর,
সুন্দর সে, তাই দেখে না কাহারেও সে অসুন্দর।
তারে লোভ দেখিয়ে যায় না ধরা,
আপনাকে যে দিতে চায়—
প্রেম-ভিক্ষু দুরন্ত সে লুটিয়ে পড়ে তাহার পায়।
পূর্ণের সে প্রতিচ্ছায়া, অপরূপ সে দুরন্ত,
মন কাঁদে মোর তারি তরে, মন সদা যার উড়ন্ত !

২৩

সালাম অস্ত-'রবি'

কাব্য-গীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, দ্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যানী
মহাকবি রবি অস্ত গিয়াছে ! বীণা, বেণুকা ও বাণী
নীরব হইল। ধূলির ধরণী জানি না সে কত দিন
রস-যমুনার পরশ পাবে না। প্রকৃতি বাণীহীন
মৌন বিষাদে কাঁদিবে ভুবনে ভবনে ও বনে একা ;
রেখায় রেখায় রূপ দিবে আর কাহার ছন্দ-লেখা ?
অপ্রাকৃত মদনে মাধবী চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়া
রূপায়িত রসায়িত করিবে কে লেখনী, তুলিকা নিয়া ?

ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, খৈয়াম, হাফিজ ও রুমি
আরবের ইমরুল-কায়েস্ যে ছিলে এক সাথে তুমি !
সকল দেশের সকল কালের সকল কবিরে ভাঙি
তাঁহাদের রূপে রসে রাঙাইয়া, বুঝি কত যুগ জাগি
তোমারে রচিল রসিক বিধাতা, অপরূপ সে বিলাস,
তব রূপে গুণে ছিল যে পরম সুন্দরের আভাস !

এক সে রবির আলোকে তিমির-ভীত এ ভারতবাসী
ভুলেছিল পরাধীনতা-পীড়ন দুঃখ-দৈন্যরাশি।
যেন উর্ধ্বের বরাভয় তুমি আল্লার রহমত,
নিত্য দিয়াছ মৃত এ জাতিরে অমৃত শরবত,
সকল দেশের সকল জাতির সকল লোকের তুমি
অর্ঘ্য আনিয়া ধন্য করিলে ভারত-বঙ্গভূমি।

তোমার মরুতে তোমার আলোকে ছায়া-তরু ফুল-লতা
জন্মিয়া চির-স্নিগ্ধ করিয়া রেখেছিল শত ব্যথা।
অন্তরে আর পাই না যে আলো মানস-গগন-কবি,
বাহিরের রবি হেরিয়া জাগে যে অন্তরে তব ছবি।
গোলাব ঝরেছে, গোলাবি আতর কাঁদিয়া ফিরিছে হায় !
আতরে কাতর করে আরো প্রাণ, ফুলেরে দেখিতে চায়।

ফুলের, পাখির, চাঁদ-সুরুযের নাহিকো যেমন জাতি,
সকলে তাদের ভালোবাসে, ছিল তেমনি তোমার খ্যাতি।
রস-লোক হতে রস দেয় যারা বৃষ্টিধারার প্রায়
তাদের নাহিকো ধর্ম ও জাতি, সকলের ঘরে যায়
অবারিত দ্বার রস-শিল্পীর, হেরেমেও অনায়াসে
যায় তার সুর কবিতা ও ছবি আনন্দে অবকাশে।

ছিল যে তোমার অবারিত দ্বার সকল জাতির গেহে,
তোমারে ভাবিত আকাশের চাঁদ, চাহিত গভীর স্নেহে !
ফুল হারাইয়া আঁচলে রুমালে তোমার সুরভি মাখে
বক্ষে নয়নে বুলায়ে আতর, কেঁদে ঝরাফুল ডাকে।

আপন জীবন নিঙাড়ি যেজন তৃষ্ণাতুর জনগণে
দেয় প্রেম রস, অভয় শক্তি বসি দূর নির্জনে,
মানুষ তাহারি তরে কাঁদে, কাঁদে তারি তরে আল্লাহ্,
বেহেশ্‌ত হতে ফেরেশ্‌তা কহে তাহারেই বাদ্‌শাহ্ !

শত রূপে রঙে লীলা-নিকেতন আল্লার দুনিয়াকে
রাঙায় যাহারা, আল্লার কৃপা সদা তাঁরে ঘিরে থাকে।
তুমি যেন সেই খোদার রহম, এসেছিলে রূপ ধরে,
আর্শের ছায়া দেখাইয়া ছিলে রূপের আর্শি ভরে।

কালাম ঝরেছে তোমার কলমে, সালাম লইয়া যাও !
ঊর্ধ্বে থাকি এ পাষাণ জাতিরে রসে গলাইয়া দাও !

'মাসিক মোহাম্মদী'
ভাদ্র ১৩৪৮

২৩.ক

আগমনী

আসিল আবার সৌরাশ্বিন—ঘুম-নিমগ্ন সুরলোক,
অঘোরে ঘুমায় এই আশ্বিনে দেব-দেবী সব নিরশোক।
শিয়রে তারার মণি-দীপ জ্বলে মিটিমিটি মৃদু আলোকে,
তিমির-ময়ূর করিছে বীজন স্নিগ্ধ কাজল পালকে।
ঘুম-পাড়ানিয়া গান এক-স্বরা গাহিছে প্রণব ওঙ্কার,
ইন্দ্র-সভায় রণে না সৌর নটীর নূপুর-ঝঙ্কার।
ঝিমায় শ্রান্ত রূপ-উর্বশী নিথর গগন-লগ্না
চাঁদের কপোলে কপোল রাখিয়া, সুন্দর-ধ্যানে মগ্না।
তরলিত তার রূপ-সম্ভার শস্যে পুষ্পে জড়ায়ে,
জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ শ্লথ বাস পড়ে পৃথিবীর বুকে গড়ায়ে।
শতদল-শ্বেত মেঘ-চন্দন-চর্চিত থির আকাশে
দূর দেবতার শুভ্র-উদার প্রশান্তি যেন মাখা সে।
এলোমেলো সুখ-স্বপ্নের প্রায় বলাকা মরালী হংসী
উড়ে উড়ে যায়, নদী-কিনারায় বাজিছে অলস বংশী।

একদা এমনি সৌরাশ্বিনে তন্দ্রালু-আঁখি নন্দন
জেগে উঠেছিল শুনিয়া তাহার দুলালী ধরার ক্রন্দন।

ঘুমায় যখন দেবতা মৌন মহিমায় ছেয়ে মর্ত,
সেই অবসরে বাহির হলো রে পাতাল-তলের দৈত্য।
বিশ হস্তে সে লুণ্ঠন করে, বিষ ছড়ায়ে সে বিশ্বে
দশমুখ দিয়া গ্রাস করে, হানে ত্রাস নিরন্ন নিঃস্বে।
লুণ্ঠন করে, গুণ্ঠন খোলে কুলনারীদের দর্পী,
তার লালসার বহ্নিতে দেয় ধর্ম-পুণ্য অর্পি।
ক্ষুধার অন্ন খায় সে কাড়িয়া, না মানে পরানে শঙ্কা,
ধরারে করিয়া নিরলঙ্কারা সাজায় স্বর্ণ-লঙ্কা।

ধর্ষণে তার থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া ওঠে এ মেদিনী,
রাজার কুমারী গৃহ-বাস ছাড়ি সাজে আরণ্য বেদেনি।
সর্বনাশের উদ্ধত ধ্বজা অসীম ঊর্ধ্বে ধরিয়া
বিদ্রূপ হানে স্বর্গের পানে হয়ে ওঠে ক্রমে 'মরিয়া'।
কৃষক-জনক-কন্যা শস্য-সীতারে হরিয়া গোপনে
বন্দিনী করে ধরার মেয়েরে রাখে সে অশোক-কাননে।

নীরব ধরার অঙ্গন আজি স্বর্ণশস্য-বরণা
সীতা তার আর তোলে নাকো মধু ঝঙ্কার চল-চরণা।
ধনিক-রাবণ ছলে কৌশলে সাগরপারের প্রাসাদে
করিয়াছে অবরুদ্ধ সীতারে, ধরা ছায় ঘন বিষাদে।

হেথা নিপীড়িত-জন-গণ-অধিপতি সে শ্রীরামচন্দ্র
হারায়ে সীতারে জয়-লক্ষ্মীরে জাগিছে একা অতন্দ্র।
সাগরে শুধায়, পাগলের প্রায় খুঁজে ফেরে গিরি-দরী-বন
প্রান্তর মাঠ পথ-বাট-ঘাট ধু-ধু করে শোকে উন্মন।
নাই সীতা, নাই বিজয়-লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী ধরণীর,
আর্ত মানব বেদনা জানায় চরণে দনুজ-দলনীর।
ধরার আত্মা বন্দিনী আজি পিষে যায় কারা-ঘানিতে,
হরিৎ-শস্য-শ্যাম রঘুপতি ফিরায়ে তাহারে আনিতে
করিয়াছে পণ—নর-নারায়ণ ধরাধিনায়ক অবতার,—
সুর-নর-ত্রাসী সর্বগ্রাসী রাবণে করিবে সংহার।

শাল-প্রাংশু ভীম-ভুজে করি বিশাল ধনুকাকর্ষণ
টঙ্কার হানে লঙ্কার পানে করে রোষাগ্নি-বর্ষণ।
দেবতার সম অসুরও অমর রক্তবীজের বংশ
মরিয়া আবার প্রাণ পেয়ে হয় অধিকতর নৃশংস।

দেবতা ঘুমায়, মিনতি জানায় ঘুরে ঘুরে ধরা শূন্যে—
জাগো হে রুদ্র, বেধেছে ভীষণ বিরোধ পাপে ও পুণ্যে!
নিসাড় স্বর্গ তুষারাস্তৃত যোগ-নিদ্রায় মগ্ন,
হয় অপগত মহামুক্তির শুভ মাহেন্দ্র-লগ্ন।
ডাকিছে ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপি বাহু উচ্চারি পূজা-মন্ত্র—
'জাগো রুদ্রাণী, জাগো যোগমায়া' সীতাহারা রামচন্দ্র।

*   *   *   *

*   *   *   *

লাগিল আগুন লোভ- * *
স্বর্ণ-লঙ্কা হলো ছারখার, ওঠে হাহাকার রাজ্যে।
মরিল রাবণ, ফিরিল জানকী অপহৃতা জয়-লক্ষ্মী,
বন্দিরা এল মুক্ত আলোকে, দ্বার খুলে দিল রক্ষী।

অকালে মায়ের সেই যে বোধন শোষক-দৈত্য হরণে
পূজা দিই মোরা মায়ের চরণে সেই শুভদিন স্মরণে।

যুগে যুগে আসে মায়া-রাক্ষস, জন্মিয়াছে সে আরবার,
মন্থন করে ফেরে সে আকাশ-ভুবন সপ্ত পারাবার।

দশদিক জুড়ি দশমুণ্ডের সর্বগ্রাসী গ্রাস তার,—
মরুভূর মতো ক্ষুধাতুর তার রসনা করিয়া বিস্তার
করিছে লেহন, শ্যাম ধরা তাই হলো কণ্টকাকীর্ণা,
চির-যৌবনা শস্যশ্যামা নিপীড়নে জরা-জীর্ণা।
নন্দিনী তার বন্দিনী পুন, ভূমিকম্পের ছলে রে
অসহ পীড়ন-যাতনায় ধরা কাঁপে তাই পলে পলে রে !
প্রার্থনা তার উঠিছে আবার ধূমায়িত হয়ে গগনে,
রুদ্রাণী পুন বর দিবে কবে কে জানে কোন্ সে লগনে।

প্রতীক্ষমাণ নরনারী আছে স্বর্গের পানে চাহিয়া ;
নব-অবতার আসিবে আবার অশ্রু-সাগরে নাহিয়া
মোদের রক্তে রাঙা পথ বাহি, গাহি অভিনব গীতা সে।
বরষ বরষ এই পূজা এই আবাহন নহে বৃথা সে।
আছে আছে এই দুঃখের শেষ, আসিছে জ্যোতির্ময় রে,
হবে এ পুরবে তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয় রে !
মোদের আঁখির নীলমণি এই পুত্রকন্যা নিত্য
অঞ্জলি দিই মায়ের চরণে ছিঁড়িয়া হৃদয় চিত্ত ;
তবু যদি নাহি জাগে সে পাষাণী যোগ-নিদ্রা-নিমগ্ন,
ভৃগুর মতন আঘাত হানিয়া করিব দুয়ার ভগ্ন।

---

* কীটদষ্ট।

'নবারুণ'
২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
কার্তিক ১৩৪১

২৪

সুর-রাখি

তোমার কণ্ঠে বাঁধিয়াছে নীড় সুরের দেশের পাখি—
সুরেশ্বরের হস্তে বাঁধুক তোমার সুরের রাখী।
ঊষসীর বাণী এসেছ বহিয়া আকুল কণ্ঠে পুরে,
ফুলঝুরি-সম তৃষিত ধরায় পড়ুক তাহাই ঝুরে।
হেম-গিরিতলে কাঁদে যে নিঝর প্রকাশের পথ খুঁজি,
তোমার কণ্ঠে গুমরিছে আজো তারি আকুলতা বুঝি !
যে পুব-হাওয়ায় আঁখি খোলে কেয়া, শিহরায় নীপবনে,
সেই বাতাসের বাজিছে আভাস তোমার গুঞ্জরণে।
তুমি আনিয়াছ সুরধুনী ছানি যে-সুরের রূপলীলা
তারি রঙে তুমি অশ্রুর মেঘে করো নিতি রঙ্গিলা।*

শ্রীহট্ট, ৭ই কার্তিক ১৩৩৫

---

* ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম সিলেট গিয়েছিলেন ; সে-সময় তিনি এই কবিতাটি শ্রীমতী লীলাবতী মজুমদারকে লিখে দেন।

২৫

শ্রীমতী রানু সোম

কল্যাণীয়াসু

মাটির ঊর্ধ্বে গান গেয়ে ফেরে
স্বরগের যত পাখি,
তোমার কণ্ঠে গিয়াছে তাহারা
তাদের কণ্ঠ রাখি।
যে গন্ধর্ব লোকের স্বপন
হেরি মোরা নিশিদিন,
তুমি আনিয়াছ কণ্ঠ ভরিয়া
তাদের মুরলি বীণ।
তুমি আনিয়াছ শুধু সুরে সুরে
ভাষাহীন আবেদন,

যে সুর–মায়ায় বিকশিয়া ওঠে
শশী তারা অগণন।
যে সুরে স্বরগে স্তব–গান গাহে
সুন্দর সুরধুনী,
অসুন্দর এই ধরায় তোমায়
কণ্ঠে সে গান শুনি॥
'কবিদা'

বনগ্রাম, ঢাকা
৭ আষাঢ় ১৩৩৫
'কবিতা'
নজরুল–সংখ্যা
কার্তিক–পৌষ ১৩৫১

২৬

চিত্র–পরিচয়

ঘড়ার প্রেম

চপল ঘড়া ছল্‌কে বলে,
টুট্‌ল কোমর সই,
শিরিন সখি, এখন আমি
কপোল–পাশে রই!

২৭

গাজী আবদুল করিম

বন্দি! তোমায় বন্দনা করি
লহ এ অর্ঘ্য তাজ,
তব পরাজয় লজ্জা দিয়াছে
বিশ্বজয়ারে আজ।

২৮

জগ্‌লুল পাশা

নীল দরিয়ার জোয়ার উজান
প্লাবিয়া চলেছে কূল,
ডাক ছেড়ে কাঁদে শ্বেত ফেরাউন—
জগ্‌লুল, জগ্‌লুল !

'বার্ষিক সওগাত'
প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩

২৯

ওমর খৈয়াম

চোখ জুড়ানো গুল্মলতার চিকন পাতা পক্ষসম
ফেল্‌ছে ছায়া নদীর ঠোঁটে, এলিয়ে তনু যথায় তুমি,
আস্তে করে হেলান দিয়ো লতার গায়ে, প্রিয়তম,
উঠছে লতা মাটির তলের কোন্ তরুণীর অধর চুমি !

'সওগাত'
পৌষ ১৩৩৬

৩০

সংকল্প

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে,—
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ–যন্ত্রণাকে ॥

কেমন করে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।

জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝুঁটি
যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি,
কেমন করে আনছে মানিক বোঝাই করে সিন্ধুযানে,
কেমন জোরে টান্‌লে সাগর উথ্‌লে ওঠে জোয়ার-বানে।।

কেমন করে মথ্‌লে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চূড়ে।
তুহিন মেরু পার হয়ে যায়
সন্ধানীরা কিসের আশায়;
হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন্‌ পুরে;
শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্‌ 'মঙ্গল' হ্‌তে আসছে উড়ে।।

কোন্‌ বেদনায় টিকি কেটে চণ্ডুখোর এ চীনের জাতি
এমন করে উদয়-বেলায় মরণ-খেলায় উঠল মাতি!
আয়র্লন্ড আজ কেমন করে
স্বাধীন হতে চলছে ওরে;
তুরস্ক ভাই কেমন করে কাটল শিকল রাতারাতি!
কেমন করে মাঝ-গগনে নিবল গ্রীসের সূর্য-বাতি।।

রইব নাকো বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এ-সব ভুবন ঘুরে—
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশ দিকেতে পড়ব লুটে;
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।।

৩১

চলব আমি হালকা চালে

চলব আমি হালকা চালে
পলকা খেয়ায় হাওয়ার তালে,
কুসুম যেমন গন্ধ ঢালে
তরল সরল ছন্দে রে।

যেমন চলার ছন্দ লুটে
চন্দ্র ডোবে সূর্য উঠে,
সন্ধ্যা সকাল সমীর ছুটে
যেমন সে আনন্দে রে॥

নাই বা হলেম মস্ত ভারি,
নাই হল ঘর লাখ–দুয়ারী,
বিশটে ঘোড়া দশটা দ্বারী
ভিড় যে দেওয়ান গোমস্তার।
ভারিক্কি কি ! উঠতে গেলে
স্কন্ধে করে তুলবে ঠেলে,
মূর্তি দেখেই ছুটবে ছেলে,
চাইনে সে ভার, নমস্কার॥

যে ভার বয়ে রাখাল ছেলে
মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে,
হাতের বেণু দেয় সে ফেলে
একটু যদি ভার ঠেকে।
বসে মাটির সিংহাসনে
মাঠের সপ্ত রাজ্য গোনে,
দুন্দুভি তার বাজছে শোনে
সাত সমুদ্দুর পার থেকে॥

এরোপ্লেন্ ঐ মোষ–গোঙানো
ঢাউস যেন আকাশ–দানো,
বিরাট বিপুল ভয়–দেখানো
চাইনে হতে চাইনে, ভাই !
হালকা পাখার পাল তুলে সে
মরাল ওড়ে আকাশ ঘেঁষে,
পদ্ম যেন চলছে ভেসে,
অমনি পাখায় উড়তে চাই॥

চাঁদের দেশে চরকা বুড়ি
কাটছে সুতো যাচ্ছে উড়ি,
তেমনি উদাস গগন জুড়ি
চলব উড়ে হালকা বায়।

বুদ্বুদ-জল-বিম্ব যেমন
হাওয়ায় উড়ায় রাঙায় কিরণ,
স্বপন-পরীর যেমন উড়ন
তেমনি এ প্রাণ উড়তে চায়॥

মস্ত জাহাজ ব্যস্ত ভারি
সিন্ধু-ডাকাত জাল-পশারি,
মীনের ভীতি ধ্বংসচারী
চাইনে ভাই এ জল-শকুন।
ছন্দ-দোদুল আমার তরী—
আমার তরী সলিল-পরী,
নাচবে ঢেউএর নূপুর পরি,
উজান পানে টানবে গুণ॥

আনব কাগজ আনব কেয়া
গড়ব আমার ঠুনকো খেয়া,
অশথপাতার ভেঁপুর দেয়া
বাজবে ঘন, হাঁকবে জোর—
চাঁদ সদাগর আসছে ওরে
রত্ন-মানিক বোঝাই করে,
সপ্ত ডিঙা ফিরছে ঘরে
ফিরছে বেউলো লখিন্দোর॥

সাবমেরিনের মরণ-নীতি
ভরা ডুবি করছে নিতি,
কুমির হতেও ভীষণ রীতি
ডুব দিয়ে সব খাচ্ছে জল!
আমি হব পানকৌড়ি
সঙ্গে সাথী মীন-গৌরী,
ফিরব ঘুরে জল-দেউড়ি
দেখব জলের শীতল তল॥

ভাবছ বুঝি, বাঃ কি মজা,
রেলের গাড়ির লাইন সোজা
লক্ষ লোকের বইছে বোঝা
ঝড়ির সনে দিচ্ছে রেস্!

আমার ভরসা চরণ-নেয়ে,
মাঠের বাউল চলব ধেয়ে,
পথের সকল ছেলে-মেয়ে
চিনবে আমায় জানবে দেশ॥

আবার পথে ফিরব যবে
সবাই ঘিরে কুশল কবে,
সুদূর আমার নিকট হবে
সকল যে ঘর ইস্টিশান!
বন্দর মোর সকল ঘাটে
গহন বনে ধানের মাঠে,
আমার সহজ ছন্দ-নাটে
বন্ধ সারা সৃষ্টিখান॥

আমার রাখাল আমার চাষি
সবাই বলে—ভালোবাসি।
বিদায়কালে বলি, 'আসি!'
'যাই' এখানে বলতে নাই।
আমার আলাপ জলে স্থলে
সহজ চলায় চোখের জলে,
লতা ছিঁড়ে কুসুম দলে
হয় যে আমায় চলতে, ভাই॥

'মৌচাক'
আশ্বিন ১৩৩৪

৩২

কিশোরের স্বপ্ন

মা! আমারে সাজিয়ে দে গো বাইরে যাওয়ার বেশে,
রইব না আর আঁচল-ঢাকা গণ্ডি-আঁকা দেশে॥

মা! এখানে নাই যে জীবন প্রাণের আবির-খেলা,
আপনাকে যে আপনি মোরা হানছি অবহেলা।

'স্কুলে যাও, চাকরি করো'—
আদর্শ নাই ইহার বড়,
সকালবেলা জেগে ওঠা, ঘুমিয়ে সন্ধ্যাবেলা,
দেশ কোথা, মা ! এ যে শুধু শ্মশান-শবের মেলা॥

জানি না মা, ভালো কিংবা মন্দ ওরা করে,
মরার দেশে তাথৈ নেচে দেশ তাহাদের হরে।
প্রাণের আগুন লাগিয়ে বেড়ায়
প্রাণহীনদের পাড়ায় পাড়ায়,
সেই আগুনের শিখা মা গো এসেছে মোর ঘরে,
আমি তাদের দলের হব, কাঁদি তাদের তরে॥

আমি যাব মৃতের দেশে আঘাত-দেওয়া হয়ে,
জয়ের আশা জাগবে তাদের হয়তো পরাজয়ে।
যাব চেকোশ্লোভাকিয়ায়
চীন জাপান ও দূর রাশিয়ায় ;
যৌবনেরই অগ্নিমন্ত্রে আসব দীক্ষা লয়ে ;
লাগিয়ে আগুন ভাগিয়ে দেবো ভাগিয়ে দেবো ভয়ে॥

মা গো, তুমি ভয় করো না, আমি মরিই যদি,
স্রোতের মুখে আপনি ভেসে আনব বয়ে নদী।
মা গো আমি হারিয়ে গেলে
জাগবে দেশে যে সব ছেলে,
তাদের মাঝে পুত্রে তোমার দেখবে নিরবধি।
কোটি ছেলে পাবে মা গো আমি হারাই যদি॥

ম্যালেরিয়ায় ভুগব না মা—মরব না তোর কোলে।
ডাকতে তোরে দেবো না মা, চাকরের মা বলে।
রাজরানি মা করব তোরে
ত্রিভুবনের রত্ন হরে,
তারি তরে পাড়ি দেবো সাত সাগরের জলে,
লঙ্ঘি মরু গিরি দরী যাব আমি চলে॥

আমার দেশের সকল মাতা কাঁদবে আমার তরে
ভাববে তাদের আপন ছেলে গেছে দেশান্তরে।

আমার দেশের প্রসাদ পেয়ে
দেশ-বিদেশের ছেলে-মেয়ে
ধন্য হতো আগে যেমন, তেমনি আজও হবে ;
তোমার পুত্র না যদি রয় (তাহার) আশার স্বপ্ন রবে ॥

৩৩

জিজ্ঞাসা

রবো না চক্ষু বুঁজি
আমি ভাই দেখব খুঁজি
লুকানো কোথায় কুঁজি
দুনিয়ার আজবখানার !

আকাশের প্যাঁটরাতে কে
এত সব খেলনা রেখে
খেলে ভাই আড়াল থেকে,
সে তো ভাই ভারি মজার।

কেমনে যাচ্ছে উড়ি
চাঁদের ঐ ছিলে-ঘুড়ি ?
কে অচিন সুতোয় জুড়ি
এ ঘুড়ি নিত্য উড়ায় ?

সূর্যের লাটিম ছুঁড়ে
কে ঘুরায় গগন জুড়ে ?
সারা দিন মগন ঘুরে
কে কুড়ায় সন্ধ্যায় তায় ?

কোন্ সে দুষ্টু ছেলে
তারকার পিদিম জ্বেলে
সারা রাত আগুন খেলে
উল্কার গুলতি ছুঁড়ে ?

বনানীর আঁধার মুঠে
কার রঙ-মশাল টুটে,

জোনাকির ফিনিক ফুটে,
যেন চাঁদ-চূর্ণ উড়ে !

সে কোথায় কোন্ মহলে
আলোকের পায়রা দোলে,
আঁধারের গরুড় চলে
প্রভাতে কোন পাহাড়ে ?

এ মাটির কোন সে ফাঁকে
কুসুমের গন্ধ থাকে,
ফলেদের পীযূষ রাখে
সু-রসাল কোন সে ভাঁড়ে ?

সে কে ভাই রাখাল ছেলে
এত সব খেলনা ফেলে
নিরালায় একলা খেলে
উদাসীন গহন-ছায়ায় ?

নিশিদিন কানন গিরি
তাহারেই খুঁজে ফিরি,
বাঁশি তার আমায় ঘিরি
কেবলই যায় কেঁদে যায়॥

৩৪

সারস পাখি

এক

সারস পাখি ! সারস পাখি !
আকাশ-গাঙের শ্বেত কলম !
পুষ্প-পাখি ! বায়ুর ঢেউ-এ
যাস ভেসে তুই কোন মহল ?
তোরে ময়ূরপঙ্খী করি
পরীস্থানের কোন কিশোরী
হালকা পাখার দাঁড় টেনে যায় ?
নিম্নে কাঁপে সায়র-জল।

গগন-কূলে ঘুম ভেঙে চায়
মেঘের ফেনা অচঞ্চল !

দুই

দিঘির তীরের কুমুদ-কুঁড়ি,
রাঙা চরণ মৃণাল তোর।
তুলতে এসে চমকে ওঠে
মাঠের রাখাল থল্-ভোমোর।
পালক-মুকুল পাপড়ি খুলি
যাস উড়ে তুই লহর তুলি,
খোকা ভাবে চাঁদ উড়ে যায়,
চাঁদ ভাবে তুই ফুল-চকোর।
চঞ্চুতে তোর জল ঢেলে দেয়
নীল যমুনার মেঘ-কিশোর !

তিন

কানন-শাখার নীড়-খসা ফুল !
দুলবি রে তুই কণ্ঠে কার ?
দিগ্‌বালিকার মুক্তামালা,
ভাদর-দিঘির চন্দ্রহার !
আকাশ-খুকির রূপার ঘুমুর !
যাস নেচে তুই ঝুমুর ঝুমুর,
তমাল ভাবে শুভ্র ময়ূর,
ময়ূর ভাবে মেঘ-তুষার।
দিবাশেষের বিদায়-বাণী
আনন্দগান শ্বেত উষার॥

'শিশু-মহল'
প্রথম সংখ্যা ১৩৩৪

৩৫

মাঙ্গলিক

ভোরের বেলায় পুব-গগনে সূর্যি ঠাকুর দেন উঁকি—
বলেন, 'অলস, জড়ের মতন বসে বসে করছ কি ?

আমার আকাশ–মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়,
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।
ক্রমেই যত উর্ধ্বে উঠি, ততই আমি হই প্রখর,
শক্তি–তেজের উজল দ্যুতি ছড়াই বিশ্ব–ভুবন 'পর।
রঙে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঁঝে অস্ত যাই,
ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে, যাবার বেলা দেখতে পাই।
তোমার জীবন এমনি হবে শৈশবে আনন্দময় ;
যেথায় যাবে, সেথায় যেন নূতন প্রাণের লহর বয় !
তোমার শক্তি–তপস্যাতে আসবে কাছে উর্ধ্বলোক,
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দিবে ত্রিজগতের দুঃখ–শোক !
এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়
করবে মোচন শক্তি দিয়ে শৌর্য দিয়ে, হে দুর্জয় !
দেশের জাতির লজ্জা গ্লানি কলঙ্ক ও অসম্মান
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ !
যে–সব আত্ম–অবিশ্বাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়,
তোমার ডাকে আসবে ছুটে, হে তেজোবীর, হে দুর্জয় !
যে আদর্শ মানুষ আজও জন্মেনিকো এই ধরায়,
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়।
সূর্য–সম শেষ জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক্,
যুক্ত–করে বিশ্ব–নিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক।
অস্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখে অন্ধকার,
হারিয়ে তোমায় কাঁদবে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরার।

৩৬

লক্ষ্মী ছেলে তাই তোলে !

ঘরের আড়াল ভেঙে এবার বাহির ভুবন লুটতে চাই,
জীবন হলো জেল–কয়েদি আড়াল টেনে সর্বদাই।
নিষেধ বাধা মেনে মেনে বুকের ভিতর ধরল ক্ষয়,
প্যাঁচার চেয়েও হলাম অধম, সন্ধেরাতে চলতে ভয়।

তেঁতুল গাছে জোনাক জ্বলে, মা বলে, 'দেখ্ দেখ্ খোকন,
"সতর–চোখির মা" তাকায় ঐ, হালুম করে ধরবেখন।

তাল-তলাতে যাসনে বাবা, 'একানোড়ে' ভূত থাকে,
বেল গাছে রয় বেহ্মদোত্যি—ঘাড় ভেঙে খায় পায় যাকে !'

রাত্রিবেলা ডাকলে পেঁচক কুকো পাখি ভূত্‌ভুতুম্‌,
মা বলে, ঐ বাচ্চা ভূতের, শুনেই বাছার কাবার ঘুম !
দুপুরবেলা ঝুলি-কাঁধে ছেলে-ধরার দল বেড়ায়,
জুজুতে সে যেখান-সেখান, একলা পেলেই গিলতে চায়।
জলের ভিতর? বলিসনে আর ! মালসা-মাথা জল-দানো,
নামলে জলে অমনি গপাস্‌ ! তারপরে ঘাড় মটকানো।
গোরস্থানের পাশ দিয়ে যাস—মামদো-ভূতের আড্ডা যে !
শ্মশান-ঘাটার প্রেত পেত্নি মানুষ ধরে মাছ ভাজে !

মাঠের পথে যাসনে বাবা, একটু একা দেখবে যেই
শ্যাওড়াগাছের শাঁক-চুন্নি ধরবে ঠেসে, রক্ষে নেই !
উপর পানে তাকাসনে বাপ, উড়ছে সদাই জিন-পরী,
খাটিয়া-সমেত উড়িয়ে নেবে কন্ধ-কাটা কিন্নরী !
ভূত-পেরেত আর পিশাচ খবিস যক্ষি দানব দশটা দিক
অলক্ষ্যে সব আগলে আছে, ভাগলে বাঁচাও নেই মানিক !

এমনি করে মোদের মহৎ জীবন শুরু ; চলতে তাই—
এক পা যেতেই দু'পা পিছোই, তিনবার তায় হোঁচট খাই।
সিজার খালেদ প্রতাপ কামাল নেপোলিয়াঁ ওয়াশিংটন
এই করে কি জন্ম নেবে? করবে দেশে বীর সৃজন?
খোকার বুকে বাসা বাঁধে যে ভূত, তাহার সিংহাসন
অক্ষয় হয়, রাজ্য চালায় খোশ্‌হালে সে ভর-জীবন !

খোকার গণ্ডি পেরিয়ে যখন হলাম বালক, আরেক ভূত
পণ্ডিত মশাই রক্তনেত্র ধরেন বেত্র—যমের দূত।
মারের চোটে জ্ঞান যা হলো তার চাপে হায় সব সাহস
শরীর ছেড়ে বিদায় নিল, শুষ্ক হলো প্রাণের রস।
যেমনি হলো কিশোর বয়েস, অমনি অভিভাবক দল
বকেন যত বাঁধেন তত নানান ছাঁদে দেন আগল।

ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে নয়ন তাঁদের নিদ্রাহীন,
ছেলের শরীর চুপসে গেল ! দেখোই বাপু, রও দু'দিন ;

দেখবে ছেলে লক্ষ্মী কেমন, হোক না এখন হাড়্ডি সার,
আস্তে কথা, নেইকো হাসি, বধূর মতো লজ্জা তার!
যেই দেখে সে গুরুজনে, অমনি মাথা হয় নিচু,
মারামারির ধার ধারে না—গোলমালে রয় সব পিছু।
চরিত্র তার? সোনার ছেলে, পড়ার ঘরের বাইরে তায়
পুরুষই হায় পায় না দেখা, এমন ছেলে কজন পায়।

যৌবনে সে বীর হলো না দেশের গরব? মার কোলে
বিশ বছরে তুলছে পটল? লক্ষ্মী ছেলে তাই তোলে।

'শিশু-মহল'
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৪

৩৭

ছোট হিটলার

মা গো! আমি যুদ্ধে যাব, নিষেধ কি মা আর মানি?
রাত্তিরে রোজ ঘুমের মাঝে ডাকে পোল্যান্ড্ জার্মানি।
ভয় করি না 'পোলিশ'দেরে জার্মানির ঐ ভাঁওতাকে,
কাঁপিয়ে দিতে পারি আমার মামার বাড়ি 'তেওতা'দে।

রাইফেলকে ভয় করে কে? বগল-দাবা এয়ার-গান,
এক গুলিতে উড়িয়ে দিতে পারি কত মিঞার কান।
গুলতি মেরে ফেলতে পারি ঝুলতি-ন্যাজা এরোপ্লেন,
দেখলে মোরে, বলবে ওরা: 'ছোট হিটলার বেরুচ্ছেন!'

চোখ পাকিয়ে এগোই যদি বলবে কেঁপে সব মশাই,
'মুসোলিনির মেসো এবার যুদ্ধে এলেন, রক্ষে নাই!
রাগে-ঘোলা চোখ দেখে মোর গোলাগুলি বারুদ বম্—
ঠাণ্ডা মেরে হয়ে যাবে কুল্পি-বরফ যেইরকম!

"ট্যাঙ্ক" থোড়াই কেয়ার করি, ল্যাং মারা মোর এই যে ঠ্যাং
এই ঠ্যাঙে ট্যাঙ্ক্ ছুঁড়ব যেমন লাথিয়ে ছুঁড়ি কোলা ব্যাঙ্।
এ 'শেল' ও 'শেল' হেঁসেল, জানি সব শেলেরই আগুন-তাত,
দেখলে আমায় সব বোমারু হবেন ঠুঁটো জগন্নাথ!

গ্যাস-বোমাকে ভয় কি মা গো, আমি স্বয়ং ব্যাস ঋষি,
ফুস্‌মন্তর ফুঁকব এমন গিলবে সে গ্যাস পাঁচ শিশি !
খামোখাই 'গ্যাস-মান্‌ক' সবে বাক্‌সো ভরে রাখছে রে,
আমার মুখোশ দেখলে সিঙ্গি যায় পালিয়ে ডাক ছেড়ে !

কামান ? শুধাও, রনু , অনু, নণ্টু, হাঁদা বেশ জানে,
কামানটাকে ঘোড়া করে চড়েছিলাম ময়দানে।
আমি ছিলুম আরেক জন্মে রঘু-ডাকাত নাদির শা,
যুদ্ধে যাব শুনে মা গো পাড়ার ছেলের যা ঈর্ষা !

কোল-ন্যাওটা তোমার 'নিনি' তোমার নামে আধখানা,
তোমার 'সানি' যুদ্ধে যাবে মুখটি করে চাঁদপানা !
রাত্রে যেথায় হয় না লড়াই, রাত-কানা সব নাৎসি পোল,
না-হয় হলোই রাতে লড়াই ! বাজে যা সব ঢক্কা-ঢোল।

ঐ আওয়াজেই ঘাবড়ে গিয়ে বেরোয় না ভূত-পেত্নি সব,
যত ভূত এই বাংলাদেশে ; নির্ভূত সে দেশ আজব !
ঐ হিটলার মুস্‌ল যদি জন্মাত মা এই দেশে,
হেসো না মা, ভূতের ভয়ে শুতো বাবার কোল ঘেঁষে।

ভূত যদি মা থাকে সেথায়, দেখো মা গো এক-সেদিন
আনব বেঁধে ঐ হেঁসেলে মশলা পিষবে মুসোলিন্‌ !
হাঁটু ভেঙে আনব আমার বিটলে ভাই ঐ হিটলারে,
উড়ে বামুন করব তারে, দেখো আসছে সোমবারে ! !

৩৮

নতুন পথিক

নতুন দিনের মানুষ তোরা
আয় শিশুরা আয় !
নতুন চোখে নতুন লোকের
নতুন ভরসায়।
নতুন তারার বেভুল পথিক
আসলি ধরাতে

ধরার পারে আনন্দ-লোক
দেখাস ইশারায়।
খেলার সুখে মাখলি তোরা
মাটির করুণা,
এই মাটিতে স্বর্গ রচিস,
তোদের মহিমায়।

'রাজভোগ'
আষাঢ় ১৩৩৫

৩৯

এস মধুমেলাতে

'মধুরে'র 'মাধুরী'র দল,
এস পালকের মতো উড়ুক্কু বালক ও বালিকা
চঞ্চলা কিশোরী, কিশোর চপল।
এস মধু-মেলাতে আনো আনো শারদ-আনন্দ,
এস শারদীয়া শতদল, শাপলা শিউলি হয়ে,
নয়নের মিষ্টি দৃষ্টি, অঙ্গের লীলায়িত ছন্দ,
প্রাণের জীবন্ত জ্যোতির প্রদীপ লয়ে।

এস মধু-মেলাতে—
খেলতে ও খেলাতে
প্রৌঢ় ও জরাজীর্ণ যত বৃদ্ধে
লয়ে তনু-ভরা তৃপ্তি, শক্তির দীপ্তি,
ডেকে আনো সাথে ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধে।

আনো আনন্দ-বন্যা, ঝিলিমিলি ঊর্মিলা ঝিল-ঝর্নার,
আনো মধু-মেলাতে আশিস-সম্ভার
শ্রীশ্রী দুর্গার অপর্ণার॥

৪০

নতুন খাবার

কম্বলের অম্বল
কেরোসিনের চাট্‌নি,

চামচের আমচুর—
খাইছনি নাৎনি ?
আমড়া—দামড়ার
কান দিয়ে ঘষে নাও,
চামড়ার বাটিতে
চটকিয়ে কষে খাও !
শেয়ালের ন্যাজ
গোটা দুই প্যাঁজ
বেশ করে ভিজিয়ে,
ঘুট্ করে খেয়ে ফেলো !
মুখে কোন্ কথা এল ?
'কি মজার চীজ্ই এ !'
ঝুম্‌কোলতার পাতা
লাল পুতুলের মাথা
বেঁধে কারো টিকিতে,
ঢেঁকিতে বেশ করে
পাঁড় দিয়ে তার পরে
খেয়ো মেখে 'সিকি'তে !
দাদার গায়ে কাদা
সাথে ছেঁচা আদা
খুব কষে মাখিয়ে,
বেরালির নাকে
কিংবা কারু টাকে—
খেয়ো দেখি নেচি করে পাকিয়ে !

'ইন্দ্রধনু'
১৩৬৯

৪১

শিশু-সওগাত

ওরে শিশু, ঘরে তোর এল সওগাত,
আলো পানে তুলে ধর ননি-মাখা হাত !

নিয়ে আয় কচি মুখে আধো আধো বোল,
তুল্‌তুলে গাল-ভরা টুল্‌টুলে টোল।
চক্‌চকে চোখে আন আলো ঝিকমিক,
খুলে দে রে তুলে দে রে আঁধারের চিক।

বাঁধ ভেঙে ছুটে যায় দস্যুর দল,
মরা গাঙে নিয়ে আয় জোয়ারের জল !
ধরাতল টলমল পদভরে তোর,
লুঠ কর্ গুলবাগ নওল কিশোর।

তোরে চেয়ে নিতি রবি ওঠে পুরবে,
তোর ঘুম ভাঙিলে যে প্রভাত হবে।
ডালে ডালে ঘুম-জাগা পাখিরা নীরব,
তোর গান শুনে তবে ওরা গাবে সব।
পরাতে না পেয়ে তোর নয়নে কাজল
আকাশের নীল চোখ করে ছলছল।

তোর দিন অনাগত, শিশু তুই আয়,
জীবন-মরণ দোলে তোর রাঙা পায়।
তোর চোখে দেখিয়াছি নবীন প্রভাত,
তোর তরে আজিকার নব সওগাত।

'শিশু-সওগাত'
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
মাঘ ১৩৪৪

৪২

ঝুম্‌কোলতায় জোনাকি

ঝুম্‌কোলতায় জোনাকি—
মাঝে মাঝে বিষ্টি গো
আবোলতাবোল বকে কে
তারও চেয়ে মিষ্টি গো
মিষ্টি, মিষ্টি।

আকাশে সব ফ্যাকাশে
ডালিম-দানা পাকেনি,
চাঁদ ওঠেনি কোলে তার
মা বলে সে ডাকেনি।

রাগ করেছে বাঘিনী
বারো বছর হাসে না,
স্বপ্ন তাহার ভেঙে যায়
খোকা কেন আসে না।
পাথর হয়ে আছে—ঝিনুক দুধের বাটি দোলে না
মাকে বলে—'খোকা কই
কিছুই খেলা হলো না!
কিছুই ভালো লাগে না!'

কেঁদে বলে ঘরের জিনিস—'যেমন ছিলাম তেমনি আছি—
খোকা কেন ভাঙে না,
কিছুই ভালো লাগে না।'

৪৩

কোথায় ছিলাম আমি

মা গো! আমায় বল্‌তে পারিস কোথায় ছিলাম আমি—
কোন্ না-জানা দেশ থেকে তোর কোলে এলাম নামি?
আমি যখন আসিনি, মা তুই কি আঁখি মেলে
চাঁদকে বুঝি বলতিস—ঐ ঘর-ছাড়া মোর ছেলে?
শুকতারাকে বলতিস কি, আয় রে নেমে আয়—
তোর রূপ যে মায়ের কোলে বেশি শোভা পায়!
কাজলা দিঘির নাইতে গিয়ে পদ্মফুলের মুখে
দেখতিস কি আমার ছায়া, উঠত কাঁদন বুকে?
গাঙে যখন বান আসত, জানত না মা কেউ—
তোর বুকে কি আসতাম আমি হয়ে স্নেহের ঢেউ?
ঝড় আসত, তুই ভাবতিস দুরন্ত ঐ ছেলে
শান্ত হবে খোকা হয়ে আমার বুকে এলে!
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিভে যেত তুলসিতলায় যেতে,

দীপের শিখা চাইতিস তুই ধরতে আঁচল পেতে ;
ঠাকুর কি মা বলত তখন বাজিয়ে যেন বাঁশি
দীপের আলো আসবে হয়ে তোমার খোকার হাসি !
ঠাকুর বুঝি বলত, 'মা গো, তোর প্রণামের দেনা
শোধ করতে খোকা হব, রইব চির-কেনা !'

বুঝতে নারি, মন কেন মা এমন অধীর হয়,
আকাশ বাতাস এই পৃথিবী সবাই যেন কয়—
'তুই যে আমার, এই তো সেদিন আমার বুকে ছিলি।'
বর্ষার মেঘ ডাকে, খুলে বিজলি-ঝিলিমিলি।

আকাশ বলে, তোকে, ছুঁতে নুয়ে আমি থাকি,
এই তো সেদিন তুই ছিলি এই নীল আকাশের পাখি !
বাতাস বলে, আদর করে হাত বুলিয়ে গায়
আমার বুকের খোকা রে তুই আমার বুকে আয় !
ঝরা ফুলে খুঁজি আমি, দীপ নিভিয়ে দেখি
এই কি চির-চঞ্চল মোর, আমার খোকা এ কি !
বহ্নি বলে, প্রদীপ হয়ে ঘরে ঘরে খুঁজি,
যে খোকারে দেখি—ভাবি আমার খোকা বুঝি।

জলের ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ি নদীর দিঘির জলে
ঢেউ দিয়ে সে জড়িয়ে ধরে, কত কথা বলে !
এই পৃথিবীর মাঠ ঘাট পথ সবাই বলে জানি
আকাশ-পারের শূন্য থেকে তোরে কোলে টানি।
যা দেখি মা, আজ মনে হয় সবই মায়ের কোল
বিশ্বভুবন কোলে করে আমারে দেয় দোল।
নীড়ের পাখি যেমন মা গো আকাশ পানে ধায়,
আকাশ পেয়ে খানিক পরে নীড়কে আবার চায় ;
তেমনি যেন স্বপ্নে আমি ভুবন ঘুরে আসি,
মা গো, তবু সবার চেয়ে তোমায় ভালোবাসি।
তুমিই তো মা ছড়িয়ে আছ বিশ্বময়ী হয়ে,
তুমিই নাচাও, তুমি খেলো আমায় কোলে লয়ে।
মোর এ স্বপন মিথ্যা নহে, মা গো আমায় বল্,
এ কি, কেন চোখ দিয়ে তোর ঝরে এত জল ?

৪৪

বর প্রার্থনা

সবাইকে তুই বর দিলি মা, পাষাণ রাজার ঝি!
আমি ভিড় ঠেলে যে যেতে নারি, বর পাব না কি?

এই শিয়ালগুলোয় ভাঙা বেড়া কে দেখাল বল্?
কাছা খুলে ছুটছে যত আকাল হুড়োর দল!
দূরে থেকেই বলছি মা গো (আঃ কি গণ্ডগোল!)
তুই কি শুনতে পাবি মা গো বাজছে যা ঢাক-ঢোল!
বেশি কিছু চাইনে আমি, চাইব নাকো যা তা,
মা, ঘোল ঢালতে পারি যেন মুড়িয়ে দুখের মাথা।
তোর সিঙ্গিটাকে দে মা ছেড়ে এক মিনিটের তরে,
আমার যত পাওনাদার মা, সব কটারে ধরে
ঠেসে গোটা কতক করে মেরে আসুক থাবা,
মনের সুখে বলব, 'বাপু, আর কি টাকা চাবা?'

ঐ খাঁড়াটা নিয়ে মা তোর করতে পারিস তাড়া?
বাড়িওয়ালা আসবে যখন চাইতে বাড়ি-ভাড়া?
টাকার তেমন খাক্‌তি নাই মা, মাসে দশটি হাজার—
পাঠিয়ে দিস্ মা, ভেবে নেব, ধন পেয়েছি রাজার।
ছেলে হবে জজ্ ম্যাজিস্টর, মেয়ে হবে রানি;
আমার যত শত্রু গিয়ে জেলে টানবে ঘানি!

রাত্রে যেন কামড়ায় না মা, ছারপোকা আর মশা,
আর দিনের বেলায় সইতে না হয় গায়ে মাছি বসা।
মা, খাবার কথা বলি যদি, ভাববি পেটুক ছেলে—
আমি ভাত না খেয়েও থাকতে পারি পোলাও লুচি পেলে!
মাছের মুড়ো, মাংসের ঝোল, পাঁচটা ভাজাভুজি,
হ্যাঁই দেখো মা, দই সন্দেশ বলিনিকো বুঝি?
দেখ্‌লি তো মা, খাওয়ার আমার ইচ্ছেই নাই মোটে,
পেটুক বলে কলঙ্ক মোর তবু গেল রটে।
কাঁহাতক আর বেড়াই মা গো, হেঁটে হটর হটর,
পেট্রল যাতে খায় না, দিবি এমনি একটা মোটর।

জানিস তো সন্ন্যাসী হব আমি দু'দিন পরে,
একটা কথা বলে রাখি, রাখিস মনে করে—
তোর বৌমার বাক্‌স ভরে গা ভরে দিস গয়না,
পাঁচটা লোকে তোর নামে মা মন্দ যেন কয় না।

আমিও যুদ্ধে যেতে পারি, তোরই তো মা ছেলে,
পারি অসুর দানব খেদিয়ে দিতে, ভুঁড়ি দিয়েই ঠেলে !
বলিস যদি ল্যাং মেরে মা ফেলেও দিতে পারি,
কিন্তু তোকে কাঁদিয়ে মা গো যুদ্ধে যেতে নারি।

নাতি–পুতি রেখে, ও মা, একশো বছর পরে
এই সংসার ছেড়ে না হয় যাব তোরই ঘরে !
আরো অনেক চাওয়ার ছিল, দিলাম সে সব ছেড়ে—
নয় তো মা গো বলবি : 'খোকা বড়ো একল্ ষেঁড়ে !'

৪৫

আমি যদি বাবা হতাম বাবা হতো খোকা

আমি যদি বাবা হতাম, বাবা হতো খোকা !
নাহলে তোর নাম্‌তা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।
রোজ যদি হতো রবিবার
কি মজাটাই হতো না আমার
থাকত না আর নামতা পড়া লেখা আকাজোঁকা
আমি যদি বাবা হতাম্, বাবা হতো খোকা।

৪৬

বগ দেখেছ?

হ্যালো পুটে, হ্যালো হাঁদা ?
হ্যালো ন্যাড়া, ঘুঁটে খাঁদা !
বগ অর্থাৎ বগ্‌লা অর্থাৎ কুঁজো পাখি সাদা পাখা।

রামার বুড়ো, দাদা মশাই, মামার খুড়ো
থুত্থুড়ো নুনুড়ো যেমন সুঁট্‌কো বাঁকা!

বুঝলে নাকো? আচ্ছা রোসো, উবু হয়ে সাম্‌নে বসো,
কাছিম যেমন বাড়ায় গলা তেমনি করে ঘাড়টা বাঁকাও
বাঁ হাতটা গুটিয়ে রেখে উপর দিকে কেৎরে তাকাও।
ঠোঁট দুটোকে ঘোঁচ করো, এই চঞ্চু হলো,
এমনিতর বগ দেখেছ? দেখোনিকো? কি যে বলো!—

আচ্ছা রোসো, কনুই বাঁকাও, কনুইএ চা-খড়ি মাখাও,
'দা'এর মতন বক্র করো হাতের চাটু
'দা' দেখনি? দেখেছ তো 'দ' অক্ষর' ভগ্ন হাঁটু?
ময়দার লেই দিয়ে হাতে লাগাও তুলো,
সাপের ফণার মতো করো হাতের নুলো!
ঠিক হয়েছে! এবার যাকে দেখতে পাবে
সামনে এবং পিছনদিকে হাতটা নেড়ে বগ দেখাবে।
(হুরর্‌ বগ দেখেছ!)

এখনো ছাই বুঝলে নাকো?
আচ্ছা আমিই বগ দেখাব, একটু থাকো—
ঠাকুর দেখে যেমন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করো,
মাটির 'পরে নোয়াও মাথা গুটিয়ে শরীর তেমনিতর।
গলায় বাঁধো বাঁশের লাঠি,
তার উপরে তেলের বাটি, রেখেছ তো? লক্ষ্মী ছেলে
এইবার বগ দেখতে পেলে!
তুমি হলে বগের দেহ, বাঁশটা হলো গলা,
তেলের বাটি বগের মাথা, এমনি পাখি রঙটা ধলা,
বগ দেখেছ শ্রী বগলা?
সারাটা ঘর নাক ঘেঁষড়ে খানিক ঘোরো,
বগের কিন্তু কান লম্বা, কান দু'টোকে টেনে ধরো,
লাগছে কানে? লাগছে নাকি? লাগবেই তো!
বগও বলে, লাগে তাহার, বগ দেখালাম তোমায় এই তো!
কি বলছ? হ্যাঁ নিশ্চয়ই বগও হাঁটে, বসে, ওড়ে,
শোয় কি না তা জানি নাকো, বেড়ায় গরুর পিঠে চড়ে।

অসুখ থেকে উঠে তুমি বসো যখন রান্নাঘরে,
খাবার জিনিস দেখলে যেমন নোলা দিয়ে লালা ঝরে,

তেমনি করে পগারপাড়ে, বিলের আড়ে নদীর ধারে
মাছের আশায় হ্যাংলামার্কা বগ্‌লা থাকে বসে
শ্রী বগ—যারে 'বাপিত' পাখি বলে গরু মোষে।

গরু মোষের কানের খইল বের করে সে খায়,
বগ অর্থাৎ বগ্‌লা পাখি, দেখোনিকো তায়?
কি বলছ? কানের খইল খেতে ভীষণ তেতো?
খইল খেতে কে বললে তোমায়? ভারি জ্বালা এ তো!

আরে রোসো, রাগছ কেন? কি কও আমি ঠগ?
তোমায় কানের খোল খাওয়ালাম?
এই তো দেখলে বগ!
পণ্ডিত মশাই সুঁট্‌কোমুখো,
হাতে নিয়ে খেলো হুঁকো,
দেখেছ তাঁকে, যখন ঝিমান ঘাড়টি গুঁজে?
বগ দেখাব তেমনি করে, বসো চক্ষু বুঁজে।
হুকো হলো বগের গলা, তুমি হলে বগ,
তোমার মাথায় আদা, খাঁদা নাকটায় ঠক্ ঠক্!
লাগছে? তা লাগবেই তো! বগও বলে লাগে,
টাকে যখন ঠোক্‌রায় তার ফিঙে এবং বাগে।
কি বলছ? পাখির নামে দেখাই শুধু ফাঁকি?
সত্যিই তাই, এরেই বলে বগ দেখেছ নাকি?

৪৭

ফ্যাসাদ

শয্যা ছেড়ে নিত্য ভাবে গোম্‌রা-মুখো পেসাদ,
এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকা মস্ত একটা ফ্যাসাদ!
রাত থাকতে সুয্যি ওঠে ঘুমোয় বলো কখন্!
তার ওপরে জ্বালায় হরে, 'বেলা হলো খোকন।'
সবার দেখি অনিদ্রা রোগ, রাত থাকতে ওঠে,
ব্যস্তবাগীশ ফুলগুলো সব ভোর না হতেই ফোটে।

শালিকগুলোর কিচিরমিচির জ্বালার ওপর জ্বালা,
ওদের তো সব হয় না যেতে মোর মতো পাঠশালা!

উঠ্‌ল যদি—শরীরটাকে ছালার ভিতর পোরো,
হাত মুখ ধোও, হামা দিয়ে জামায় ঢুকে ঘোরো !
মানুষ না সব, বালিশ যেন জামার ওয়াড় আঁটা,
বালিশ শুয়ে আলিস করে, মানুষের কাজ হাঁটা !

পা দুটো নয় নিজের যেন, কাঠের ঠেকো বুঝি,
চলেছে তো চলেইছে সব নাকের সোজাসুজি !
উঠলে না হয় ঘুম হতে সে, হাত মুখও নয় ধুলে,
শরীরটাকেও না হয় দিল জামার ভিতর তুলে ;
তারপরে যাও পাঠশালাতে, সেথায় আবার থাকে
এক যে জুজু, গুরুমশাই সবাই বলে তাকে।
নাকের ডগায় চশ্‌মা তাঁহার, মাথার ডগায় টিকি,
হাতের ডগায় কঞ্চি বাঁশের, তাই দেখি আর লিখি।

গেল না হয় পাঠশালাতে, খেল না হয় বেতও,
নাম্‌তা বলো, অঙ্ক কষো—ভারি জ্বালা এ তো !
দুয়ে দুয়ে চার না হয়ে তিনই যদি হলো,
তোমার আমার কার কি গেল, কে বুঝাবে বলো !
কে বলেছে তিন সাত্তে একুশ হতেই হবে,
পণ্ডিত মশাই বলবেন যা সেই কথাটাই রবে ?
দন্ত্য স-এর জায়গাতে নয় তালব্য শ-ই হলো,
এতেই হলো অশুদ্ধ সব ? কি ফ্যাসাদ ! যা মলো !

বাড়ি এসে আর এক ফ্যাসাদ, ঝি-বেটি না ধরে,
আচ্ছা কষে চুবিয়ে দিল গাম্‌ছা-ডলা করে !
গরু-খেদানো খেদিয়ে আসে কথায় কথায় বাবা,
বাবায় ছাড়ে কাকায় ধরে, ফ্যাসাদ ! কোথায় যাবা ?
বিকেলবেলায় খেলতে যাব, মা পথে হন বাধা,
মা যদি বা থামেন, এসে কর্ণ ধরে দাদা।
সাঁঝ না হতে পড়ার তাগিদ তাড়ার ওপর তাড়া,
একটু যদি রাত্রিবেলায় বেড়াতে পায় পাড়া !

বাবার, মায়ের হুম্‌কি সমান—ঘুম যদি না আসে,
হাসতে নারে হাসির চোটে পেট যদিও ফাঁসে !
চুলগুলো সে রাখ্‌বে বড়—বাবায় নাপিত ধরে
ন্যাড়া করে দেয় মাথা হায় ‘আম্‌ড়া-ভাতে’ করে।

লুকিয়ে সিগার খেতে গিয়ে এল এমন কাশি,
ছুটে এল যেথায় ছিল যত পিসি–মাসি !
আমবাগানে গেল যদি কর্‌ল তাড়া মালি,
বুড়িকে তার চলা দেখায়, সে দেয় গালাগালি !

বেঁচে থাকার ফ্যাসাদ দেখে পেসাদ ভাবে মনে,
আজ বাদে কাল চলে যাবে অনেক সে দূর বনে।
কিংবা হবে তালগাছে সে দানো একানোড়ে,
রাত্রি হলে বসবে এসে সবার ঘাড়ে চড়ে !
কিলিয়ে তাদের ভূত ভাগাবে, বলবে এ কি ফ্যাসাদ ;
নাকি সুরে বলবে তখন, 'ফ্যাঁয়াঁদ নঁয়, এঁ পেঁসাঁদ !'

৪৮

মায়া–মুকুর

তোমার মনের মায়া–মুকুরে কি দেখেছ নিজের মুখ,
যে মায়া–মুকুরে নিজেরে দেখিতে এ বিশ্ব উৎসুক !
জ্ঞানী বিজ্ঞানী যোগী মুনি ঋষি তাপস দার্শনিক
চেয়ে আছে ঐ মায়ামুকুরের পানে ধ্যান–অনিমিখ্‌।
আপনার মুখ দেখিতে চাহিয়া কাহারে তাহারে দেখে
সৃষ্টির আদি প্রভাব হইতে সেই কথা তারা লেখে।

তোমরা ভাবিছ, আমরা বালক অথবা বালিকা কেহ,
আমি বলি—কেহ দেখোনি আজিও তোমরা নিজের দেহ।
তোমাদের মন–মায়া–দর্পণে দেখো যদি নিজ কায়া,
দেখিবে তোমারই ঐ দেহে আছে সারা বিশ্বের ছায়া।
তুমি ছোট নহ, ঐ সে ক্ষুদ্র দেহখানি তুমি নও,
নিজেরে দেখিলে—দেখিবে, তুমিই বিপুল বিরাট হও !
তুমি হতে পারো মহাযোগী, মহামুনি, ঋষি, অবতার,
তুমি হতে পারো লেনিন, কামাল, সানিয়াৎ, হিটলার !
তুমি হতে পারো কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর,
প্রতাপাদিত্য, শিবাজি, সিরাজ, রানা প্রতাপ, আকবর।
তুমি হতে পারো রবীন্দ্র, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ,
দেখিবে, রয়েছে অনন্ত গাঁথি সুভাষ তোমাতে বন্ধ !

ভগবানের যে অসীম শক্তি তোমাতে তাহা বিরাজে,
বুঝিবে, তোমার স্বরূপ দেখিলে মায়ামুকুরের মাঝে।

আপনারে কভু ভেবো না ক্ষুদ্র, ভাবিও না দীন তুমি,
তুমি নিতে পারো জয় করিয়া এ বিপুল বিশ্বভূমি।
তুমিই সর্বশক্তি লভিয়া পূর্ণ হইতে পারো,
'আমি ছোট' এই ভাবো নিশিদিন, তাই সব কাজে হারো।
দারোগা কেরানি হবার ক্ষুদ্র সাধনা তোমার নহে,
তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান কহে!
বলো ভগবানে, তুমি হতে চাও সর্বশক্তিমান,
তুমি অনন্ত যশ খ্যাতি চাহ, চাহ অনন্ত প্রাণ।
আমার মনের মায়াদর্পণে তোমাদের দেখিয়াছি,
দেখেছি সেখানে কত যে পার্থসারথি সব্যসাচী!
অনাগত মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে তোমরা সবে
ধর্মরাজ্য আনিতে আবার মেতেছ মহাআহবে।
শোনো, শোনো! মোর সত্য এ বাণী, স্বপন দেখিনি আমি,
সূর্য যেমন সত্য, তেমনি দেখি আমি দিবাযামী—
তোমাদেরই মাঝে আসিছে কল্কি, কত সে যুগাবতার,
তোমরা ভাঙিয়া সব জাতি-ভেদ করিতেছ একাকার।
অন্ন বস্ত্র দিতেছ তোমরা ক্ষুধাতুর জনগণে,
হনন করিছ হিংস্র পশু আছে যা মানবমনে!
কেহ মহর্ষি হইতেছ জ্ঞানে, কেহ গলাতেছ প্রেমে,
কেহবা বিপুল কর্মশক্তি লইয়া আসিছ নেমে।

স্থির করো মন-মুকুরে মায়ার, তোমরা আমারই মতো—
দেখিতে পাইবে—মিথ্যা শিখায় পুঁথি-পুস্তক যত।
চাক্‌রি করিতে লভোনি জনম; তোমরা দেবতা সবে,
দিব্যশক্তি ভগবদ্‌জ্যোতি এই মানুষেই লভে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যাহা সাধ—তুমি তাই হতে পারো,
ক্ষুদ্রের মাঝে থাকো তুমি, তাই বৃহতের সাথে হারো।
ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডি, এই অজ্ঞান ভোলো,
তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাহারে জাগায়ে তোলো!
তুমি নও শিশু দুর্বল, তুমি মহৎ ও মহীয়ান,
জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট, অমৃতের সন্তান।

৪৯

ভারতী আরতি

বন্দনা–বাণী ধ্বনিছে নিখিল বিশ্ব–কোবিদ কণ্ঠময়
জয় বীণাপাণি মরাল–বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
বীণা বিধাত্রী সিদ্ধিধাত্রী মানস–তামস–নাশিনী মা !
আলস নাশিনী মুরজ–ভাষিণী মূঢ়–জড়–রিপু তোষিণী মা !
মা তোর পরশে গগন বীণায় তারার রাগিণী কাঁপিয়া বয়
জয় বীণাপাণি বীণা–বিহারিণী জয় মা জননী জয় মা জয় !
চরণ নিম্নে বিকশে কমল, সুর সুরধুনী বহিয়া যায়
বিশ্বের যত লক্ষ্মীছাড়া মা নিঃস্ব কবির বন্দনায়।
ক্লিষ্ট কণ্ঠে বেদনানন্দ বাজিছে আকাশ–বাতাসময়—
জয় জয় শুভ শতদল–দল বাসিনী জননী জয় মা জয় !
উর মা শারদা আকাশ কাঁপানো ঝংকারে তব ভরিয়া দিক্
আগুনের রাগে রাঙিল ফাগুন, উদাসী দোয়েল পাপিয়া পিক্
বিহগ–কণ্ঠে বেহাগে লুণ্ঠে তব আগমনী অশ্রুময়
জয় বীণাপাণি মরালবাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয় !
হুতাশে না আজ হতাশ বাতাস পূরবীর বায়ে ঝরে না লোর
উষীর সিক্ত দখিনা সমীর ঢুলায় চামর মাতা গো তোর।
নিবিড় নীলে মা সাজায়ে পথটি গাহিছে প্রণত দিগ্বলয়
জয় বীণাপাণি মরাল বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
সুদূর আকাশ অচপল–আঁখি আনত তোমার চাহিয়া পথ
উদয় না সে মা, অস্ত–তোরণে উদিবে তোমার পুষ্পরথ ?
বনবালাদল কচি কিশলয়ে সাজিয়া দুলিয়া দুলিয়া কয়
জয় বীণাপাণি মরালবাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী ছেলেরা নয় গো মা তোর পূজারি আজ
তাপস ছেলে মা আমরা এসেছি গৈরিক রাঙা পরিয়া সাজ।
ব্যথাপাণ্ডুর শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া সুখের অশ্রু বয়
জয় বীণাপাণি মরালবাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।
অঞ্জলি ভরা আমের নবীন মঞ্জরি দিয়ে ভরেছি থাল,
মঙ্গলঘটে দুখলোর ধারা, দীর্ণ হিয়ার ছিন্ন ডাল।
রোদনে যদিও বোধন মা তোর মা'র কাছে নাই লজ্জা ভয়
জয় বীণাপাণি বীণা–বিহারিণী তাপস জননী জয় মা জয়।।

[তথ্যের উৎস : 'অলকা' ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা চৈত্র, ১৩২৮।]

৫০

গজল

ভুখা আঁখি কাজ কি ঢাকি ওড়না দিয়ে গুলবদন্
পিয়েই না হয় নিলে ও রূপ আঁখির ক্ষুধা আর্ত মন॥
'হারুত' সম সই হামেশা আশেক হওয়ার হয়রানি।
হায়, যদি না দেখ্‌ত কভু ও রূপ আমার দুই নয়ন।
'হারুত' কি হায় বন্দি হতো চিবুক টোলের রস-কুঁয়ায়
'মারুত' যদি না কইত গো সেই রূপসীর রূপ কেমন॥
আমার মতন ও রূপ দেখে ভুল বকে কি বুলবুলি?
তোমার মুখের খোশ্‌বু লেগে ফুলের বাসে মাত্‌ল বন॥
তোমায় ভালোবেসে সখি দুঃখ ব্যথার অন্ত নাই।
ঘোমটা খোলো, হাফিজ, তোমার রূপ দেখে নিক মনমোহন॥

[তথ্যের উৎস : 'কল্লোল', ভাদ্র ১৩৩৪। গজল। 'কল্লোল' পত্রিকার উক্ত সংখ্যার সূচিপত্রে পরিচিতি হিসাবে 'গান' নির্দেশিত হয়েছে।]

৫১

নবীনচন্দ্র

অঞ্জলি পুরিয়া মম ভাগীরথী-নীরে
দাঁড়ায়েছি আসি তব কর্ণফুলি-তীরে।
বীর-কবি! লহ লহ এ মোর তর্পণ
অপরিচিতের এই পূজা-নিবেদন!
আসিনি একাকী আমি এই তীর্থ-পথে
দানিতে তর্পণ আজি! মম দেশ হতে
এসেছে ভারতচন্দ্র, কবি চণ্ডিদাস,
জয়দেব, কাশীরাম, সাথে কৃত্তিবাস
এসেছে কঙ্কণ কবি। তাঁরা উর্ধ্বে রহি
পাঠায়েছে অর্ঘ্যভার। আমি তাহা বহি
আসিয়াছি তব পুণ্য চট্টলায় একা,
তাহাদেরি অর্ঘ্য মম এই অশ্রুলেখা!

আজি বিচ্ছেদের এই স্মরণ-সন্ধ্যায়
তব কর্ণফুলি-তীরে সমুদ্রবেলায়
উঠিল মহান এক মিলন-মন্দির।

পশ্চিমের ভাগীরথী অজয়ের নীর
আসিল তোমার দেশে বন্দিতে তোমায়।
আসিল পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব বাঙ্গালায়
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে। দিতে অর্ঘ্য হবি
এ স্মরণ-তীর্থে এল কোরানের কবি।
ওঠে অভিনব মহা-মিলনের গীত
আজিকে শ্মশানে তব। আজি পুরোহিত
তোমার এ শ্রাদ্ধ-তীর্থে মুসলিম-তনয়।
প্রাণ আজি হল জয়ী, ভেদবুদ্ধি লয়
আজ হতে হলো, কবি ! চিতা-ভস্মে তব
উঠিল মিলন—তাজ আজি অভিনব !

বিদায়-দিনের তব ভবিষ্যৎ-বাণী
'আজিকে বিজয় মোর !' দিল আজি আনি
সার্থক করিয়া বর হেথা অকস্মাৎ
হেথা ভায়ে ভায়ে আজ মিলাইল হাত।
এ গৌরবে ধন্য শুধু আমি নহি আজ—
এ-গর্ব তাদের যারা সৃজিল এ তাজ।

হে কবি ! জানিছ তুমি আর আমি জানি—
যে-লোক বিহার করে বাণী বীণাপাণি
সেথা আছে আমাদের চির-পরিচয়।
তাই এই স্মৃতি-তীর্থে নাহি মোর ভয়
আনিতে অঞ্জলি মোর দানিতে তর্পণ।
এ-লোকে যাহারা তব আত্মীয়-স্বজন—
আমি জানি তাহাদের সকলের হতে
অধিক আত্মীয় আমি। না-জানার পথে
আমাদের জানাজানি। মোর অধিকার
হে কবি, নতুন নহে অর্ঘ্য দানিবার।
কবির ধেয়ান-লোকে স্বরগ-কাননে
পরম আত্মীয় বন্ধু মোরা দুইজনে।

উনবিংশ শতাব্দীর হে নবীন ব্যাস !
'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', তোমার 'প্রভাস'
নব-ভারতেরি বাণী— উচ্ছ্বাস এ নহে—
পরাধীন ভারতের ক্ষত মর্ম-দহে

যে-ব্যথা ভীষণ দাহে জ্বলে ধিকিধিকি
হৃদি-রক্তে তুমি ঋষি গেলে তাহা লিখি
তুমি রচি গেলে ঋষি গেলে তাহা গীতা,
ভগবানে করে গেলে মানুষের মিতা !
তুমি মহাভারতের মহাবেদনার
জ্বালা-কুণ্ড। তব অশ্রু নহে হতাশার।
উষ্ণ প্রস্রবণ-সম তব আঁখিজল
যত বেগে বহে তত দহে অবিরল।
চট্টলার অগ্নিগিরি যবে তুমি রোষে
ফোঁপাইয়া উঠিয়াছ ভীষণ আক্রোশে,
বাণবিদ্ধা ফণিনীর সম তব পায়ে
লুটায়ে পড়েছে সিন্ধু। দূর বনছায়ে
লুকায়েছে বনমৃগী হেন নদ-নদী।
বিশ্বের বিস্ময় তুমি প্রলয়-পয়োধি !

হে নবীনচন্দ্র ! তুমি ত্যজিয়া গগন
নেমেছিলে এ ধরায়। না জানি কখন
শুনেছিলে বিরহিণী জলধির ডাক।
লুকায়ে তাহার তীরে আসিলে নির্বাক।
সিন্ধুরে ধরিয়া বুকে তুমি উতরোল
জাগালে মৃতের দেশে নবীন কল্লোল।

নিমেষে ফুরায়ে যায় মিলনের দিন,—
আকাশের চন্দ্র তুমি আকাশে বিলীন
হইলে একদা কবে, সেই হতে, হায় !
তোমার শ্মশান-পাশে কিন্তু গরজায়।

তোমার প্রাণের ঐ প্লাবন-উচ্ছ্বাসে
যে পড়ে সে ভেসে যায়, আর নাহি আসে
ফিরে তার কূলে, কবি ! তোমার জোয়ার
এতই ভীষণ ওগো এতই দুর্বার,
দেখিতে দেয়নি কারে কোথা তার তল ;
যতই ডুবিতে যাই, তত বন্যা-ঢল
কেবলি ভাসায়ে নেয় নিরুদ্দেশ-পানে ;
তল আছে— কূল নাই তোমার তুফানে।
যে নদী ডুবাই তরী সেই নহে বড়,

বেগবতী খরস্রোতা অপার দুস্তর—
মহানদী তারে কই। তুমি মহানদী !
গভীর কূপের নাই তলের অবধি,
তা বলে সে তটিনীর চেয়ে বেশি নহে ;
কূল ভাঙে তারি স্রোতে যে-তটিনী বহে।
হে কবি ! ধরায় নাহি তার সমতুল,
যার স্রোতে ভেঙে যায় হৃদয়ের কূল !
হে সরল ! হে উদার ! হে বিরাট শিশু !
মুহম্মদ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, অমৃতাভ যীশু
সকলে দিয়াছ তুমি সম অর্ঘ্য-প্রীতি—
রচিয়াছ সকলের তরে তব গীতি।
উঠেছিলে চন্দ্র তুমি সকলের তরে,
প্রিয় হয়ে আছ তাই প্রতি ঘরে ঘরে।

হে নবীনচন্দ্র ! শুধু তোমারি আশায়
এসেছিল মহাসিন্ধু তব চট্টলায়।
আজ তব সিন্ধু-সাথে কাঁদি অবিশ্রাম
তোমারে স্মরণ করি, জানাই প্রণাম !

৫২

প্রথম অশ্রু

এরি লাগি তুই পথ চেয়ে কি রে বসেছিলি মুসাফের
প্রথম অশ্রু দেখে যাবি চোখে নিরশ্রু আকাশের ?
রৌদ্র-ধূসর ঊষর গগন
হেরিল কখন মেঘের স্বপন,
দুলিয়া উঠিল অসীম রোদন কূলে কূলে নয়নের,
তত ঝরে জল— চোখে অঞ্চল যত চাপে জলদের !

ডাকিয়াছে কুহু মুহুর্মুহু গো দিবসে যাহার বনে,
ফাগুন দিতেছে ফুল-ফরমাশ যার রাঙা অঙ্গনে,
যাহার হাসির রোদ্দুর-তাতে
শিশির শুকায়ে গিয়াছে প্রভাতে,
সে কেন আজিকে নিশুতি নিশীথে জাগিয়া সঙ্গোপনে—
চিকুর এলায়ে কাঁদিছে লুটায়ে, কি কথা করিয়া মনে ?

তৃষিত চাতক ! এরি লাগি কি রে এতদিন বসেছিলি
চাহিয়া শুষ্ক গগনে— খুলিয়া নয়নের ঝিলিমিলি ?
এরি লাগি জাগি কাটালি অধীর !
মধু-মাসে চাস্ বরষার নীর ?
এই জল চাহি এতদিন ধরি এত আঁখি-জল দিলি ?
কে জানে কাহার দুঃখে আকাশ কাঁদিতেছে নিরিবিলি !

কাঁদিছে আকাশ— সে যে তোরি তরে, কে বলিল তোরে বল্ !
ঐ জল চাহি কাঁদিছে কানন, মরা নদী, ধরাতল।
শাখে শাখে কাঁদে কলিকা কুসুম,
ফটিক-জলের চোখে নাই ঘুম,
জাগে প্রান্তর তৃষায়-কাতর দগ্ধ-তৃণাঞ্চলে,—
কে জানে কাহারে স্মরিয়া উহার নয়নে নেমেছে ঢল ?

কাহার উপরে অভিমানে কার প্রণয়-অনাদৃতা
মেঘ-বেণী হতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে বিজলি-জরিন্ ফিতা !
ঘন ঘন বহে পুবান বাতাস
অভিমানিনীর দীরঘশ্বাস,—
নিভাইয়া সব তারা-দীপ, কাঁদে ধূলি-অবলুণ্ঠিতা !
হতাশ পথিক ! তুই কেন সেথা চাহিয়া আছিস্ বৃথা ?

বন্ধ করে দে বাতায়ন তোর, ভেসে চল্ পথ টানে !
মিটা বক্ষের নিদারুণ তৃষ্ণা কণ্ঠের বিষপানে !
তোর তরে নয় যে অশ্রুজল,
তারে চেয়ে তোর কি হবে পাগল !
তোর বনে ফল মুঞ্জরিবে না * * *
* * *

(অসমাপ্ত)

---

* পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে কবি প্রথমে কবিতাটি রচনা শুরু করেছিলেন এভাবে—
এরি লাগি তুই পথ চেয়ে কিরে বসেছিলি মুসাফির,
নিরশ্রু তার চোখে দেখে যাবি প্রথম অশ্রু-নীর ?
রৌদ্র-ধূসর ঊষর গগন
কূলে কূলে জলে হল নিমগন,
যত চাপে চোখে মেগের আঁচল, ...

৫৩

সংগ্রামী

সম্মুখে মহা-উর্মির দোলা,
তরণীও টলমল ;
শক্ত মুঠিতে ধরে থাকো হাল
সংগ্রামে পাবে ফল।
পথে পথে কাঁটা পায়ে পায়ে বিঁধে
পিচ্ছিল করে পথ,
ভয় কি তাহাতে? চলে যাও সোজা,
পেয়ে যাবে জয়-রথ।

কলিকাতা
২৬শে ভাদ্র ১৩৩২

৫৪

সাধনা

যুগ যুগ ধরে বেঁচেছিস্ তোরা
এবার মৃত্যু-সাধনা কর ;
যে-হাতে কেবলি কর মোনাজাত
সে-হাতে এবার অস্ত্র ধর।
গগন হইতে হেলাল ছিঁড়িয়া
সাজারে তোদের লাল নিশান ;
বুড়োদের আয়ু অক্ষয় হোক,
নেসার করে দে তোদের প্রাণ।।*

[* কবি সিলেটে গেলে ফজলুর রহমান চৌধুরীকে এই কবিতাটি লিখে দেন।]

৫৫

স্রোতের ফুল

সুন্দর করে অবহেলার শিথিল মুঠি হতে
পড়নু খসে লীলা-কমল, ভেসে বেড়াই সোঁতে।

কেউ তুলে নেয় আদর করে, একটুখানি শুঁকে
দেয় ফেলে ফের স্রোতের জলে ! কেউ বা চাপে বুকে,
মলিন করে দেয় গো ফেলে।—আবার ভেসে যাই,
খোঁপায় তুলে নেবে গো যে, তারির পানে চাই।
এ অভিমান নাই গো, প্রিয়, খোঁপায় তোমার উঠি।
আমায় দলে আলতা পরো—কিংবা কুটি কুটি
করো চারু দশন দিয়ে—না হয় নখে ছিঁড়ে।
আর যেন না ভেসে বেড়াই চোখের জলের ভিড়ে।

৫৭

উদীচী-আলো

তোমরা তরুণ উদীচী-উষার আলো,
রবিহীন দেশে প্রখর দীপ্তি জ্বালো।
জ্বলে না আশার রবি যবে মেরু-পথে
আঁধার ডুবাও আলোক-বন্যা-স্রোতে।
না-দেখা দেশের না-দেখা জ্যোতির ভাতি
তোমাদের চোখে জ্বলিছে দিবস-রাতি।
তুষার-কঠিন হিম-জরজর দেশে
নাশিয়াছ জরা ভীতিরে তোমরা এসে।
ভয় নাই, হেথা নাই ওঠে রবি যদি,
তোমরা উদীচী-আলো রবে নিরবধি।

'সওগাত'
ফাল্গুন ১৩৩৯

৫৮

মওলানা মোহাম্মদ আলি

আধেক হিলাল ছিল আস্‌মানে, আধেক হিলাল দুনিয়ায়,
দুনিয়ার চাঁদ গেল আসমানে, দুনিয়া অন্ধকারে ছায়।
ছিল না আরবে ইরানে তুরানে ইরাকে মেসেরে সিরিয়ায়,
হিন্দুস্থানে ছিল সে রতন, হারাইয়া গেল সে-ও, হায় !

উহাদের ছিল ইব্‌নে করিম, সউদ, কামাল, জগলুল ;
আমাদের ছিল মোহাম্মদ আলি—একাই সবার সমতুল।
উহাদের দেশ-নেতার আছিল লোক্-লশকর-বৈভব,
মোদের নেতার ছিল না সে-সব, তবু গো তাঁহার ছিল সব।
ছিল নাকো তেগ্-হাতিয়ার তার, আছিল লেখনী আর দিল্,
অভয় বাণীর ভরসা লইয়া তাড়ায়েছে তবু আজাজিল।
সে ছিল ফকির মুসাফির শুধু, ভিক্ষার ঝুলি ছিল যার,
তবু তারি পায়ে করেছে সালাম কামান গুলি ও তরবার।
দুশমন-বুকে বসি নির্ভীক করিয়াছে তার সাথে রণ ;
করেনি গণনা সে ছিল একাকী, দুশমন ছিল অগণন।
দু' নয়নে তার নয়নের মণি ছিল গো ধর্ম আর দেশ,
তাহারি লাগিয়া সে হলো ভিখারি, ধূলায় ফেলিয়া রাজবেশ।
রাজার রাজারে মেনেছে সে শুধু মানেনি সে মেকি রাজারে,
সেই শক্তিতে হেনেছে সে লাজ রাজার হাজার সাজারে।
ছিল আওরঙ্গজেবি-দ্বীনি জোশ্ আকবরি-দিল্ মিলনের,
ছিল কমরেড্, ছিল হামদর্দ্, দীন দরিদ্র সকলের।
'মোহাম্মদে'র ইসলাম-প্রীতি, 'আলি'র শৌর্য বাহুবল
ছিল গো যাহাতে আজি অসময়ে সেই ছেড়ে গেল ধরাতল।
নাইকো মক্কা মদিনায়ও আজ এমন নিশান-বর্দার,
নাই ইসলাম-জাহানে গো আজ এমন দ্বীনি-সর্দার।
গেছে বাদশাহি শাহ্-ই-তখত, সে দুঃখ ছিনু ভুলিয়া
যার ভরসায়, তাহারেও হায় বেহেশ্‌তে লইল তুলিয়া।
মোদের জীবনে দেখিনু আমরা দুঃসহ শোক-কিয়ামত,
ধূলিসার মাটি রহিল পড়িয়া, আগুনে পুড়িল নিয়ামত।
মোদের হৃদয়-শাহানশাহ্ আজ চলে গেল, অরাজক দেশ
যৌব-রাজ্যে অভিষেক করি কারে, কই সেই দরবেশ !
নাই নাই কেহ নাই রে তেমন, ক্রন্দন ওঠে চারিধার,
মোদের ভাগ্য-গগনে বুঝি গো থামিবে না মেঘ-বারিধার !
এ পতাকা বয়ে চলিবে কে আর, ভারতে তেমন নাই বীর,
হিন্দু কাঁদিছে 'গুরু গেল' বলি', মুসলিম কাঁদে, 'গেল পীর।'

আজো পরাধীন সোনার ভারত, হেথায় তাঁহারে আনিস্‌নে ;
চির-স্বাধীনতা, পথের পথিকে যেতে দে, হেথায় টানিস্‌নে।
বদ্ধ খাঁচায় আঘাত হানিয়া আজিকে ক্লান্ত পাখা যে ওর,
জাগাস্‌নে আর, ঘুমায়েছে ও-যে, কেটেছে খাঁচার বাঁধন-ডোর।

বন্ধনহীন নিঃসীম নভ ডাকিয়াছে, ওরে ছাড়িয়ে দে ;
তোরা পিঞ্জরে বন্দি করিয়া মুক্ত পাখিরে ডাকিস্‌নে।
যুঝিয়া যুঝিয়া শ্রান্ত সে বড়, ডাক ছেড়ে তোরা কাঁদিস্‌নে।
জাগিয়া উঠিয়া যুঝিবে আবার, ওরে কেঁদে ঘুম ভাঙিস্ নে।
যে-দেশের পথ ভুলে এসেছিল, যেতে দে রে সেই জেরুজালেম,
সে দেশে নাই রে বন্ধন, নাই পিঞ্জর কারা, নাই জালেম।
তারপর, মোরা উহারি মতন পাখা ঝাপটিয়া পিঞ্জরে
ঐ এক পথে যাব মুসাফির চির-মুক্তির বন্দরে।

'সওগাত'
১৩৩৮

৫৯
আবীর

ছড়াও ছড়াও গানের আবীর শীত-জর্জর দেশে,
রাঙিয়া উঠুক জীর্ণ ও জরা, ফাগুন উঠুক হেসে।
আবার পুষ্প-পল্লবহীন শীর্ণ তরুর শাখা
হউক পূর্ণ কুঁড়ি কিশলয়ে, পরাগের ফাগে মাখা।
আবার ভ্রমর মধু-মক্ষিরা বাণীর কমল-বনে
জাগরিত হোক, মুখর করুক ব্যাকুল গুঞ্জরণে।
লাগুক ফাগুন-সমীরের ছোঁওয়া বিকীর্ণ কঙ্কালে,
বহুক ঘূর্ণি উড়াইতে পথ-সঞ্চিত জঞ্জালে।
তোমরাই গোপ-কিশোর, তোমরা চির-আনন্দময়,
প্রাণ-চঞ্চল তোমাদেরই আছে আবীরের সঞ্চয়।
তোমরা অরুণোদয়ের শিখরে উঠিয়া ছড়াও ফাগ,
যুগান্ত-উষাপতিরে জাগায় তোমাদেরই অনুরাগ।
ম্লান সন্ধ্যার মুখ রেঙে ওঠে তোমাদেরই কুঙ্কুমে ;
তোমাদেরই আঁখি জেগে থাকে দেশ অচেতন যবে ঘুমে।
তোমরাই ভয়-মুক্ত, ভরিয়া রুধিরের পিচকারি
কুরুক্ষেত্রে হোরির খেলায় যুগে যুগে দাও ডারি।
আবীর ছড়াও, আবীর ছড়াও, হে বীর তরুণদল,
নিরক্ত এই ধরা হোক পুন রক্তাক্তোজ্জ্বল।
পুষ্পাকীর্ণ পন্থা দেখাও কন্থা-জড়িত জীবে ;
জ্বালাও অশোক কৃষ্ণচূড়ার শিখা, দীপ গেছে নিভে।

আবীর ছড়াও, গুলাল ছড়াও দুলাল-দুলালি দল,
এস ফাল্গুনী, ঝন্‌ঝা উড়াও অগ্নিকা-অঞ্চল !

'সওগাত'
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১

৬০

সত্য আগুন দেখোনি

সত্য আগুন দেখোনি তোমরা, দেখিয়াছ তার ধোঁয়া,
জ্বলিয়া উঠিতে জ্যোতির্শিখায় পাইলে তাহার ছোঁয়া।
দেখেছ সূর্য গ্রীষ্মে প্রখর, শান্ত কিরণ শীতে,
শীতশেষে পুন আসেনি নিদাঘ দেখেছ কি ধরণীতে?
সূর্য তেমনি জ্বলিছে, বন্ধু, তোমরা বন্ধ ঘরে,
সূর্য নিভেছে বলিয়া আঁধারে কাঁপিছ শঙ্কা-ভরে।
যে মহাজ্যোতি আগুন হইয়া সংহার রূপে আসে,
সংহার-শেষে শান্ত হয় সে লয় হয় মহাকাশে।
মেঘ কি কেবলি অশনিই হানে? ফোটায় না সে কি ফুল?
অশনি হেনেছি, ফুল ফোটাতেছি, তোমরা দেখিছ ভুল।
কে জানে কখন শান্ত এ মেঘ জ্বলিবে বজ্র বয়ে।
সংসার নহে বিলাস আমার, আসি সংহার হয়ে।
ছন্দ পেয়েছ, পাইয়াছ ভাষা, ছন্দে হয়ো না অন্ধ,
ভাষায় ভাসিয়া থেকো না, গভীরে ডুবিলে পাবে আনন্দ।
সংহার-শেষে দেখা দেন যিনি, তিনিই শান্ত শিব,
(তার) ত্রিনয়নে জ্বলে সৃষ্টি-স্থিতি সংহার এ ত্রিদিব।
খণ্ড করিয়া দেখিলে পূর্ণে দেখিবে নিয়ত ভুল,
সূর্য কেবলি দগ্ধ করে না, ফোটায় কমল ফুল।

'বেতার-বাংলা'
নজরুল-স্মরণী সংখ্যা ১৯৭৬

৬১

জাগরণী

প্রভাতে জাগিল সকল যাত্রী
তোরা ঘুমাস্ নে আর রাত্রি ভাবি,

দেখাবে বিশ্ব-পথিকের সাথে
তোদের সে-পথে চলার দাবি।
অতীতের মোহ হউক ছিন্ন
বর্তমানের কুঠারাঘাতে ;
ঘুমায়েছে যারা জাগুক তাহারা
তোদের রুদ্র অশনি-পাতে॥

'সংবাদ'
২৭শে আশ্বিন ১৩৭০

৬২
ট্রেড শো

'ট্রেড শো' দেখিতে গেছিনু সেদিন সকালে রূপবাণীতে ;
সাতশো তরুণ 'সরুন সরুন' চিৎকারি চারিভিতে
হুটাপুটি করে লুটাপুটি খেয়ে ছুটাছুটি করে সবে ;
একটেরে রহি চাহি—মহাত্মা গান্ধি কি এল তবে ?
এল রবীন্দ্রনাথ কি, এল কি সুভাষ, জহরলাল ?
গুঁতোগুঁতি করে সাতশো তরুণ
জুতি ধুতি ছেঁড়া অতি সকরুণ
খুন চড়ে গিয়ে নয়ন অরুণ যেন মদ-মাতোয়াল।
এল কি সুভাষ, এল কি জহরলাল ?

কোথায় সুভাষ ! সুবাস ছড়ায়ে আসে ছায়ানট-নটী
হীরা জহরৎ শাড়ি পরে লাল বেগুনি ও বরবটি।
হিন্দু-মুসলমানের এমন মিলন দেখিনি আর,
বিড়িওলা আর অফিসের বাবু হয়ে গেছে একাকার।
টিকিতে-দাড়িতে জড়াজড়ি হয়, ছড়াছড়ি পান-বিড়ি,
কোট-প্যান্ট-লুঙি-ধুতি ঠাসাঠাসি সারা ফুটপাথ সিঁড়ি।

কেহ বলে, 'খ্যাঁদা, দ্যাখ্ দ্যাখ্ ওই অনুরাধা টিপ-পরা ;
ওই যে কি বলে, উনি এন-টি-র নয়াতারা আন্‌কোরা।
ভাগ্যচক্র শাড়ি বিজড়িত ওই যে অমুক দেবী—
এ্যালবামে রাখি উহারি প্রতিমা আমি দিবানিশি সেবি।'

কর্দম-অনুলিপ্ত ভূষণ ভিড়-চাপে ঘামে চুবা
অভিনয়-হিরো-মার্কা পিরান-পরা কয়জন যুবা
বলে, 'ওই ওই পাহাড়ি, দুর্গাদাস, সাইগল ওই,
ওই পঙ্কজ, অমর বড়ুয়া—দেবকীকুমার কই?'
কেহ বলে, 'বীতশোক হইয়াছি অশোককুমারে দেখে,
মনে হয় যাই দূর বোম্বাই অঙ্গে ভস্ম মেখে।'

'বন্‌কি চিড়িয়া' কোরাসে গাহিয়া একদল যুবা কহে,
হায় রে বিংশ-শতাব্দী, হায় বাঙালির যৌবন!
নিপট কপট ছায়াপট প্রেমে পড়িয়াছে জনগণ।
বলতে পারো কি দাদা অচ্ছ্যুৎ কন্যা কোথায় রহে?

বাণীচিত্রে যা ফুটে ওঠে তা কি এই জীবনের ছায়া?
এই বিকৃতি—কাগজের ফুল এই মরীচিকা মায়া?
পর্দায় দেখি যে-সব পুরুষ নারী মোরা দিবানিশি,
বলিতে পারো কি চিনিতে পারো কি এরা সব কোন্ দিশি?
ইহাদের বলা, ইহাদের চলা, ইহাদের হাবভাব
দেখেছ কি কেহ—দেখেছ ফলেছে ওক-গাছে যেন ডাব!
পাইন-শাখায় ওল ঝুলিতেছে, আমগাছে পিচ ঝুলে,
ট্যাস্ ফিরিঙ্গি বাজাইবে বাঁশি কবে যমুনার কূলে?

মাসিক 'বসুমতী'
আশ্বিন ১৩৫৪

৬৩

প্রশস্তি

—অসহায় এই অবনীতলে
বিবাদ কলহ উৎপীড়নের রাজ্য চলে।
আছে নিপীড়িত জনগণ চেয়ে হতাশ প্রাণে,
ফরিয়াদ ওঠে ধূমায়িত হয়ে উর্ধ্ব পানে।
নয়া জামানার নিশান ধরিয়া ইহারি মাঝে
তুমি এস নওজোয়ান অগ্রপথিক সাজে।
তরুণ অরুণ রশ্মির সম তোমার বাণী
আনুক জীবন তিমির-বিদার শায়ক হানি।

পীড়িতের প্রাণে নব সান্ত্বনা চেতনা লয়ে
তুমি এস সরদার তাহাদের মুজ্‌দা বয়ে।

'নয়া জমানা'
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫

৬৪
আশীর্বাদ

আপনার ঘরে আছে যে শত্রু
তারে আগে করো জয় ;
ভাঙো সে দেয়াল, প্রদীপের আলো
যাহা আগুলিয়া রয়।

অনাত্মীয়েরে আত্মীয় করো,
তোমার বিরাট প্রাণ
করে নাকো যেন কোনোদিন কোনো
মানুষে অসম্মান।

সংস্কারের মিথ্যা বাঁধন
ছিন্ন হউক আগে,
তবে সে তোমার সকল দেউল
রাঙিবে আলোর রাগে।

'আল্ ইসলাহ্'
আশ্বিন ১৩৪৪

৬৫
তীর্থপথিক

[রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর]

হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী, আমারে করিও ক্ষমা।
পর্বতসম শত দোষ–ত্রুটি ও চরণে হলো জমা।
জানি জানি তার ক্ষমা নাই, দেব, তবু কেন মনে জাগে
তুমি মহর্ষি করিয়াছ ক্ষমা আমি চাহিবার আগে।

কোটি পূজারিণী পূজারী ভক্ত তোমার প্রসাদ যাচে,
গুঞ্জরি ফেরে কত সে মধুপ তোমার পায়ের কাছে।
তাহারা কি চাহে তাহারাই জানে, আমি এই যাচিয়াছি ;
তোমার আলোক-কণা পেয়ে আমি খদ্যোত হয়ে বাঁচি।
হে ঠাকুর, আমি মুক্তি চাহিনি, ভক্তি চেয়েছি আমি ;
তুমি জানো তব ভক্তের ব্যথা, তুমি অন্তর্যামী।
অফুরান তাই আবদার মোর, অনন্ত আশা সাধ,
যত নাহি পাই, হৃদয়-সাগর তত হয় উন্মাদ।
পাই নাহি পাই, খেদ নাহি তায়, তবু শুধু যাই চেয়ে,
শিশু অকারণ পুলকে যেমন মার নাম যায় গেয়ে।
জানি না, কেন যে বহুজন জানে তুমি মোর চির-চেনা,
ফিরাবে যেখানে আর সব জনে, সেথা মোরে ফিরাবে না।
অন্তরের এ কথা মোর, দেব, মোর অভিমান নাহি
রিক্ত-পাত্র ফিরি যদি আমি তোমার প্রসাদ চাহি।
চাহিতে পেরেছি, নিকটে এসেছি, এই আনন্দ মোর—
তীর্থপথিক আসিতে পেরেছি তব মন্দির-দোর।

যে বাণী শোনালে, হে লীলা-রসিক, মোরে বঞ্চনা-ছলে,
তাই পড়ি আর নিবারিতে নারি অবাধ্য আঁখি-জলে।
আমি জানি, তুমি অজয়, অমর, তুমি অনন্ত-প্রাণ ;
মহাকালও নাহি জানে, কবি, তব আয়ুর সে পরিমাণ।
তুমি নন্দন-কল্পতরু যে, তুমি অক্ষয় বট ;
বিশ্ব জুড়ায়ে রয়েছে তোমার শত কীর্তির জট।
তোমার শাখায় বেঁধেছে কুলায় নভোচারী কত পাখি
তোমার স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় জুড়াই ক্লান্ত আঁখি।
বিজ্ঞান বলে, বলুক, রবির কমিয়া আসিছে আয়ু ;
রবি রবে যত দিন এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-বায়ু।
মহাশূন্যের বক্ষ জুড়িয়া বিরাজে যে ভাস্কর,
তার আছে ক্ষয়, এত প্রত্যয় করিবে কোন্ সে নর ?
চন্দ্রও আছে, আছে অসংখ্য তারকা রাতের তরে
তবু দিবসের রবি বিনা মহাশূন্য সে নাহি ভরে।
তুমি রবি, তুমি বহু উর্ধ্বের, তোমার সে কাছাকাছি
যাবে কোন্ জন ? তোমার কিরণ-প্রসাদ পাইয়া বাঁচি।

তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বের বিস্ময়,—
তব গুণ-গানে ভাষা-সুর যেন সব হয়ে যায় লয়।

তুমি স্মরিয়াছ ভক্তেরে তব, এই গৌরবখানি
রাখিব কোথায় ভেবে নাহি পাই, আনন্দে মূক বাণী।
কাব্যলোকের বাণী-বিতানের আমি কেহ নহি আর,
বিদায়ের পথে তুমি দিলে তবু কেন এ আশিস-হার?
প্রার্থনা মোর, যদি আরবার জন্মি এ ধরণীতে,
আসি যেন শুধু গাহন করিতে তোমার কাব্য-গীতে ! ! *

'নাগরিক'
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৪২

৬৬

ছায়া-বীথি

স্নিগ্ধ শীতল তৃণাস্তীর্ণ এই ছায়াবীথিতলে
রচেছি কুঞ্জ শ্রান্ত পথিক জুড়াবে খানিক বলে।
ঝরা পাতা আর ফুলদল দিয়া রচিয়াছি হেথা পথ ;
এই পথ দিয়া যাবে সুন্দর, বন্ধুর মোর রথ।
কর্ম-ক্লান্ত রৌদ্র-দগ্ধ মরুচারী মুসাফির
লভিতে শান্তি কুসুম-কীর্ণ এ-পথে করিবে ভিড়।
কল্পলোকের বিমানে উড়িয়া শ্রান্ত যাদের পাখা
হেথা আছে নীড় তাহাদের তরে ফুল-ছাওয়া ছায়া-ঢাকা।
তরু-লতা-ফুল-পাতা-ঘেরা ছায়া-সবুজ এ শামিয়ানা
দূর-তীর্থের পথ-মঞ্জিলে নিরালা সরাইখানা।

আজিকার এই হলাহল-কটু খল কোলাহল শেষে
যেই অমৃতের সন্ধানে মন ফিরিবে দেশ-বিদেশে,
ভবিষ্যতের সেই সন্ধানী অমৃত-পিয়াসী লাগি
ছায়াবীথিতলে রচিয়া আলয় আমরা রহিব জাগি।
বরবেশী যথা দরবেশ সাজে, মন যথা হয় মুনি,
সেই সে দেশের বাঁশরির ধ্বনি হেথা হতে মোরা শুনি।

---

* কলকাতার সাপ্তাহিক 'নাগরিক' পত্রিকার ২য় বর্ষ ১ম (বার্ষিক) সংখ্যার জন্য একটি লেখা চেয়ে নজরুল ইসলাম ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্র লেখেন, তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১৫ই ভাদ্র ১৩৪২ সালে নজরুলকে একটি চিঠি লেখেন। এই কবিতাটি সেই পত্রের উত্তরে লিখিত।

আমাদের এই ছায়াবীথিতলে বেণুকা-কুঞ্জ মাঝে
অনাদি কালের সে-সংগীতের মৃদু ইঙ্গিত বাজে।
মিলনে বিরহে হাসে কাঁদে হেথা শুক্লা কৃষ্ণা তিথি
আলোক-আঁধারে জড়াজড়ি এই মায়া-ঘন ছায়া-বীথি।

'ছায়াবীথি'
কার্তিক ১৩৪০

৬৭

লেখা

নিত্য আমায় আড়াল করি
আমার হাতের লেখা দিয়ে,
আমি বিনে সবাই বাঁচে
আমার গানের সুধা পিয়ে।

সিনান করি জোছনাধারায়
আকুল যখন দশ দিশি,
কলঙ্ক তার বুকে চেপে
জাগে গো চাঁদ একলা নিশি।

আমার হাতের বজ্র-আঘাত
তারেই সবাই রাখল চিনে,
জানল না বাজ গর্জে কেন
চোখের জলের বাদলা-দিনে।

'সওগাত'
ভাদ্র ১৩৩৮

৬৮

রুবাইয়াৎ

জ্ঞান-বোস্তান ফেরৎ এলে নব বধূর গুলিস্তান
খুশির রসে পূর্ণ করো ঠুন্‌কো জীবন-পাত্রখান।
কাজি করো আনন্দকে, রাজি করো ভাগ্যকে,
কাবিননামায় লিখে দিয়ো চির-নবীন তাজা প্রাণ॥

'সবুজ বাঙলা'
শ্রাবণ ১৩৪১

৬৯

অক্ষয় হোক্ তোমার নভে শুক্লা চতুর্দশীর তিথি,
কিন্নরলোক পার হয়ে যাও বাণী-বনের নও-অতিথি,
যে মন দিয়ে তুমি চপল করলে আমার চিত্ত হরণ,
বৃন্দাবনের কিশোর রাখাল করুন তোমায় সেই সে প্রীতি॥*

* [সুরশিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ দাসের খাতায় কবি এটি লিখে দেন।]

৭০

সুন্দর তব ধ্যানের কমল ফুটিবে যবে
তোমার নয়নে সেদিন আমার প্রকাশ হবে।
লীলাচঞ্চল প্রাণ মম রবে স্তব্ধ হয়ে,
মৌনী তোমার ধেয়ানের নীরে আকুল স্তবে।

১৯শে মার্চ ১৯৩৩

৭১

অঞ্জলি

হে তরুণ! কোন্ অঞ্জলি দিতে এই যুগে আসিয়াছ?
কোন্ সে অসম্ভবের সাগর-স্রোতে তুমি ভাসিয়াছ?
তুমি কি ঘরের? অথবা পীড়িত ভারতের তুমি কেহ?
ভোগের অথবা পরম ত্যাগের তরে তব প্রাণ দেহ?
আজি ভারতের সন্ধিক্ষণে অঞ্জলি নিবেদন
করিবে কি তব সকল শক্তি আত্মা ও যৌবন?

৭২

শক্তি

শক্তি-সিন্ধু মাঝে রহি হায় শক্তি পেল না যে,
মরিবার বহু পূর্বে জানিও মরিয়া গিয়াছে সে।

৭৩
দীপ্তি

আঁধার হেরেমে তোমরা দিব্য দীপ্তি সঞ্চারিকা,
রোজা–অবসানে খুশির ঈদের হেলালের ললাটিকা।
ফিরদৌসের গুলরুখ এলে শিশির–নেকাব খুলি,
এতদিনে শিশ–মহলের দ্বার খুলিয়াছে বুলবুলি।
আনন্দ–প্রজাপতি এলে মেলি চিত্রাঞ্চল পাখা,
নূতন আকাশ দেখিলাম আমি নব রামধনু আঁকা॥

৭৪
কল্যাণী

যেমনি মনের ঝরোকা হইতে বোরকা ফেলিলে টানি
ফিরদৌসের লালা–গুলরুখ হলে তুমি, কল্যাণী!
তব মুক্ত–মনের উদার আকাশে
কত তারা ফোটে, কত চাঁদ হাসে,
তোমার কথার পারাবতগুলি চঞ্চল পাখা হানি
দিগ্‌দিগন্তে উড়ে চলে আজ শুনায়ে আশার বাণী।

হেরেমের নহ, তুমি এরেমের বাগিচার অঞ্জলি,
পল্লব–গুণ্ঠনে ঢাকা ছিলে শুভ্রা শাপলা–কলি।
উতারি সহসা মুখের নেকাবে
হেরিলে, ঈদের চাঁদের রেকাবে
ঊর্ধ্ব হইতে আনন্দ–ঘন অমৃত পড়ে গলি,
ফোরাতের ধারা নেমে এলে মরু কারবালা আন্দোলি।

জুলফেকারের পাশে তব কালো জুল্‌ফের ছায়া দোলে,
কওসর–সাকি হায়দরের কি পেয়ালা তোমার কোলে?
জৈতুন–রাঙা রওগন নিয়ে
হেরেমে হেরেমে প্রদীপ জ্বালিয়ে
এস তাপসিনী রাবেয়া! ওঠো শুকতারা সম জ্বলে,
কোহ্–ই–তুর হতে নূর আনো, এই আঁধার দিগঞ্চলে।*

কলিকাতা
১লা জানুয়ারি ১৯৪১

* কবি এই কবিতাটি সুফী জুলফিকার হায়দারের সহধর্মিণী রাবেয়া হায়দারকে 'পরম কল্যাণীয়া বধূ–মাতা রাবেয়া হায়দার চিরায়ুষ্মতীসু' শিরোলেখায় উপহার দিয়েছিলেন।

৭৫
বধূবরণ

তুমি বউ শুধু নও, ঘরের আলো,
এই আলোতে মোদের ঘরে
কেটে যাবে আঁধার কালো।

রাঙা হাতে শাদা শাঁখা
অন্নপূর্ণার আশিস-মাখা
ক্ষয় যেন না হয় ও-হাতে,
অম্লান থাক সিঁদুর মাথে।

এই চাই ভাই ঘরে পরে
পড়বে সবার সুনজরে।
হাসিমুখে থাকবে সদা
কথায় হবে প্রিয়ংবদা।

আলতা সিঁদুর নোয়া পরে
থাকো তিনকূল আলো করে।
অরুন্ধতী তারার মতো
থাকো স্বামীর অনুগত॥

৭৬
চিত্রপট

তোমার মৌন ছবিতে ফুটুক কবির চপল ছন্দ,
তোমার তুলির কালিতে উঠুক কুহু ও কেকার দ্বন্দ্ব।
তোমার ধ্যানের সুন্দর যেন আসে
তোমার তুলির স্পর্শে তোমার পাশে,
তোমার চিত্রপটে থাকে যেন প্রভাতী পদ্ম-গন্ধ॥*

কলিকাতা
৫ই ফাল্গুন ১৩৪৮

* চৌধুরী ওসমানের সৌজন্যে

৭৭
আগমনী (কমিক)

সবাইকে তুই বর দিলি মা, পাষাণ-রাজার ঝি!
(আমি) ভিড় ঠেলে যে যেতে নারি, বর পাব না কি?

এই শিয়ালগুলোয় ভাঙা বেড়া কে দেখাল বল্?
কাছা খুলে ছুটছে যত আকাল হুড়োর দল!
দূরে থেকেই বল্‌ছি মাগো, (আঃ কি গণ্ডগোল!)
তুই কি শুন্‌তে পাবি মাগো বাজ্‌ছে যা ঢাক-ঢোল!
বেশি কিছু চাইনে আমি, চাইব নাকো যা তা,
মা, ঘোল ঢাল্‌তে পারি যেন মুড়িয়ে দুখের মাথা।
(তোর) সিঙ্গিটাকে দে মা ছেড়ে এক মিনিটের তরে
আমার যত পাওনাদার মা, সব কটারে ধরে
ঠেসে গোটা কতক করে মেরে আসুক থাবা,
মনের সুখে বল্‌ব, 'বাপু, আর কি টাকা চাবা?'

ঐ খাঁড়াটা নিয়ে মা তোর করতে পারিস্ তাড়া?
বাড়িওয়ালা যেই আস্‌বে চাইতে বাড়ি ভাড়া?
(আমার) টাকার খাঁক্‌তি নাই মা মাসে দশ হাজার—
মা ছড়িয়ে যদি দিস, ভাবব, ধন পেয়েছি রাজার।
ছেলে হবে জজ ম্যাজিস্টর, মেয়ে হবে রানি,
আমার যত শত্রু গিয়ে জেলে টান্‌বে ঘানি!
রাত্রে যেমন কামড়ায় না ছারপোকা আর মশা,
আর দিনের বেলা সইতে পারি গায়ে মাছি বসা।
মা খাবার কথা বলি যদি ভাববি পেটুক ছেলে,
আমি ভাত না খেয়েও থাক্‌তে পারি পোলাও লুচি পেলে!
মাছের মুড়ো, মাংসের ঝোল, পাঁচটা ভাজাভুজি,
হ্যাদে দ্যাখো দই সন্দেশ বলিনিকো বুঝি?
দেখ্‌লি তো মা, খাওয়ার আমার ইচ্ছেই নেই মোটে,
পেটুক-বলে কলঙ্ক মোর তবু গেল রটে।
কাঁহাতক আর বেড়াই মাগো হেঁটে হটর হটর
পেট্রল যাতে খায় না, দিবি এম্‌নি একটা মোটর।
জানিস্ তো সন্ন্যাসী হবো আমি দুদিন পরে,
একটা কথা বলে রাখি রাখিস্ মনে করে—

তোর বৌমার বাক্‌শো ভরে গা ভরে দিস্ গয়না
পাঁচটা লোকে তোর নামে মা মন্দ যেন কয় না।
আমিও যুদ্ধ করতে পারি, তোরই তো মা ছেলে,
পারি অসুর দানব খেদিয়ে দিতে, ভুঁড়ি দিয়ে ঠেলে!
বলিস্ যদি, ল্যাং মেরে মা ফেলেও দিতে পারি,
তা কাঁদিয়ে মাকে আমি কি আর যুদ্ধে যেতে পারি?
নাতিপুতি রেখে মা গো একশো বছর পরে
মায়ার সংসার ছেড়ে না হয় যাব তোরই ক্রোড়ে!
আরো অনেক চাওয়ার ছিল দিলুম সে সব ছেড়ে
হেসে ফেলে বলবি হয়তো 'খোকা, বড্ড একঘেঁড়ে'!

৭৮

মীরা!

জ্যোৎস্নাসিক্ত ফাল্গুন-বন-পুষ্প ছানি
ভরেছ শিশির শিশ্‌মহলে সে খোশবু আনি।
নাগকেশরের ফণা-ঘেরা মউ করিয়া খালি
সাজায়েছ তব গন্ধউতল 'প্রীতি'র ডালি।
গন্ধ নহে ও, ও যেন বিধুর মধুর স্মৃতি
প্রিয়া আর আমি-একা নদীতট-কাননবীথি।
নব যূথিকার প্রেম-ঘন বাস কাঁদায় মেঘে
'মানসী' এনেছে জুঁইকুঁড়ির সে সুরভি মেগে।
গন্ধে তাহার প্রিয়ার খোঁপার জুঁইমালিকা
মনে পড়ে, ঝরে বাদলের মেঘ, একা বালিকা।
'প্রেমগীতি' তব ঠুংরি গানের মতোই মিঠে
বাসর-নিশির প্রিয়ার মুখ-মদিরা ছিটে।
কেমনে আনিলে বন্দি করিয়া এ 'বনগীতি'
লাজুক বধূর যেন এ প্রথম প্রণয়-ভীতি।
লুকাইতে নারে বুকের গোপন গন্ধ-মধু
বনের বালিকা—'ষোড়শী'র মতো যাচে না বঁধু।
'রেশমি' অলক চূর্ণে মাখিয়া সুন্দরীরা
করিবে আলগ প্রেমের বাঁধন খোঁপার গিরা।
করিবে স্মরণ তোমারে নিখিল বন্দি হিয়া —
বেণীর বাঁধন শিথিল করেছ 'রেশমি' দিয়া।

. ওগো ফুলমালী মুগ্ধ প্রাণের অর্ঘ্য লহ ;
ঘরে ঘরে তব সুবাস বিলাক গন্ধ-বহ॥

[তথ্যের উৎস : 'মীরা' পুষ্পনির্যাস ও প্রসাধন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন। 'দুন্দুভি', ২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ৮ই আশ্বিন, ১৩৩৯। 'মীরা' : পুষ্প নির্যাস ও প্রসাধনদ্রব্য প্রস্তুতকারক। হেড অফিস — ১১ নং ক্লাইভ রো কলকাতা। কারখানা — ১১/এ এ প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, কলকাতা।]

৭৯

মৃত তারা

কাব্যের নীল স্বচ্ছ গগনে অকল্যাণের হেতু
একদা শারদ নিশীথে সহসা উঠেছিনু ধূমকেতু।
যে উদার নভ-অঙ্গনে লীলার আলো দানিবার সাধ !
কেহ হেসেছিল উদ্ধত মোর বিপুল স্পর্ধা হেরি,
কেহ এসেছিল পতঙ্গ-সম অগ্নি-করে শত রবি চাঁদ,
কেন জেগেছিল সে সভায় মেকতন ঘেরি।
কেহ বেসেছিল ভালো আমারে, কেহ বা কৌতূহলী
নিবেদন মোরে করেছিল যেন পুলক-পূজাঞ্জলি।
আজো সে-স্মৃতির দু'একটি কণা প্রাণে ঝিকিমিকি করে,
রেশ্‌মি চুড়ির আধেক খণ্ড ভেঙে-যাওয়া খেলা-ঘরে।

কোটি জ্যোতিষ্ক গ্রহ-তারকার যেথা অনন্ত ভিড়
ছুটে এনু সেথা উৎপাত-শনি ধনুর্মুক্ত তীর।
বিস্ময়ে ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠিল দিগঙ্গনা,
হংসসারির মালিকা ফেলিয়া পলাইল উন্মনা।
হুজুগের ধূলি-অন্ধ আকাশ-ললাটে তিলক-রেখা
আঁকিল আমার অশুভ ধূম্র-মলিন অগ্নি-লেখা।
ত্রিপুণ্ড্রধারী রুদ্রের রোষ-বহ্নিতে জনমিয়া
ভয়াল জ্যোতির্জাগশিশু-সম আসিলাম বাহিরিয়া।
আমার ফণার মণি করিলাম উল্কাপিণ্ড তুলি
মহাকাল-করে জ্বালাময় বিষ-কেতন উঠিনু দুলি।
সেদিন আমারে প্রণতি জানাতে এল কত নর-নারী,
বন্দিয়াছিল আমারে ভাবিয়া সাগ্নিক নভোচারী।

তাহাদের পানে লজ্জায় আমি চাহিতে পারি না আজ,—
রবি ও শরৎ-চন্দ্র বিরাজে যে মহাগগন মাঝ,
আলোক দানের স্পর্ধা লইয়া এসেছিনু সেই নভে ;
জানি না সে মহাঅপরাধের যে ক্ষমা পাব আমি কবে।
রবি ও চন্দ্র তেমনি জ্বলিছে, দানিছে তেমনি আলো,
স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোতিতে হরিছে বিশ্বের তম কালো।
আজ মনে নাই সে গগনে কবে উঠেছিল ধূমকেতু,
ক্ষণিক আতশবাজি সম এসেছিল কৌতুক হেতু।
যদি ভুলে থাকে, তবে সে পরম ভাগ্য বলিয়া মানি,
যদি ভুলে থাকে বীণাপাণি মম জ্বালাময় বিষ-বাণী।
সে বাণীতে মোর কাহারো প্রাসাদ জানি না জ্বলেছে কি না ;
আমি জানি শুধু জ্বলিয়াছি আমি, জ্বলেনি বাণী ও বীণা।
জ্যোতিহীন বিষহীন ধূমকেতু আজো হায় বেঁচে আছি ;
বিরাট-পুরীতে অজ্ঞাতবাসে ফাল্গুনী ফেরে নাচি !
যাহারা আমারে ভোলেনি আজিও ভালোবাসে করুণায়
বাহিরে আলোর উৎসবে তারা ডাকে যবে—'ফিরে আয়',
দুই চোখে মোর জল ভরে আসে, চাহিতে পারি না লাজে ;
কবরের পাশে বন্ধুর ক্রন্দন শেল-সম বাজে।
নিজের আগুনে জ্বালাইয়া চিতা যার প্রাণ জ্বলিয়াছে,
কাঁদি তাহাদের তরে, যারা এসে কাঁদে সে চিতার কাছে।

প্রদীপ জ্বলিয়া নিভিয়া গিয়াছে, আছে সলিতার ছাই ;
তার কাছে যবে আসে পতঙ্গ, এসে দেখে আলো নাই।
ফিরে যায় তারা, অন্তর কাঁদে চেয়ে তাহাদের পানে,
লজ্জায় মরে সকরুণ স্বরে কহি আমি ভগবানে—
যে প্রদীপ আলো দানিতে পারে না, কেন তারে আর রাখা,
হে প্রভু, এবার মাটির প্রদীপ মাটিতে পড়ুক ঢাকা !
সহে না সহে না এ বিড়ম্বনা, মরিয়া গেছে যে তারা,
জ্যোতির্বিহীন সে ক্ষুদ্র তারা হউক এবার হারা
তাহার তিমির-মাতৃঅঙ্কে, ভুলে যাক তারে সবে ;
প্রয়োজন তার নাই আলোকের উৎসবে মহানভে।

সাপ্তাহিক 'ছন্দা'
দ্বিতীয় বার্ষিক শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪

৮০

থেকো পাশে

থেকো প্রিয় পাশে সদা, সাঁঝ আসে নেমে ;
আঁধার ঘনায় প্রভু, থেকো পাশে প্রেমে।

যবে ছেড়ে যায় সবে, সুখ নাহি হাসে,
অনাথের নাথ, তুমি থেকো মোর পাশে।
জীবনের ছোট ছোট দিনখানি হয় মায়া,
ধরণীর খেলা দীপ মেলা হয় ছায়া।

পলক আড়াল নয়, থেকো কাছে কাছে ;
তুমি ছাড়া আর বলো কে আমার আছে ?

৮১

জামালউদ্দীন

সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন আফগানি তসলিম,
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য—পুরুষ মহামহিম ॥

সাম্য ওমর ফারুকের তুমি, আলির জুলফিকার,
অসম সাহস খালেদের, মুসা তারেকের তলোয়ার,
নিরাকার কারবালা-প্রান্তরে দুল্‌দুল্‌ আস্‌ওয়ার,
জড় ও ক্লীবের মাঝে এসেছিলে আদর্শ মুসলিম ॥

কারাগারে তুমি দেখিলে স্বপন কোন্‌ মহামুক্তির,
ভাঙিয়া বুলন্দ-দরওয়াজা হলে মুক্ত-লোকে বাহির,
খান্‌খান্‌ হয়ে টুটিল অমনি চরণের জিঞ্জির,
রাঙিল আকাশ, বন্দির বুকে জাগিল আশা অসীম ॥

শত লাঞ্ছনা জুলুম সহিয়া ভাঙিলে সবার নিঁদ,
বুকের রক্তে সুবহ্‌-সাদেক আনিয়া হলে শহিদ,
জাগিল কাবুল, মেসের, ইরান, তুর্ক, আরব, হিন্দ্‌,
তুষার-সাগরে হে চাঁদ আসিয়া জাগালে জোয়ার ভীম ॥

সউদ, কামাল, জগলুল-পাশা, ইব্‌নে-করিম বীর
তোমার মানস-পুত্রের রূপে এল উন্নত শির,
দ্বীনের জামাল, তরুণ শাহানশাহির আলমগির,
'প্রাচী'-র গর্ব, সাম্য মৈত্রী মানবতার খাদিম ॥

'বুলবুল'
চৈত্র ১৩৪৪

৮২

স্নিগ্ধ ছায়া শান্ত গ্রামের নিকুঞ্জ একটেরে
পাখি যথায় ফুলের সাথে আলাপ করে ফেরে
সূর্য-কিরণ গহন নীলে গাহন করি যথা
কোমল হয়ে ঝরে পড়ে, স্তব্ধ যথা কথা,—
জ্ঞান-সাধকের সেই তপোবন, সেইতো তীর্থভূমি,
কুসুম সদাই ঝরে হেথায় দেউলচূড়া চুমি।
বাইরে চলে কোলাহলের বিরাট কর্মশালা ;
ধূম্র-মলিন আকাশ সেথা নীল অমিয় ঢালা ;
নিত্য হৃদয় পিষ্ট সেথা কাজের জাঁতাকলে
হেথায় বসে নীরব সাধক একলা তরুতলে।
হেথায় বসে গোপনে সে জ্বালায় প্রাণের বাতি,
আপনাকে সে ক্ষয় করে আর ঘুচায় আঁধার রাতে
অল্পে পরিতুষ্ট এরা বিপুল এদের দান
এরাই করে মানুষেরে মহা মহীয়ান।
সুন্দর হোক সার্থক হোক এই জ্ঞানসাধনা,
আসুক হেথা যাত্রী শত কুড়াতে জ্ঞান-কণা।
বাণীর আশিষ ঝরুক্ হেথা সহস্র কিরণে,
জাগুক ইহার মন্ত্রে সবাই নবীন জাগরণে।

৮৩

তোমায় আমায় ছিলাম যেন এক সে লোকে
স্বপ্নচারী নাট দেউলে সুর-অলখে।
আমার চোখে চাঁদনি রাতের তন্দ্রালুতা
সুরের স্বপন গানের নেশা তোমার চোখে।

(২)
তোমার হাতে ব্যাকুল বেণু আমার হাতে ফুলের গুছি
পলাতকা খুঁজতে তুমি দূর গগনে তারার কুচি ;
কমল–বনে মানস–সরে খুঁজতাম মৌ মধুপ হয়ে
সেই সায়রে ফিরতে তুমি শুভ্র সবার রুচির শুচি।

(৩)
সন্ধ্যাকাশের রঙের মায়া নিতাম আমি দুচোখ পুরে
সন্ধ্যাতারার প্রদীপ জ্বেলে ডাকত প্রিয়া দূর সুদূরে
শুক্লাতিথির পহিল চাঁদের ধনুক–হাতে কিশোর তুমি
আসতে আমার মেঘের সান্ধ্য মেখে কাঁদিয়ে গগন উদাস সুরে।

(৪)
আমি ছিলাম 'বৌ কথা কও' তুমি ছিলে নিধর কুহু
তোমার গানে আমার গানে কাঁপত কানন মুহর্মুহু
আমার গানে নামত বাদল ফুটত কুসুম তোমার গানে
বাণীর হাতে বেণু বীণা সরব ভাষা আমরা দুঁহু।

(৫)
কখন আমি এলাম ভেসে সুরের স্রোতে এই ধরাতে,
ভুলে ছিলাম অতীত কথা তুমি এসে ধরলে হাতে
স্মরণপারের আনলে ভাষা আনন্দ–দূত তোমার চোখে
তুমি ছিলে অনুজ মম বাণী মায়ের সুর–সভাতে।

(৬)
বাণী মাতার আমি ভাষা তুমি ছিলে কণ্ঠে মালা
আজ ধরাতে নতুন করে শুরু মোদের তারির পালা
ফুল ফোটা আর ঝরার মাঝে যে অবকাশ তারির ফাঁকে
বাণী–বনে পালিয়ে বেড়াই আমরা দুজন নিত্ নিরালা।

(৭)
হয়তো হাসে অবিশ্বাসী স্বপনলোকের মোদের দেখে
মোদের প্রাণের ভাষা শুধু চন্দ্রপাতে আকাশ লেখে
উটপাখিরা উড়তে নারে, দূরবিহারী দেখে না
হয়তো হাসে, আমরা শুধু গান গেয়ে যাই গগন থেকে।

(৮)
ধূলির ঊর্ধ্বে স্বপ্ন-লোকে রচব আমি বিধুর গীতি
কণ্ঠে তোমার মর্ত্য-পারে থাকবে আমার সে-সুর-স্মৃতি।
ঊর্ণাও হয়ে উড়ব যবে দৃষ্টিপারের অন্ধকারে
তোমার গানে খুঁজবে তারা চাইত যারা আমায় নিতি।

(৯)
চোখের জলের বাদলাশেষে রঙিন গানের ইন্দ্রধনু
উঠবে যবে, সেই সে রঙে রাঙিয়ে যাবে তোমার তনু
সেই সে ধনুক হাতে নিয়ে লাগিয়ে তাতে সুরের শায়ক
ফিরবে তুমি কুসুম-বনে ঘুম ভাঙিয়ে ফুল-অতনু।

৮৪
ঢাকার দাঙ্গা

এল কুৎসিত ঢাকার দাঙ্গা আবার নাঙ্গা হয়ে,
এল হিংসার চিল ও শকুন নখর চঞ্চু লয়ে !
সাড়া পৃথিবীর শ্মশানের ভূতপ্রেতেরা সর্বনেশে
ঢাকার বক্ষে আখা জ্বালাইতে জুটিল কেমনে এসে ?
এদের চিতার ধোঁয়া, ইহাদের কুৎসিত চিৎকার
অরুণোদয়ের পূর্বাচলেরে করেছে অন্ধকার !
এরা কি মানুষ ? এরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কি ? হুঁশ নাই,
ডান হাত দিয়ে বাম হাত কাটে ভায়েরে মারিছে ভাই।
আত্মহত্যা করিছে, বীরের মৃত্যু মরিত যারা,
মরণ-কালেও পাপ করে নিয়ে যায় অভিশাপ তারা !
এরা কি দৈত্য, রাক্ষস, জ্বিন, এসেছে পাতাল হতে,
কোন শয়তান টানিছে ওদেরে এই নরকের পথে ?
নিজ চোখে আজ দেখিতে পারো না আপন অকল্যাণে,
শান্তির নীড় অকারণে করে শ্মশান গোরস্থান !
ওদের অনাথ ছেলে ও মেয়েরে আশ্রয় দেবে কে ?
কে দেবে অন্ন-বস্ত্র ওদেরে বুকে তুলে নেবে কে ?

বুঝিয়া বোঝে না, এ যে গুণ্ডামি, এ নহে বীরের রণ,
চিরদিন ঘৃণা করিছে এদেরে ইতিহাস, জনগণ !

জাতির দেশের অকল্যাণের ইহারাই আজ হেতু,
বাঁধিতে দেয় না ইহারাই মহামিলনের প্রেম-সেতু !
কেহ লইবে না নাম ইহাদের কোনোকালে কভু মুখে
ইহাদেরই আত্মজ ফিরাইবে মুখ লজ্জায় দুঃখে !

ভারতের এরা কলঙ্ক, হীন নির্লজ্জ ও জড়,
শয়তানে এরা চেনে না, আল্লা, অন্ধেরে দয়া করো !
ভোলাও এদের এই হিংসা ও বিদ্বেষ জাতিভেদ !
ক্লেদাক্ত হাতে অজ্ঞান করে আপনার উচ্ছেদ !
দয়া করো দয়া করো ইহাদেরে, চিরকল্যাণ দাতা !
আপনার হাত দিয়ে কাটে এরা আপনার গলা মাথা !
এদের আঁখির বন্ধন খোলো, দেখাও প্রেমের জ্যোতি,
আপনারও নাশ করে, এরা করে মানবজাতিরও ক্ষতি।
কোন সে হিন্দু মুসলমানের নেতা ইহাদের গুরু ?
দগ্ধ করে সে 'নমরুদে' ভাঙো দুর্যোধনের উরু !

না, না, ওরা অত বড় নয়, ওরা গুণ্ডার সর্দার
উহাদের ঘাড়ে পড়ুক আল্লা তোমার চরম মার !

জাহান্নামের দূত ওরা শয়তানের গুপ্ত ভেলা,
উহাদেরি চক্রান্তে মোদের আসে নাকো ভোরবেলা
নিঃশেষ করে দাও উহাদের পৃথিবীর বুক হতে,
তোমার অভয় লইয়া চলুক আবার মানুষ পথে।

শান্তি দাও, শান্তি দাও, হে ক্ষমাময়, ক্ষমা করো
হে অভেদ ! এই ভেদ ভুলাইয়া উদার বক্ষে ধরো !
বাংলার এই হিংসালীলা ঢেকে দাও, ভেঙে দাও।
চির সুন্দর ! ক্ষমাপ্রসন্ন নয়নে আবার চাও !

'নবযুগ'

[কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'দৈনিক নবযুগ' থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকার ৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ৩১ অক্টোবর ১৯৪১–এ পুনর্মুদ্রণ করেন। কবিতাটি ইসরাইল খানের সৌজন্যে প্রাপ্ত। উল্লেখ্য, 'নজরুল-রচনাবলী'র পূর্ববর্তী সংস্করণে কবিতাটির আংশিক 'দাঙ্গা' নামে মুদ্রিত হয়েছিল।]

৮৫

বনস্পতির গান

ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে
কারা যেন ডাকে
বেরিয়ে এল তরুণ পাতা
পল্লবহীন শাখে ॥

ক্ষুদ্র আমার রুদ্র তালে
কচি পাতার লাগল নাচন
ভীষণ ঘূর্ণিপাকে ॥

স্থবির আমার ভয় টুটেছে
গভীর শঙ্খ-রবে,
মন মেতেছে আজ নূতনের
ঝড়ের মহোৎসবে ॥

কিশলয়ের জয়-পতাকা
অম্বরে আজ মেলল পাখা
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো
অভয় মহাত্মাকে ॥

৮৬

অগ্রনায়ক

অন্তরে যদি বিপ্লব নাহি আসে,
বৈশাখী ঝড় আসে নাকো ভৈরব-প্রলয়োল্লাসে।
বক্তৃতা দিয়া, মিছিল করিয়া, ধূলি উড়াইয়া ভাবি :
তুফান উঠেছে, এবার মিটিবে যত বিপ্লবী দাবি !
ওঠে ধূলি-ঝড়, পথের পাথর তেমনি পড়িয়া থাকে ;
বাঁকা তলোয়ার বাঁকা চোখে হাসে তেমনি পথের বাঁকে।
বলিয়া বেড়াই : 'শুধু চলিয়াই করেছি ভীষণ জয়,
চেহারা দেখেই দৈত্য-দানব পেয়েছে দারুণ ভয় !'
মৃত্যু-শঙ্কা আসিলেই সব ডঙ্কা থামিয়া যায় ;
মুখের কথায় লঙ্কা-কাণ্ড সকলে করিতে চায়।

চক্ষে আগুন জ্বলেনি যাদের আজিও রুদ্রতেজে,
বেদনা-আহত বক্ষে অভয়-বিষাণ ওঠেনি বেজে,
অগণন জনগণ নাহি আসে তাহাদের আহ্বানে,
কানে থাকে শুধু জয়ধ্বনি সে ধ্বনি বাজে নাকো প্রাণে।
আন্দোলায়িত কাহার বক্ষ ব্যথার আন্দোলনে?
মানুষের প্রেমে ভিক্ষু যে-জন, তারি কথা লোকে শোনে।
দেশেতে কাহার বক্ষে উঠেছে কালবৈশাখী ঝড়?
দুঃখী ও দীনে জড়াইতে চায় কেঁদে কার অন্তর?
অগ্রনায়ক সে-ই টলাইতে পারে পৃথিবীরে ধরে,
ঘুমন্তে সে-ই জাগাইতে পারে আগুন লাগায়ে ঘরে।
আগের মতোই চোরে চুরি করে, মোরা করি পাঁয়তারা;
চোর চুরি করে নিয়ে গেলে মোরা চিৎকার করি : 'দাঁড়া!'
মারিতে পারি না হারিবার ভয়ে, মরিবার ভয়ে, হায়!
বলাবলি আর দলাদলি নিয়ে শুভদিন বয়ে যায়।

কত শুভদিন এল, এলোমেলো হইয়া রহিল সব;
বাহিরে এল না, করিল কেবল ঘরে বসে কলরব।
কে হইবে বড়, কে হইবে ছোট, শুধু এই আলোচনা;
লাভের মধ্যে পাইলাম শুধু বিধির বিড়ম্বনা!
কর্মের নামে ধর্মের নামে কলহ রাত্রিদিন,
মরমের কথা কহিছে চর্মকারেরা মর্মহীন।
সবাই মোড়ল, সবাই শুনিবে আপন জয়ধ্বনি;
সৈনিক নাই, শত শত দলে শত সেনাপতি গণি।
দেশ আর জাতি হলো ছারখার নেতৃত্বের লোভে;
দু'জনে মিলেছে, তারও দল আছে, দেখে হেসে মরি ক্ষোভে।
তখ্‌তে চড়িতে পারিল না কেউ, তক্তায় চড়ে নাচে;
তক্তায় ঠাঁই নাই দেখে নেতা হতে উঠে বসে গাছে।
গেছুড়ে এঁচড়ে কত নেতা দেখি; পড়ে যদি তরমুজ,
বোমা ভেবে সবে পালাবে, বলিবে : 'কচু-বন কোথা, খুঁজ!'

'মেক্‌-আপ্‌' করিয়া অভিনেতা হয়, নেতা নাহি হওয়া যায়;
নিরহঙ্কার নির্লোভ নেতা কোনো কিছু নাহি চায়।
অভিনন্দনমালা চাহে নাকো, চাহে না জয়ধ্বনি;
চাকরের মতো দেশসেবা করে, তাহারেই নেতা গণি!
চাহে না আত্মকল্যাণ, চাহে মানুষের কল্যাণ;
বিনয়-নম্র সে নেতা করে না কাহারও অসম্মান।

তাহার লেখায় কথায় ফোটে না গর্ব অসংযত ;
নেতা তবু ভাবে সে শুধু সেবক, সেবা করে অবিরত।
সে-ই আল্লার শক্তি লভিয়া নিত্য শক্তিমান,
তারি মুখ দিয়া উদ্‌গত হয় আল্লার ফরমান।
অন্তরে তার বহে দুরন্ত সদা বিপ্লব-ঝড় ;
বাহিরে থাকে সে শান্ত, করিয়া আল্লাতে নির্ভর।
তিনিই ইমাম, তিনিই অগ্রনায়ক, সারথি তিনি,
জাগাইয়া ভূমিকম্প পাষাণে চেতনা জাগান যিনি।
সর্ব-যুদ্ধে জয়ী হন ইনি আল্লার শক্তিতে,
এঁর সৈন্যরা সমবেত হয় প্রেম আর ভক্তিতে।
এঁর সৈন্যরা করে নাকো ভয় সেনাপতি বলে তাঁকে ;
তাদের পরম বন্ধু বলিয়া ভালোবেসে বুকে রাখে।
এঁর প্রেম আনে সেনাদের বুকে আত্মদানের বল,
'কে আগে পরান দেবে' বলে সেনাদল হয় চঞ্চল।
অন্তরে যার মহাবেদনার মহাসাগরের ঢেউ,
তারি পানে ছোটে যত নদী-জল, রুধিতে পারে না কেউ।
ঘুমায় না রাতে, কোন্ নেতা কাঁদে মানুষের বেদনায় ?
কাহার হাতের ভাত ক্ষুধাতুরে মনে হয়ে পড়ে যায় ?
সেই ভিক্ষুক, সেই প্রেমী, শুধু মহাবিপ্লবী জানি ;
মানুষ মুক্তি লভে যুগে যুগে মানিয়া তাহারি বাণী॥

৮৭

জয় হোক ! জয় হোক !

জয় হোক, জয় হোক, আল্লার জয় হোক !
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক !
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক !
সর্বঅকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্বঅপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি
হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক !
জয় হোক, জয় হোক !

দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক-দুখ,
দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক !

মৃত্যু–বিজয়ী হোক অমৃত লভুক
ভয়–ভীত দুর্বল নির্ভয় হোক !
জয় হোক ! জয় হোক !

রবে না এ শৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার,
বন্ধন কারাগার হবে হবে চুরমার,
পার হবে বাধার গিরি–মরু–পারাবার,
অসৎ, অবিদ্যা, লোভী ও ভোগী লয় হোক !
জয় হোক ! জয় হোক !

যৌবন জয়ী হোক, জড়তা ও জরা যাক,
প্রতি নিশ্বাসে 'পাব' বিশ্বাস বেঁচে থাক !
'পাব না' বলে যারা, জ্যান্তে মরা তারা,
আঁধারের জীব তারা ভয়ে দ্বার খোলে না,
পাষাণ–পিণ্ড তারা নিশ্চল চলে না।
জীবন যাদের আছে তারাই মানুষ,
তাদেরই সাথে শুধু পরিচয় হোক !
জয় হোক, জয় হোক !

জাগে না ভিতরে যার প্রবল তেজ,
কে কাটিবে হায় তার ভিতরের লেজ ?
অসম্ভবের পথে যে বীর চলে
আসমানে শির তার, পৃথিবী টলে
তাহার চরণ–তলে। অসাধ্য তার
আয়ত্ত হয় সাধনার।
ঝন্‌ঝার গতি–বেগ তাহার সাথী,
কোটি গ্রহ–তারা তার পথের বাতি।
না–দেখা বিপুল শক্তিতে আপনার
মানব পুনরায় অসংশয় হোক !
জয় হোক, জয় হোক !

পরাজয় মানে না সে আছে যার যৌবন,
যুদ্ধ করে সে করিয়া পরান–পণ,
যাহা চায় তাহা যদি নাহি পায় তবু সে
রণক্ষেত্রে মরে, পলায় না কভু সে।
অসুর–নির্জিত মানবতা ক্লৈব্য
পুন দুর্জয় যৌবনময় হোক !
জয় হোক, জয় হোক !

আল্লার দেওয়া পৃথিবীর ধন-ধান্যে
সকলের সম অধিকার ;
রবি শশী আলো দেয়, বৃষ্টি ঝরে—
সমান সব ঘরে, ইহাই নিয়ম আল্লার।
এক করে সঞ্চিত, বহু হয় বঞ্চিত—
জাগো লাঞ্ছিত জনগণ সবে—সঙ্ঘবদ্ধ হও !
আপনার অধিকার জোর করে কেড়ে লও !
নহিলে আল্লার আদেশ না মানিবে,
পরকালে দোজখের অগ্নিতে জ্বলিবে ;
দুনিয়াতে আবার সর্বভ্রাতৃত্ব সমন্বয় হোক।
জয় হোক, জয় হোক !

রবে না দারিদ্র্য, রবে না অসাম্য,
সমান অন্ন পাবে নাগরিক গ্রাম্য,
রবে না বাদশা রাজা জমিদার মহাজন,
কারো বাড়ি উৎসব কারো বাড়ি অনশন,
কারো অট্টালিকা কারো খড়হীন ছাদ,
রবে না এ ভেদ, সব ভেদ হবে বরবাদ।
নির্যাতিত ধরা মধুর সুন্দর প্রেমময় হোক !
জয় হোক, আল্লার জয় হোক !

সাম্যের জয় হোক ! শান্তির জয় হোক !
সত্যের জয় হোক ! জয় হোক, জয় হোক !

দৈনিক 'নবযুগ'
২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১

৮৮

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয়,
নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময় !
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরম পতি,
মোর ধ্যান-জ্ঞান তনুমন-প্রাণ, আমার পরম গতি।

প্রভু বলি কভু প্রণত হইয়া ধুলায় লুটায়ে পড়ি,
কভু স্বামী বলে কেঁদে প্রেমে গলে তাঁরে চুম্বন করি !
তাঁর উদ্দেশে চুম্বন যায় নিরুদ্দেশের পথে,
কাঁদে মোর বুকে ফিরে এসে যেন সাত আসমান হতে।
তাঁরি সাধ পুরাইতে বলি, 'আমি তাঁহার নিত্যদাস।'
দাস হয়ে করি তাঁর সাথে কত হাস্য ও পরিহাস।
রূপ আছে কিনা জানি না, কেবল মধুর পরশ পাই,
এই দুই আঁখি দিয়া সে অরূপে কেমনে দেখিতে চাই !
অন্ধ বধূ কি বুঝিতে পারে না পতির সোহাগ তার ?
দেখিব তাঁহার স্বরূপ, কাটিলে আঁখির অন্ধকার !

কেমনে বলিব ভয় করে কি না তাঁরে,—
যাঁহার বিপুল সৃষ্টির সীমা আজিও জ্ঞানের পারে।
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয়,
কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয় !
কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি নাকো, শুধু কাঁদি আর কাঁদি ;
কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তাঁরে বাঁধি !
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি ?
চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি ?
কোনো প্রেমিকা ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ,
সে প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহ্লাদ !

তাঁরে নিয়ে খেলি, কভু মোরে ফেলি যেন দূরে চলে যায়,
সাজানো বাসর ভাঙি অভিমানে ফেলে দি পথ-ধুলায় !
বিরহের নদী ফোঁপাইয়া ওঠে বিপুল বন্যা-বেগে,
দিন গুনে কত দিন যায় হায়, কত নিশি যায় জেগে !
চমকিয়া হেরি কখন অশ্রু-ধৌত বক্ষে মম
হাসিতেছে মোর দিনের বন্ধু, নিশীথের প্রিয়তম !

আমি কেঁদে বলি, 'তুমি কত বড়, কত সে মহিমময়,
মোর কাছে আস,—শাস্ত্রবিদেরা যদি কলঙ্কী কয় !
নিত্য পরম পবিত্র তুমি, চির প্রিয়তম বঁধু,
কেন কালি মাখো পবিত্র নামে, মোরে দিয়ে এত মধু !
মোরে ভালোবাসো বলে তব নামে এত কলঙ্ক রটে,
পথে-ঘাটে লোকে কয়, যাহা রটে, কিছু তো সত্য বটে !'

তুমি বলো, 'মোর প্রেমের পরশ-মানিক পরশে যারে,
আর তারে কেউ চিনিতে পারে না, সোনা বলে ডাকে তারে।
তাহার অতীত, তার স্বধর্ম মুহূর্তে মুছে যায়,
তবু নিন্দুক হিংসায় জ্বলে নিন্দা করে তাহায় !'

'সে কি কাঁদে,' কহে শাস্ত্রবিদেরা। মোর প্রেম বলে, 'জানি,
আমার চক্ষে বক্ষে দেখেছি না-দেখা চোখের পানি।
তাঁর রোদনের বাণী শুনিয়াছি বিরহ-মেঘলা রাতে,
ঝড় উঠিয়াছে আকাশে তাঁহার প্রেমিকের বেদনাতে !'

আমি বলি, 'এত কৃপাময়, এত ক্ষমা-সুন্দর তুমি,
মানুষের বুকে কেন তবে এই অভাবের মরুভূমি ?'
প্রভুজি বলেন, 'মোর সাথে ভাব করিতে চাহে না কেউ ;
"আড়ি" করে আছে মোর সাথে, তাই এত অভাবের ঢেউ।
ভিখারির মতো নিত্য ওদের দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকি,
আমারে বাহিরে রেখো না বলিয়া কত কেঁদে কেঁদে ডাকি।
আমারে তাহারা ভাবে, আমি অতি ভয়াল ভয়ঙ্কর ;
আমি উহাদের ঘর দিই, হায়, আমারে দেয় না ঘর।
আমার চেয়ে কি পরমাত্মীয় মানুষের কেহ আছে !
আমি কাঁদি, হায়, পর ভেবে মোরে ডাকে না তাদের কাছে।
ভয় করে মোরে হইয়াছে ভীরু, যে চায় যা তারে দিই ;
জড়ায়ে ধরিতে চায় যে আমারে, তারে বুকে তুলে নিই।
সব মালিন্য, সব অভিশাপ, সব পাপ তাপ তার
আমার পরশে ধুয়ে যায়, আর করি না তার বিচার।
প্রতি জীব হতে পারে মোর প্রিয়, শুধু মোরে যদি চায়,
আমারে পাইলে এই নর-নারী চির-পূর্ণতা পায়।'

হেরিনু, চন্দ্র-কিরণে তাঁহার স্নিগ্ধ মমতা ঝরে,
তাঁহারি প্রগাঢ় প্রেম প্রীতি আছে ফিরোজা আকাশ ভরে।
তাঁহারি প্রেমের আবছায়া এই ধরণীর ভালোবাসা,
তাঁহারি পরম মায়া যে জাগায় তাঁহারে পাওয়ার আশা।
নিত্য মধুর সুন্দর সে যে নিত্য ভিক্ষা চায়,
তাঁহারি মতন সুন্দর যেন করি মোরা আপনায়।
অসুন্দরের ছায়া পড়ে তাঁর সুন্দর সৃষ্টিতে,
তাই তাঁর সাথে মিলন হলো না কভু শুভ-দৃষ্টিতে।

আমরা কর্ম করি আমাদের স্বকল্যাণের লাগি,
তিনি যে কর্মে নিয়োগ করেন, সেথা হতে ভয়ে ভাগি !
মোরা অজ্ঞান তাই তিনি চান, তাঁরি নির্দেশে চলি ;
তাঁহার আদেশ তাঁরি পবিত্র গ্রন্থে গেছেন বলি।
সে কথা শুনি না, পথ চলি মোরা আপন অহঙ্কারে,
তাই এত দুখ পাই, এত মার খাই মোরা সংসারে।
চলে না তাঁহার সুনির্দিষ্ট নির্ভয় পথে যারা,
অন্ধকারের গহ্বরে পড়ে মার খেয়ে মরে তারা।
তাঁর সাথে যোগ নাই যার, সেই করে নিতি অভিযোগ ;
তাঁর দেওয়া অমৃত ত্যাগ করে বিষ করে তারা ভোগ।
ভিক্ষা করিয়া তাঁর কৃপা কেহ ফেরেনি শূন্য হাতে,
যারা চাহে নাই, তারাই তাঁহারে নিন্দে অবজ্ঞাতে।
কার করুণায় পৃথিবীতে এত ফসল ও ফুল হাসে,
বর্ষার মেঘে নদ-নদী-স্রোতে কার কৃপা নেমে আসে ?
কার শক্তিতে জ্ঞান পায় এত, পায় যশ সম্মান,
এ জীবন পেল কোথা হতে, তার পেল না আজিও জ্ঞান।

তাঁরি নাম লয়ে বলি, 'বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।'
তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালোবেসে, বলে আমি চলে যাই,
তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই।
আর বলিব না। তাঁরে ভালোবেসে ফিরে এসে মোরে বলো,
কি হারাইয়া কি পাইয়াছ তুমি, কি দশা তোমার হলো !

৮৯

চির-নির্ভয়

আমি পেয়ে আল্লার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভয়,
আল্লা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয় !
কোনো বন্ধন-বাধা নাই তার কোনো অভিযান-পথে,
যত বাধা আসে তার কোটি গুণ শক্তি ঊর্ধ্ব হতে
আল্লার সেই বান্দার বুকে স্রোত-সম নেমে আসে।
হাতে তার সংহারী-তলোয়ার নেচে ওঠে উল্লাসে।

অবিশ্বাসীরা শোনো, শোনো, সবে জন্ম-কাহিনী মোর,
আমার জন্ম-ক্ষণে উঠেছিল ঝঞ্ঝা-তুফান ঘোর।
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহ-দ্বার,
ইসরাফিলের বজ্র-বিষাণ বেজেছিল অনিবার।
'আল্লাহু আকবর'-ধ্বনি শুনি প্রথম জনমি আমি,
আল্লাহ নাম শুনিয়া আমার রোদন গেছিল থামি।
সেই পবিত্র ধ্বনি রনরনি উঠেছে এ ধমনীতে
প্রতি মুহূর্তে চেতন ও অচেতন আমার এ চিতে।
জন্মক্ষণের সেই ঝড় মোরে টেনে এনে গৃহ হতে
লইয়া ফিরেছে কত অনন্ত অজানা অদেখা পথে।
কত গিরি কত অরণ্য কত সাগর মরুর পারে
জন্মক্ষণের বিষাণ আজান শুনিয়াছি বারেবারে।
কত দারিদ্র্য অভাব দুঃখ আঘাত দিল সে পথ,
তবু পাইয়াছি আল্লার অহেতুক কৃপা-রহমত !
নিত্য-যুদ্ধ করেছি বাধার সাথে চির-নির্ভীক,
মোর পরিচয় আমি জানি, আমি আজন্ম-সৈনিক।
কোনো ভয় মোরে ফিরাতে পারেনি মোর 'আগে চলা' থেকে,
কে যেন স্বপ্নে জাগরণে মোর নাম ধরে গেছে ডেকে।
পিছু-ডাকে সাড়া দিইনি কখনো, দেখিনি পিছন পানে ;
শুনিতাম কার মহা-আহ্বান, কাহার প্রেমের টানে
কেবলই অগ্রপথে চলিয়াছি, কে যেন রে অনুরাগে
কেবলই কহিত, 'হেথা নয়, ওরে আগে চল্ আরো আগে !'
যত বিদ্রোহী বিপ্লবী ছিল মোর প্রিয়তম সখা,
এদেরই বক্ষে আশ্রয় পেত এই চির-পলাতকা।

নিতি হাহাকার উঠিত এ বুকে, কাহার মহা-বিরহ
অসহ নিবিড় বেদনা কেন যে জাগাইত অহরহ।
সে কি আল্লাহ্ ? পরম পূর্ণ আমার পরম স্বামী ?
সে কি মোর চির-চাওয়া পূর্ণতা ? সে কি আমি ? সে কি আমি ?
দ্বন্দ্ব বাধিত তাঁহাতে আমাতে, কত যে মন্দ ভালো
কভু নিত মোরে ভীষণ তিমিরে, কভু দিত জ্যোতি আলো।
কক্ষচ্যুত গ্রহ ধূমকেতু-সম চলিয়াছি ছুটে,
যেতে যেতে কত ভুল-কণ্টক ফুল উঠিয়াছে ফুটে।
কত অপরাধ পাপ করিয়াছি, স্মৃতি হতে তাহা আজ
চির-বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতীত ভেবে কি কাজ ?

অতীতের মলিনতায় রুদ্ধ করেনি আমার পথ,
নিত্য-নূতন গতিবেগে চলে আমার তৃষার রথ।
যে নদীতে স্রোত-প্রবাহ মরেনি, সাগরের তৃষা যার,
কোনো মালিন্য করিতে পারে না অশুদ্ধ জল তার।

পুত্র মরিল, লুটায়ে কাঁদিনু। প্রথম পুত্রশোক!
সেই মুহূর্তে হেনার সুবাস আনিল চন্দ্রালোক।
ভুলিনু পুত্রশোক, ডুবে গেল সেই সুরভিতে মন;
বন্ধুরা দেখে কহিল, 'পিতা, না পাষাণ এ অচেতন?'
যে যায় আমার সম্মুখ হতে চিরতরে সে হারায়,
সেই মোর সাথী প্রবল গতিতে যে আমার সাথে ধায়।

আত্মা আমার চিরদিন কেঁদে কয়—'দেরি হয়ে গেল;
পূর্ণের সাথে শুভদৃষ্টির লগ্ন যে হয়ে এল!'
আগে চলি অনুরাগে, সহসা কে পিছু হতে মোরে টানে?
এ কি শয়তান, এ কি অজ্ঞান?—কি জানি....কে জানে।
কোথা হতে আসে অশান্তি নির্যাতন উপদ্রব,
দেয়ালির আলো দেখে যেন ছুটে আসে পতঙ্গ সব!
আজন্ম-সৈনিক আমি মোর নাহিকো মৃত্যু-ভয়;
মানি নাকো আমি বাধা ও বিঘ্ন, মানি নাকো পরাজয়!
মোর আরাধ্য মোর চির-চাওয়া পরম শক্তিমান,
মোরে বাধা দেবে কোন্ সে রুদ্র নরকের শয়তান?

সহসা দেখিনু সম্মুখে যেন অসীম নীলাম্বরে
বিপুল বিরাট জ্যোতির্ধনুক উঠেছে আকাশ ভরে।
সেই ধনুকের আমি যেন তীর, ধনুকের ছিলা ধরে
শয়তান যেন টানিতেছে মোরে আঁধারের গহ্বরে।
পরম প্রবল আল্লার তেজ কোথা হতে যেন এল,
বহিতে লাগিল প্রলয়ঙ্কর ঝড় যেন এলোমেলো!
জন্মক্ষণের সাথী ঝড় এল বিষাণের আহ্বান,
'আল্লাহু আকবর' বলি আমি ধনুকে মারিনু টান।
শয়তান শিরে মারিলাম লাথি, ছুঁড়িলাম আমি তীর;
সেই তীর যেন স্পর্শ করিল মোর আল্লার নীড়!

চেয়ে দেখি একি পরম বিলাস! এ যে আল্লাহ মোর;
কোথা শয়তান? এ যে আনন্দ-রস-মধু-ঘনঘোর!

অপ্রাকৃত সে মাধুরী তাহার, ভাষায় বলা না যায় ;
সেই জানে যারে জানান, যে এক কণা সে-অমৃত পায়।

আমি আল্লার সৈনিক, মোর কোনো বাধা-ভয় নাই,
তাঁহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে যাই।
তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া,
'জেহাদ', 'জেহাদ', 'বিপ্লব', 'বিদ্রোহ' মোর গান গাওয়া !
পুরাতন আর জীর্ণ সংস্কারের আবর্জনা
দগ্ধ করিয়া চলি আমি উন্মাদ চির-উন্মনা।
কোনো আসমান কোনো গ্রহ-তারা কোনো আবরণ মোরে
কোনো শৃঙ্খল কোনো কারাগার রাখিতে নারিব ধরে।
পরম নিত্য পরম পূর্ণ টানে মোরে নিশিদিন,
আমি তাই অপরাজেয় সর্বভয়-ও-মৃত্যুহীন !

দৈনিক 'নবযুগ'
৯ই মার্চ ১৯৪২

৯০

দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়

দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী, দরিদ্র মোর ভাই ;
আমি যেন মোর জীবনে নিত্য কাঙালের প্রেম পাই !
তাহাদের সাথে কাঁদিব, তাদেরে বাঁধিব বক্ষে মম ;
দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, দরিদ্র প্রিয়তম !

যত দিন মোর লেখার শক্তি রবে,
যত দিন আমি বেঁচে রবো এই ভবে,
উহাদেরই কথা লিখিয়া যাইব, কহিব ওদেরি কথা,
পুত্রশোকের মতন জাগিবে বক্ষে ওদেরি ব্যথা।
মোর আল্লার হুকুম পেয়েছে এ হুকুম-বর্দার,
উহাদেরি তরে যুদ্ধ করিব হাতে লয়ে তলোয়ার।
উহাদেরি তরে নিবেদিত মোর এই তনু-মন-প্রাণ,
ওদেরে সঙ্গী করিয়া করিব নবযুগ-অভিযান।
বাঁচি যদি আমি এই দুনিয়ায় বাঁচিব ওদেরে লয়ে,
উহাদের তরে প্রাণ দিব আমি সকল দুঃখ সয়ে।

ওদের দুঃখ, মোর প্রিয়তম আল্লার বেদনা যে ;
ওরা দুখ পায়, আল্লার কাছে মুখ দেখাই না লাজে।
গরিবের সাথে উপবাসী রবো, উহাদের ভাঙা ঘরে
মোর প্রাণ যেন শক্তি ও আশ্বাস দিয়া সঞ্চরে।

আমরা গরিব মোরা শতকরা নিরানব্বইজন,
আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইব করিয়া পরান–পণ।
লোভী রাক্ষস ভোগীদের সংহার করি পৃথিবীতে
পূর্ণ সাম্য আনিব, দানিব অমৃত বঞ্চিতে।
ধরার সকল মানুষ দুবেলা অন্ন পাইবে পাতে,
নগ্ন শরীরে বস্ত্র পাইবে, অস্ত্র পাইবে হাতে।
বিনা ঔষধে পথ্য না পেয়ে ছেলেমেয়ে মরিবে না,
শিক্ষা পাইবে, দীক্ষা পাইবে, দাসত্ব করিবে না।
বৃষ্টির জল ঝরিবে না ঘরে ফুটো খড়ো চাল বেয়ে,
সন্তোষ লাভ করিবে সকলে সমান অংশ পেয়ে।
ইহাদের মাঝে বনের সিংহ, ব্যাঘ্র ও অজগর
ঘুমাইয়া আছে ; জাগাব ওদেরে জ্বালায়ে ওদের ঘর।
দেখাইয়া দিব, চিনাইয়া দিব সব লোভী রাক্ষসে,
বেপরোয়া মার মারিতে বলিব, যাহারা রক্ত শোষে।
তাদের জীবন–রস নিঙাড়িয়া বহাবে বিপুল নদী,
ছারখার হবে জ্বলিয়া তাদের তৈরি তখ্‌ত গদি।
ধনিকের ঘরে বন্দি রয়েছে আল্লার দেওয়া দান,
লুটিয়া লইবে সকল মানুষ, বাঁচিবে ক্ষুধিত প্রাণ।
আল্লা সেদিন সকলের হবে, সবাই করুণা পাবে ;
এই ধনিকের মানিকের আলো সকলের ঘরে যাবে।

গরিবের তরে মরিতে এসেছি, মরিব ওদের সাথে ;
মরিবার আগে মারিয়া যাইব প্রাণ ভরে দুই হাতে।
উহাদের দাবি ওদের প্রাপ্য আদায় করিয়া যাব,
মৃত্যুর দস্ত্‌ মোবারক ধরে আল্লার দেখা পাব।
এই মোর সাধ, সাধনা আমার, প্রার্থনা নিশিদিন,
মানুষ রবে না অন্নবস্ত্রহীন আর পরাধীন।

আল্লা আমার সহায়—আল্লা পুরাবেন মোর আশ ;
গরিব ভাইরা, ভয় নাই, আসে আল্লার আশ্বাস।

আসে আল্লার কাবার শিরনি, ক্ষুধার খোরাক আসে,—
রোজা শেষ হবে, দেখিব ঈদের চাঁদ পুন এ-আকাশে।

দরিদ্র মোর নামাজ ও রোজা, আমার হজ্ জাকাত ;
উহাদেরি বুক কাবা-ঘর : মহা-মিলনের আরফাত্।

৯১
মহাসমর

তৌহিদ আর বহুত্ববাদে বেঁধেছে আজিকে মহা-সমর,
লা-শরিক 'এক' হবে জয়ী...কহিছে 'আল্লাহু-আকবর'।
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারের এ ভেদ-জ্ঞান,
অভেদ 'আহাদ'-মন্ত্রে টুটিবে, সকলে হইবে এক সমান।
এক সূর্যের মাঝে রহে দেখো অনন্ত রঙ—তবু তারা
পরম শুভ্র এক রঙে হয় একাকার, হয় রঙ-হারা।
ক্ষুদ্র মহৎ ছোট বড় জ্ঞান যতদিন রবে এই ধরার,
ততদিন রবে এই হানাহানি, এ মহা-সমর অবিদ্যার।
যতদিন রবে এই অবিদ্যা—ততদিন রবে লোভ-অসুর,
কামনা বাসনা অতৃপ্তি রবে, এ মহা-সমর হবে না দূর।
লোভ-বাসনার অসুরে অসুরে নিত্য হইবে হানাহানি,
কেহ পরাজিত হবে না ইহারা, সন্ধি করিবে—তাঁর বাণী।

সারা ভুবনের সকল অসুরে করিয়া দিব্য জ্যোতির্ময়
পরম শান্তি আনিবেন যিনি, হতেছে তাঁহার অভ্যুদয় !
এই অজ্ঞান-রাতের আঁধারে হানাহানি আজ করে যারা,
সূর্য উঠিলে চিনিতে পারিবে, জানিতে পারিবে দিনে তারা।
অজ্ঞানবশে লোভে ও মায়ায় পরমাত্মীয়ে হেনেছে মার,
যে হাতে মেরেছে, সেই হাত দিয়ে ধরিবে আহত চরণে তার !

সকল রঙের খেলার উর্ধ্বে পরম-জ্যোতি আল্লারে
দেখেনি যে জন, বুঝিবে না এই আল্লার খেলা সংসারে।
তিনি আদি কবি, সৃষ্টি জুড়িয়া কবিতা লেখেন দিবস-রাত,
লিখিতে লিখিতে হন আন্‌মনা, সৃষ্টিতে হয় ছন্দ-পাত।
এই অসুরের দল দেখো যত, ছন্দ-পতন সংসারের,
সুন্দর এই সৃষ্টিতে তাঁর এরাই দৈত্য এরা কাফের।

ছন্দ-পতন হয় যে কাব্যে—কবিরা যেমন নির্বিকার
সে পঙ্‌ক্তি কেটে অন্য পঙ্‌ক্তি আনন্দে মাতি লেখে আবার ;
তেমনি পরম আদি কবি তিনি—নিরাসক্ত ও 'আল্-আহাদ'
'মনসুখ' করি দেন অসুরেরে, আনেন জগতে সাম্যবাদ !
সুন্দর হয় সৃষ্টি তখন 'পরমাশ্রী'তে পূর্ণ হয়,
কে বুঝিবে সেই 'আহাদে'র খেলা, যে চির পরম অমৃতময়।

যুগে যুগে হয় সৃষ্টিতে তাঁর ছন্দ-পতন, তিনি আবার
সৃষ্টি ভরিয়া স্বচ্ছন্দতা আনেন ; তারেই বলি বিচার।
এই 'তৌহিদ'—একত্ববাদ বারেবারে ভুলে এই মানব
হানাহানি করে, ইহারাই হয় পাতাল-তলের ঘোর দানব।

ইহারাই 'জ্বিন্', এরাই অসুর এরাই শত্রু জান্নাতের,
যুগে যুগে আসি পয়গম্বর সংহার করে এই কাফের।
সারা বিশ্বের সম্পদ্ ঐশ্বর্য লুটিয়া এই অসুর
নির্মাণ করে স্বর্ণ-লঙ্কা, ঘৃণ্য লোকের পাতালপুর।
এদেরই সংস্কারের লাগিয়া ঐশী শক্তি আসে নেমে,
কখনো করেন সংহার তিনি, কখনো গলান মহা-প্রেমে।
আগেও এসেছে, আজিও আসিবে তাঁরই ইচ্ছায় 'মুজাদ্দাদ'
সংহার করি এই ভেদ-জ্ঞানে—শেখাবেন তিনি এক 'আহাদ' !
কার মাঝে তাঁর সেই চিন্ময় শক্তির হবে মহাপ্রকাশ,
কে বলিবে, ভাই ? সূর্য কখন উঠিবে জানে সে মহা-আকাশ।

এই জানিয়াছি, এই দেখিয়াছি, এই শুনিতেছি রাত্রিদিন—
আসিছেন তিনি তৌহিদের মহা-জ্যোতি লয়ে 'আল্-আমিন'।
পীড়িত মানব-আত্মা এমনি মুনাজাত করি তাঁর কাছে—
তাঁর শক্তিতে শক্তিমানেরে চিরদিন দুনিয়ায় যাচে !

বিশ্বাস করো অবিশ্বাসীরা, রহমত তাঁর আসিছে ঐ—
ভয় করিবে না মানুষ কারেও, অদ্বৈত সে আল্লা বৈ।
তাঁরই শক্তিতে শক্তি লভিয়া, হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাধীন
মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, হইবে আজাদ, চির-স্বাধীন !
অসুরে অসুরে বাধায়ে সমর ঊর্ধ্বে আল্লা নির্বিকার
দেখিছেন খেলা ;—তিমির-অন্ধ ! দেখ্ রে তাঁহার দেখ্ বিচার !
আপনাআপনি হানাহানি করি মরিবে অসুর সৈন্যদল,
বাঁচিয়া যাহারা রহিবে, দেখিবে—বিষ-বৃক্ষে কি ফলেছে ফল।

তখন তাহারা চাহিবে শান্তি—অসুর-শক্তি চাবে না আর,
চাহিবে দিব্য শক্তি তাঁহার—পরমাশ্রয় যাচিবে তাঁর !
সেইদিন এই মহা-সমরের অবসান হবে, শোন্ মানব,
সেইদিন এই ধূলির ধরায় আসিবে পরম মহোৎসব !

'সওগাত'
যুদ্ধ-সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

৯২

শ্রমিক মজুর

ভদ্র সমাজে শ্রমিকের কথা 'কমিক' গানের মতো,
ভব্যের মতো মোরা নহি নাকি সু-সভ্য সংযত।
আচারে পোষাকে আমাদের নাই ভদ্রের মতো চাল,
চালচুলা নাই, দারিদ্র্যে দুখে নাচার ও নাজেহাল।
আমাদের বাসা আমাদের ভাষা নিত্য নোংরা, দাদা !
তবুও বলিব, বাহিরে আমরা নোংরা, ভিতরে সাদা।
ভিতরের কালি ঢাকিতে তোমরা পরো হ্যাট, প্যান্ট, কোট
শ্রমিকেরে যারা গরু বলে, মোরা তাদের বলি, 'হি-গোট' !
মজুরের ভাষা বিঁধিবে অঙ্গে খেজুর-কাঁটার মতো,
গলা কেটে রস খাও, হবে নাকো অঙ্গ কাঁটায় ক্ষত ?
যে বাড়িতে থাকো, তার প্রতি ইটে রক্ত মাখানো কার ?
হৃদয় থাকিলে, দেখে বেদনায় কাঁপিয়া উঠিত হাড় !
মজুর তোমার মজুরি করিয়া নজ্‌রানা কত পায় ?
চক্ষে তোমার লজ্জা থাকিলে মরে যেতে লজ্জায় !
শ্রমিকের সেবা আছে তোমাদের অণু-পরমাণু ঘিরে,
ফসল না যদি ফলাতাম, খেতে টাকা গিলে, নোট ছিঁড়ে ?
যদি কাপড় না পরায়ে তোমারে করিতাম মোরা বাবু,
'পাঁচ-আইনে' পড়ে পুলিশের হাতে হতে নাকি তুমি কাবু ?
তোমারে কাপড় পরায়ে হয়েছি মোরা ন্যাংটেশ্বর ;
মোরা নিরন্ন, বিবস্ত্র, দিয়ে তোমারে ভাত কাপড় !
তোমাদের হাতে শোভা পায় ছাতা ছড়ি আর হাত-ঘড়ি,
অভাবে ঋণের দায়ে আমাদের হাতে পড়ে হাত-কড়ি !
তোমাদের ঘরে থালা বাটি, মোরা পাই না কলার পাতা,
নুন নাই ঘরে, উনুন ধরে না, চালে ঘুণ-ধরা বাতা !
চরণ-কমল কোমল রেখেছে মোদের হাতের জুতা,
আমাদের পদ কাদা-গদ্‌গদ, খায় কাঁকরের গুঁতা।

তোমাদের খাটে মশারি, মাথায় বালিশে কাপাস তুলো,
রাতে আমাদের সাথী ছারপোকা, মশা আর আরশুলো।
রাজ-মিস্ত্রিরা রাজ-বাড়ি গড়ে, তোমরা সেখানে রাজা ;
আমাদের চালে খড় নাই, এ কি পারিশ্রমিক সাজা?
আমরা রাজার অস্ত্র গড়িয়া নিরস্ত্র নির্জীব,
উহারা হয়েছে সৈনিক আর আমরা হয়েছি ক্লীব।
লাখ টাকায় এক পাই দান করে ধনীরা হয়েছি দানী,
পিঁপড়েরে দেয় চিনি খেতে আর ক্ষুধিতেরে খেতে পানি !
রচিয়া ধর্মশালা অধর্মী ধর্মেরে দেয় গালি,
রাম নাম ওরা শেখায় মাখায়ে মানুষেরে চুন কালি !
আমরাই গড়ি হাতুড়ি, শাবল, বন্দুক, তলোয়ার ;
আপনার পানে চেয়ে দেখি আজ হাতে নাই হাতিয়ার !
যে হস্ত দিয়া হাতিয়ার গড়ি সে হাত এখনো আছে,
কোথা হতে এই অপমান, এই ভয় এল তবে কাছে?
যাহাদের হাতিয়ার গড়ি মোরা তাহাদেরি লাথি খাই,
মোদের রক্ত প্রাণ দান করি—আমাদেরই নাম নাই !
কেন রহি মোরা বস্তিতে অস্বস্তিতে চিরদিন?
কেন এ অভাব, রোগ, দারিদ্র্য, চিত্ত গ্লানি-মলিন?
শিক্ষা পাই না, দীক্ষা পাই না, ক্ষুদ্র কি তাই বলে?
মোদের মাঝেও সকলের মতো আত্মার জ্যোতি জ্বলে।

নহে আল্লার বিচার এ ভাই, মানুষের অবিচারে
আমাদের এই লাঞ্ছনা, আছি বঞ্চিত অধিকারে।
আমরা মূর্খ বলিয়া বুদ্ধিমান করে প্রতারণা ;
দেখেছি নিজের শক্তিকে, আর লাঞ্ছনা সহিব না !
যে হাত হাতুড়ি দিয়া গড়িয়াছি প্রাসাদ হর্মরাজি,
সেই হাত দিয়া বিলাস-কুঞ্জ ধ্বংস করিব আজি।
দেয় নাই ওরা পারিশ্রমিক মজুরের শ্রমিকের—
যা দিয়েছে, তাহে মেটেনি মোদের ক্ষুধা তৃষা ক্ষণিকের !
মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর ;
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর !

দৈনিক 'নবযুগ'
২৬শে নভেম্বর ১৯৪১

৯৩
প্রেম ও প্রহার

'প্রেম' ও 'প্রহার' এই দু'টি মোর নীতি !
এই দু'টি মোর আল্লার দান, গাহি ইহাদেরই গীতি।
যারা নিপীড়িত যারা নির্জিত দুনিয়ায় নিশিদিন,
তাহাদেরি তরে পথে পথে আমি বাজাই প্রেমের বীণ।
উহাদের লাগি নিতি ভিখ্ মাগি দুয়ারে দুয়ারে আমি,
ওদেরি মুক্তি চাহিয়া শক্তি যাচিতেছি দিবাযামী।
প্রাণ যার আছে তারি কাছে চাই উহাদের তরে প্রাণ,
যারা যত পারে উহাদের তরে করুক আত্মদান।
যুক্তিতে ঐ মুক্তি আসে না, তাই প্রেম দিয়ে ডাকি,
রস-সুন্দর রথ ত্যাগ করে চলি পথ-ধূলি মাখি।
আত্মারে যারা বন্দি রেখেছে না করে আত্মদান,
যাহাদের ভোগ-বাসনা এনেছে অশেষ অকল্যাণ,
ভিক্ষা চহিলে ভিক্ষা দেয় না সর্বহারার তরে,
জনগণে রাখি উপবাসী ঘরে ধন সঞ্চিত করে,
ধর্ম যাদের শুধু বঞ্চনা আর বঞ্চিত করা,
মর্মে বেদনা নাই, শুধু যারা চর্ম-মাংসে ভরা,
তাদের প্রাপ্য প্রেম নয়, ওরা গলিবে না কভু প্রেমে,
প্রহার পাইলে উহাদের প্রেম গলিয়া আসিবে নেমে !
প্রেম ও জ্ঞানের কেন্দ্র দেখিবে দিব্য খুলিয়া যাবে,
যেদিন তাহারা আষ্টেপৃষ্ঠে নিদারুণ মার খাবে !
বহু তপস্যা করিয়া জেনেছি ভাই,
প্রেম জাগাইতে প্রহারের মতো অমোঘ ওষুধ নাই !
বনের সিংহ বাঘ পোষ মানে, প্রেম-ভরে চাটে পা,
যদি অকরুণ প্রহারের চোটে হাড়ে হাড়ে ফোটে ঘা !
মানব দানব মদ-গর্বীরা সকলেই হয় বশ,
বক্ষে বসিয়া টুঁটি টিপে যদি খাওয়াও প্রহার-রস !
তাই প্রহারের সেনাদল চাই শৌর্য-দীপ্ত প্রাণ,
জরা ও মরায় তরায় যাহারা নিত্য-নৌজোয়ান।
পুরুষের বেশ, পৌরুষ নাই—দেখিবে ভারত-ভরা
ক্লৈব্য-ক্লিষ্ট, ভব্য আচার, সভ্য পোষাক পরা !
যুদ্ধের নামে নিশ্বাস হয় রুদ্ধ, হাত-পা ভয়ে
উদার উদরে প্রবেশিতে চায় যেন আড়ষ্ট হয়ে !

ভুয়ো তর্কের তুর্কি-নাচন সহসা থামিয়া যায়,
বুদ্ধি পলায় কুর্দিস্থানে আশ্রয় খুঁজি, হায় !
বস্তা-বোঝাই-প্রস্তাব ভোট পথে যায় গড়াগড়ি,
জাতিভেদ ভুলে কাঁদে সবে করে রেল-রথে জড়াজড়ি।
হাসি পেট ভরে, রাশি রাশি এই বাসি-মড়াদের দেখে,
আগুন জ্বলিবে ইহাদেরই দেহে প্রেমের তৈল মেখে !
অন্তরে যার নিত্যোৎসবে যৌবন ফাগুনের,
তাহারাই সেনা, তাহারাই চেনা, আত্মীয় আগুনের।
আগুনোৎসবে মাতিতে পারে যে, ফাগুনোৎসবে সেই
রণ-উন্মাদ যৌবন-বন-বিহারী ! মৃত্যু নেই
কোনো কালে তার ! সেই ফিরে ফিরে আসে
এই পৃথিবীর যৌবন-বনে, উদ্দাম-রণ-রাসে !
ইহাদেরই রণ-নৃত্যের তালে পদতলে হয় গুঁড়া
ভোগ-বিলাসীর তখ্ত ও তাজ, লীলা-প্রাসাদের চূড়া !
ইহারাই প্রেমলোক হতে আসে প্রহার-অস্ত্র হাতে,
ইহারাই আনে বিজয়োল্লাস ধরণীর আঙিনাতে !
এরা দুর্জয়, এরা নির্ভয়, এরা আল্লার সেনা,
এরাই ফোটায় নিরাশার বনে আশার হাস্নাহেনা !
অসুন্দরের সংহার করে সুন্দর করে ধরা,
ইহাদেরই তেজে অসি বশীভূতা, সাথী ও স্বয়ম্বরা।
এরা ঘনঘোর নিশীথ প্রহরী প্রবল প্রহার হাতে
দুর্বল মানুষের বল হয়ে লড়ে অমানুষ-সাথে !
সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আজ এরা এসেছে রঙ্গ-নটে,
আঁকিবে নতুন ছবি এরা পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে !
যারা দুর্বল, যারা অসহায়, এরা তাহাদেরি প্রেমে
পেয়ে আল্লার সহায়-শক্তি ধরায় এসেছে নেমে।
বলহীনে এরা রক্ষা করিবে, বলীরে দানিবে বলি,
এক হাতে ভীম প্রহরণ, আর হাতে প্রেম-অঞ্জলি
লয়ে এরা জনগণের আলয়ে এসেছে চৌকিদার,
যার যা প্রাপ্য পাইবে এবার, প্রেম অথবা প্রহার !
প্রেম ও প্রহার—চমৎকার কি নয় আমার এ নীতি ?
প্রহারে করিব সংহার, প্রেমে ঘুচাব সর্বভীতি।

'নবযুগ'

৯৪

মহাত্মা মোহসিন

সালাম লহ, হে মহাত্মা মোহ্‌সিন!
ইতিহাসে নয়, মানব-হৃদয়ে তব নাম চিরদিন
প্রেমাশ্রুজলে লেখা রবে প্রিয় আত্মীয় স্মৃতি-সম,
মানবাত্মার নিত্য বন্ধু, মহাত্মা নিরুপম!

সারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ধরায় মানব-জন্ম লয়ে
মানুষ যাহারা হলো না, বেড়ায় ভোগৈশ্বর্য বয়ে,
যাহারা রক্ত-মাংস মেদ ও মজ্জা বৃদ্ধি করে
পেল না শান্তি রস আনন্দ, পশু-সম গেল মরে,
সুন্দর সেই স্রষ্টার যারা ইঙ্গিত বুঝিল না,
বণিক-বুদ্ধি আত্মার বিনিময়ে নিল রূপা সোনা,
রূপ-ভোগী নর প্রেম চাহিল না, যে প্রেম রূপের প্রাণ,
আত্মা মলিন হয়ে গেল শোকে না পেয়ে আত্মদান।
মেঘবারি, নদীজল থাকিতেও, কাদা-জল যারা খায়,
মদপায়ী হয়, মৌচাকে রত মধু থাকিতেও, হায়!
পথভ্রষ্ট সেই মানুষের তুমি পথ দেখাইলে,
রাজৈশ্বর্য বিলায়ে, ভিক্ষু, ভিক্ষা-পাত্র নিলে!
ভিক্ষা-পাত্র প্রেম-অমৃত পূর্ণ করিয়া তুমি
সিক্ত করিলে আত্মার কা'বা, দারিদ্র-মরুভূমি।

কোন্ আনন্দ-প্রেয়সীরে পেয়ে, হে চির-ব্রহ্মচারী!
মিটিল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন্ রস-বারি?
মুহম্মদের তত্ত্ব তুমিই শিখালে ভারতে আসি,
ষড়ৈশ্বর্য পেয়ে মুসলিম বৈরাগী সন্ন্যাসী।

অর্থ তখনি বাধা হয় শুভ পরমার্থের পথে,
সে অর্থ যদি বঞ্চিত হয় পরার্থে ব্যয় হতে।
তখনি অর্থ আনে অনর্থ সুন্দর পৃথিবীতে,
তখনি অসুর দানব-জন্ম লভে মানবের চিতে।
স্বর্ণ হীরক মানিক মুক্তা তখনি মুক্তি পায়
মানুষের লোভ-বাসনা যখন তাদের নাহি জড়ায়।
অলঙ্কারীর প্রাসাদে তখনি প্রবেশ করে প্রলয়।

রৌপ্য স্বর্ণ, কণ্ঠ বাহু ও চরণ জড়ায়ে কহে—
'কাঁদিতে আসি গো, বাঁধিতে আসা তো মোদের ধর্ম নহে ;
মোরা পৃথিবীর জমাট রক্ত, মোরা বিধাতার দান ;
মোদেরে গলায়ে বিলাইয়া দাও, মুমূর্ষু পাবে প্রাণ।'
হে দ্রষ্টা, তুমি অচেতন জড় ঐশ্বর্যের বুকে
দেখেছিলে কোন্ চৈতন্যের জ্যোতি যেন মহা দুখে
লোভীর পরশে গভীর বিষাদে পাষাণ হইয়া আছে ;
মুক্তি তাদের দিলে দান করি ক্ষুধিত জনের কাছে !

দশ লাখ টাকা থেকে দশ টাকা দিয়ে দাতা হয় যারা,
কারে বলে দান, তব দান দেখি শিখে যায় যেন তারা।
যারা দান করে, আপনারে তারা নিঃশেষে দিয়ে যায় ;
মেঘ ঝরে যায়, ভাবে না তাহার বিনিময়ে সে কি পায়।
প্রদীপ নিজেরে তিলে তিলে দাহ করে দেয় নিজ প্রাণ,
প্রদীপই জানে, কি আনন্দ দেয় তারে এই মহাদান।
যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়,
বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয়।
তুমি আল্লার সৃষ্টিরে দিয়ে আল্লার নিয়ামত
তাহার দানের সম্মান রাখিয়াছ, ওগো হজরত !

পরমার্থের মধু-মাখা তব অর্থ যাহারা পায়,
জিজ্ঞাসা করি, তারা কি তোমার মতো প্রেমে গলে যায় ?
ব্যর্থ হয়নি তব দান জানি, তোমার প্রেমের ঢেউ
এনেছে শক্তি-বন্যা বঙ্গে হয়তো, জানে না কেউ।
যারা জাগ্রত-আত্মা, তারাই করে যে আত্মদান,
তাহাতেই এই পৃথিবী পেয়েছে স্বর্গের সম্মান।
সৃষ্টির যারা সখা তাহারাই রাখে স্রষ্টার নাম,
সেই মহাত্মা তুমি মোহ্‌সিন, লহ আমার সালাম !

৯৫
রবি-হারা

দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত-পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে
উদাস গগন-তলে,

বিশ্বের রবি, ভারতের কবি,
শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি
তুমি চলে যাবে বলে !

তব ধরিত্রী মাতার রোদন তুমি শুনেছিলে নাকি,
তাই কি রোগের ছলনা করিয়া মেলিলে না আর আঁখি ?
আজ বাংলার নাড়িতে নাড়িতে বেদনা উঠেছে জাগি ;
কাঁদিছে সাগর নদী অরণ্য, হে কবি, তোমার লাগি।

তব রসায়িত রসনায় ছিল নিত্য যে বেদ-বতী,
তোমার লেখনী ধরিয়াছিলেন যে মহা-সরস্বতী,
তোমার ধ্যানের আসনে ছিলেন যে শিব-সুন্দর,
তোমার হৃদয়-কুঞ্জে খেলিত যে মদন-মনোহর,
যেই আনন্দময়ী তব সাথে নিত্য কহিত কথা,
তাহাদের কেহ বুঝিল না এই বঞ্চিতদের ব্যথা ?
কেমন করিয়া দিয়া কেড়ে নিল তাঁদের কৃপার দান,
তুমি যে ছিলে এ বাংলার আশা-প্রদীপ অনির্বাণ !
তোমার গরবে গরব করেছি, ধরারে ভেবেছি সরা ;
ভুলিয়া গিয়াছি ক্লৈব্য দীনতা উপবাস ক্ষুধা জরা।
মাথার উপরে নিত্য জ্বলিতে তুমি সূর্যের মতো,
তোমারি গরবে ভাবিতে পারিনি : আমরা ভাগ্যহত।

এত ভালোবাসিতে যে তুমি এ ভারতে ও বাংলায়,
কোন্ অভিমানে তাঁদের আঁধারে ফেলে রেখে গেলে, হায় !
বলদর্পীর মাথার উপরে চরণ রাখিয়া আর
রক্ষা করিবে কে এই দুর্বলের সে অহঙ্কার ?
হেরো, অরণ্য-কুন্তল এলাইয়া বাংলা যে কাঁদে,
কৃষ্ণা-তিথির অঞ্চলে মুখ লুকায়েছে আজ চাঁদে !
শ্রাবণ মেঘের আড়াল টানিয়া গগনে কাঁদিছে রবি,
ঘরে ঘরে কাঁদে নরনারী, 'ফিরে এস আমাদের কবি !'
ভারত-ভাগ্য জ্বলিছে শ্মশানে, তব দেহ নয়, হায় !
আজ বাংলার লক্ষ্মীশ্রীর সিঁদুর মুছিয়া যায় !
আজ প্রাচ্যের কাব্যছন্দ সুরের সরস্বতী
তোমার শ্মশান-শিখায় দগ্ধ করিল চাঁদের জ্যোতি !

এত আত্মীয় ছিলে তুমি বুঝি আগে বুঝে নাই কেহ ;
পথে পথে আজ লুটাইছে কোটি অশ্রু-সিক্ত দেহ।

যেই রসলোক হতে এসেছিলে খেলিতে এ পৃথিবীতে,
সেথা গিয়া তুমি মোদেরে স্মরিয়া কাঁদিবে না কি নিভৃতে?
তোমার বাণীর সুরের অধিক প্রিয়তম ছিলে তুমি,
বাংলার শ্রীর চেয়ে ভালোবেসেছিলে এ বঙ্গভূমি।
আশ্বাস দাও, হে পরম প্রিয় কবি, আমাদের প্রাণে,
ফিরিয়া আসিবে নব রূপ লয়ে আবার মোদের টানে।
এত রস পেয়ে নীরস শীর্ণ ক্ষুধিত মানুষ তরে
কেন কেঁদেছিলে, কেন কাঁদাইলে আজীবন প্রেম ভরে।

শুনেছি, সূর্য নিভে গেলে হয় সৌরলোকের লয় ;
বাংলার রবি নিভে গেল আজ, আর কাহারও নয়।
বাঙালি ছাড়া কি হারালো বাঙালি কেহ বুঝিবে না আর,
বাংলা ছাড়া এ পৃথিবীতে এত উঠিবে না হাহাকার।
মোদের আশার রবি চলে গেলে নিরাশা-আঁধারে ফেলে,
বাংলার বুকে নিত্য তোমার শ্মশানের চিতা জ্বেলে !
ভূ-ভারত জুড়ে হিংসা করেছে এই বাংলার তরে—
আকাশের রবি কেমনে আসিল বাংলার কুঁড়েঘরে !
এত বড়, এত মহৎ বিশ্ববিজয়ী মহামানব
বাংলার দীন হীন আঙিনায় এত পরমোৎসব
স্বপ্নেও আর পাইব কি মোরা? তাই আজি অসহায়
বাংলার নর-নারী, কবি-গুরু, সান্ত্বনা নাহি পায়।

আমরা তোমারে ভেবেছি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ,
সে-আশিস যেন লয় নাহি করে মৃত্যুর অবসাদ।
বিদায়ের বেলা চুম্বন লয়ে যাও তব শ্রীচরণে,
যে লোকেই থাকো হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে ! *

'সওগাত'
ভাদ্র ১৩৪৮

[* কলিকাতা রেডিও-যোগে প্রচারিত।]

৯৬

আগুনের ফুল্‌কি ছুটে

আগুনের ফুল্‌কি ছুটে ফুল্‌কি ছুটে !
ফাগুনের ফুল্ কি ফুটে নবযুগ-পত্রপুটে

ফাগুনের ফুল কি ফুটে
আগুনের ফুল্‌কি ছুটে, ফুল্‌কি ছুটে !
উল্কার উল্‌কি-লেখায়
নিশীথে পথ কে দেখায় ?
আকাশে হজ্‌রত্‌ আলির
আগ্নেয় 'দুল্‌দুল্‌' কি ছুটে ?
আগুনের ফুল্‌কি ছুটে ফুল্‌কি ছুটে !

ছোট আজ ফুল্‌কি যারা
না-দেখা অগ্নি-গিরির ভাই তাহারাই, ভগ্নি তারা !
আকাশের মানিক মোতি জ্যোতির্ধারা,
আমাদের আশার প্রদীপ, নয়ন-তারা,
পাথরের ঘুম-ভাঙানো প্রাণ-ফোয়ারা
ফুটিয়া ঐ এল রে ! ছুটিয়া ঐ এল রে !
চবুতরার কবুতর আকাশের পথ পেল রে !
আসে কার পাল্‌কি ছুটে ?
কে আসে উড়িয়ে ধূলি বাংলার শ্যাম্‌লা মাঠে
সওয়ার হয়ে আরবি উটে ?
আগুনের ফুল্‌কি ছুটে ফুল্‌কি ছুটে !

রাত্রির ঘুম ভাঙিয়ে যাত্রীদের দেয় জাগিয়ে,
ঘুমাতে পায় না বলে বুড়ারা রক্ত-আঁখি,
তবু গায় নিদ্রা ভাঙায় ভোরের পাখি, সুরের সাকি !
ইহারাই ছড়িয়ে পড়ে জীবনের খই ফুটিয়ে,
ইহারাই ফুলের কুঁড়ি আছে সব দল গুটিয়ে !

ইহারাই টস্‌টসে-রস মৌটুসি কি ?
এরা কি উদয়-তারার ঝিকিমিকি ?
এদেরি গলার সুরে গান গেয়ে বুল্‌বুল্‌ কি উঠে ?
আগুনের ফুল্‌কি ছুটে ফুল্‌কি ছুটে !

খুশির খোশরোজে রোজ খুন্‌সুড়ি কি করে এরাই ?
চঞ্চল চুম্‌কুড়ি দেয় ফুল্‌কুঁড়িকে ধরে এরাই ?
বিকেলের ঝিঙির মাচায় ফিঙের সাথে
দেখেছি নাচতে এদের ; শুনেছি গুন্‌গুনাতে
এদের সুরে মৌমাছিকে !

উঁকি দেয় নতুন জীবন এদেরই চোখের চিকে !
এল রে এলোমেলো পাগ্‌লা হাওয়া,
এল রে কেয়াপাতার নৌকা বাওয়া।

উড়ুনি উড়িয়ে এল ঘূর্ণি হাওয়া,
এল রে দুরন্ত সব শির্‌নি-খাওয়া !
এল কি চোর-কাঁটা ? না ! আনার-দানা, পাথর-কুচি,
এল রে ফলের আশা, ফুলের গুছি !

কি খুশির খই ফুটাবে কথায় কথায় ?
টাঙাবে দোল্‌না বুঝি ডুমুর গাছে
ঝুম্‌কোলতায়,
এল সব আলোকলতা দুষ্টু মেয়ে
আগুনের দীপ জ্বালিয়ে, ফাগুনের ফাগে নেয়ে !
হাসি আর দৃষ্টি দিয়ে
বিষ্টি ঝরাবে গো,
মিষ্টির বাজার এবার নেবে লুটে !
এল রে চিত্র-পাখা প্রজাপতি চিত্র-কূটে !
আগুনের ফুল্‌কি ছুটে, ফুল্‌কি ছুটে !

'নবযুগ'

৯৭

অপরূপা

দেখিলাম অপরূপা যুবতী নদীর ধারে।
পীনোন্নতা পয়োধরা—
পদ্মের সূত্রও যেতে নারে॥

নীল শাড়ি জড়ায় অঞ্চল
সুখ-সমীরণ হলো চঞ্চল,
মদনোন্মাদিনী—
মদনেও চোখা বাণ হানিতে পারে॥

দীঘল দেহ, বিপুলা নিতম্বিনী,
রূপ যেন দুধে-আলতায়।
সরসীর পদ্মিনী চরণ-পরশ চায়।

মেঘে রোদে খেলাখেলি বৃষ্টি
ডাগর নয়ন, মধু-ঘন দৃষ্টি,
কাফেরের তলোয়ার—
চাও কতল্ করিতে আমারে ॥*

সোমবার
৫ই অক্টোবর ১৯৪২

* ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে কবির রোগের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়। এই কবিতাটি তার প্রায় তিন মাস পরে রচিত; ফলে কবিতাটিতে কিছু অসংলগ্নতার চিহ্ন থাকা স্বাভাবিক। —সম্পাদক।

৯৮

শেষ বাণী

ভালো আমি ছিলাম এবং ভালোই আমি আছি ;
হৃদয়-পদ্মে মধু পেল মনের মৌমাছি।

নজরুলের হিন্দী গান

১

অভি নিশি রহি নজাও ন যাও
দিয়া বুঝনে দো
বুঝতি হুয়ি দিয়া পিয়া বুঝনে দো
মুসাফির ঠাহরো
দিয়া বুঝনে দো।
নিঁদ আলসী আঁখ রুদ্ধ্ হোনে দো
ক্লান্ত করুণ দেহ দূর নৌবৎসে বাজ্‌নে দো বাঁশরী
উদাস যোগিয়ামে।
এয় প্যারে তেরে চরণো পর
গুল্ মৌত চাহে গীর কর্
তেরী হঁসীকো নব্যরুণিমা সে
দিশা রংগায়ে দো
দিয়া বুঝনে দো॥

অভি মিলা বহা হাওয়া মে প্রলাপ
আশা শিখী অভি না কৈলা কলাপ
অভি তাজা রহা হারমে গুলাব
জবাসা দেখ কে যাও
দিয়া বুঝনে দো॥

২

আ' মেরে সঙ্গ আ, মঙ্গল গা হিল্‌মিল্‌কে
এয় বনমালি।
আরমা ফের পুরে হো জায়ে সারে দিল্‌কে
এয় বনমালি॥

মুঝকো জাগানেওয়ালা
হো, জগমে তেরা উজালা

তু মুঝকো ধূল সমঝকে
লে লে চরণ মে আপ্‌নে
তুনে দিয়ে জ্বালায়ে বিরাণ মনজিল্‌ কে
এয় বনমালি॥

তু–হামকো খাক্‌ ছানায়া
(আউর) ব্যাকুল আপনা বনায়া
কহি আউ না কহি জাউ
আপনে আগে তুমকো পাউঁ
খো জাঁয়ে যুঁহি মিট্টি মে হাম মিলকে
এয় বনমালি॥

৩

আও আও সাজনী
মঙ্গল গাও শঙ্খ বাজাও
স্যফল মানো র্‌্যজনী॥

আমার লোক্‌ সে কুসুম গিরাও
তীন্‌ লোক্‌ মে হ্যর্‌্যষ মানাও
হঁসতী আজ ধরণী॥

৪

আ ও জীবন মরণ
সাথী তুমকো ঢুঁটাতা হ্যায় দূর আকাশ মে
মোহনী চাঁদনী রাতি।
ঢুঁঢ়াতা প্রভাত নিত গোধূলি লগন মে
মেঘ হোকে ম্যয় ঢুঁঢ়াতা গগণ মে
ফিরত হুঁ রোকে শাওন পবন মে।
পাত্তে মে ঢুঁঢ়াতা তোড়ী পাপী
শ্যামা হোকে জ্বালা ম্যয় তোমারি আঁখমে
বুঝ গ্যায়া রাতকো হায় নিরাশ মে

আভি ইয়ে জীবন হ্যায় তুমহারি পিয়াস মে
গুল না হো যায়ে নয়ন কি বাতি॥

[হিজ, মার্চ ১৯৩৭। শিল্পী : গিরীণ চক্রবর্তী, এন ৯৮৬৮]

৫

আকুল ব্যাকুল ঢঁরত ফিরুঁ শ্যাম
তুম বিনা রহন না যায়
তুমহারে কারণ সব কুছ ছোড়ি
প্রীতি ছোড়ন না যায়।
কেঁও তরসাও অন্তরযামী
আওয়ো মিলো কৃপা কর স্বামী
নিঁদ নাহি রয় না
দিন নাহি চায় না
বিরহ কি আগ জ্বালায়।

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : কুমারী বেরা সোম ও হেমচন্দ্র সোম। এফ. টি ৪১০৪, সুর : নজরুল]

৬

আগড়ম বাগড়ম খাতির ঝগড়া বগড়া হো দিনবায়ন।
লত্তম জুত্তম চৌকি বেল্‌না দাঁত পিশওওল বয়ন॥

হাম বোলিলা ওয়ে সুন্দর আউরন কি হো জোয়
উ বুলেলা বোতল মোট্‌কা পুরুষ না এয়সা হোয়।
গুজরে হামকা লেডয়ে দে না আপনে লেডয়ে ঠায়ন্॥

জরু বোলে হামকে তু পুরুষ নাহি কাঁচকেলা।
তেরা বড়কা ভাই দেখা হয় জোরুকা দাবেলা
এয়সন্‌কে স্বামী জো কহে তো ঠাগুক পাঁয়ে নয়ন্॥

চোর পুলিশ কা লাগা ডাঁটি খিচ্চম খিচ্চা হোয়
কাফ্রি কাব্‌লি যেয়সে ঝগড়েঁ ওকে হামরে ছোয়
সোক্‌না কা বাস করক্ হেয় ভেইয়া যেয়সে আয়লো গায়েন।

৭

আজ বন–উপবন মে চঞ্চল মেরে মনমে
মোহন মুরলীধারী কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম।
সুনো মোহন নূপুর গুঞ্জত হ্যয়
বাজে মুরলী বোলে রাধা নাম কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥

বোলে বাঁশরী আও শ্যাম–পিয়ারী, ঢুঁড়ত হায় শ্যাম বিহারী,
বনমালা সব চঞ্চল ওড়াওয়ে অঞ্চল
কোয়েল সখি গাওয়ে সাথ গুণধাম কুঞ্জ কুঞ্জ শ্যাম॥

ফুল কলি ভোলে ঘুঁঘট খোলে
পিয়াকে মিলনকি প্রেমকি বোলি বোলে,
পবন পিয়া লেকে সুন্দর সৌরভ
হাঁসত যমুনা সখি দিবস যাম কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥

৮

আজি মধুর গগণ মধুর পবন মধুর ধরতীধাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।
বাজত বনমে মধুর মুরলী বোলাতা রাধা নাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।
আজ থির যমুনা আধীর ভায়ি আয়ে গোকুলকে চাঁদ
অন্ধেরি গ্যয়ি
বোলে কোয়েলিয়া ময়ূর পাপিহা পিয়া পিয়া অবিরাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম
ব্রিজকে কোঁয়ারি বনকে যোগিনী রোতি থী বিরহ মে
আজ লোকে গাগরী ওড়ে নীল শাড়ী
চলে ফের নীর ভরণে
আজ হরিকে সাথ হরিভি আয়ে
. রাঙা আবিরমে গোকুল ছায়ে
বনশী বাজাওয়ে রসিয়া গারে বিভোর ব্রিজধাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।

[হিজ, মার্চ, ১৯৩৭ ; গিরীণ চক্রবর্তী। এন ৯৮৬৮। রেকর্ড/বুলেটিনে 'ব্রিজকে ঘনশ্যাম' রয়েছে—রেকর্ডের বাণী 'ব্রিজমে ঘনশ্যাম'।]

৯

আরে আরে সখি বার বার ছি ছি ঠারত চঞ্চল আঁখিয়া সাঁবলিয়্য।
দুরু দুরু গুরু গুরু কাঁপতে হিয়া উরু
হাথ্‌সে গির যায় কুঙ্কুম–থালিয়া॥
আর না হোরী খেলবো গোরি
আবীর ফাগ দে পানি মে ডারি হ্যা প্যারী—
শ্যাম কি ফাগুয়া লাল কি লাগুয়া
ছি ছি মোরি শরম ধরম সব হারি
মারে ছাতিয়া মে কুঙ্কুম বে-শরম বানিয়া॥

১০

আয় সাত্তার, আয় গফ্‌ফার
ক্যরদে বেড়া পার॥

দ্যরিয়া ফাড় জঙ্গল
ক্যরতে হ্যায় রোজ মঙ্গল
জ্যমিন ও আসমানকে
জ্যর্‌রে জ্যর্‌রেকে আকিদা হ্যায়॥
তু হ্যায় পালন হার
তু হ্যায় করতার—আয় সাত্তার॥

রোজি দেনা কাম হ্যায় তেরা
স্যবসে আলা নাম হ্যায় তেরা
তু রহমান হ্যায়—জি শান হ্যায়
সুলতান হ্যায়—আয় সাত্তার॥

দর্দে দীল্‌ তেরা সিঁউয়া
আহ শুনায়ে কিস্‌কো
মেরা মালিক মেরা খালিক
মেরা মাবুদ হ্যায় তু—আয় সাত্তার আয় গফ্‌ফার॥

১১

উভ্‌রে যৌবনকো ক্যোঁও কর্‌ ছিপাউঁ রে।
প্যারে সাইয়াঁ সে ক্যায়সে বাচাউঁ রে॥

দেখো ছুওত হেয় বালম মোরি ছাতিয়া
হেয় মানত নহি নিরদয় বাতিয়া
মোরি বাইয়াঁ মারোরি মাসকাই আঙ্গিয়া
হুঁ ম্যায় ভোলি ঠাঠালি ম্যায় ক্যা জানু॥

প্রেম বন্ধন মে বাঁদোনা মো কো পিয়া
মন মোহন দেখা করকে বাঁকি আদা
যানতি হুঁ পুরুষ হোতে হ্যায় বেওয়াফা
কাম হোয় ইন্‌কা দিল্‌ লেকে ভুল জানা॥

১২

এয়সন গড়বড় ঝালে ওয়ানা
বাজ রহে জোরু ও শালা
নাহি করত হাম বিয়া আপনা।
ভাগা যা হে হাকুয়া ভাকুয়া
ছুটলি জরু কে অন্‌ঘট্‌ সে
রাম বাচাইলয় ই খট্‌পট্‌ সে॥

১৩

শাদিকে আগে
কালকে হোয়ি বিয়া হামরে
পরশু আয়ি জরুয়া ভাইয়া
রহ যাইবা তু হকুয়া ভকুয়া
মৌজ করব্‌ হাম, মুহ তু তাকওয়া।
ভেজি হেঁয় হামকা সাস আওর শশুরা
বঢ়িয়াঁ বঢ়িয়াঁ সুঘ্‌ঘর্‌ কাপড়া।
হাসি ঠাঠোলি শালি করিহেঁ
রুঠব জব হামরা কে মানাই হেঁ
ঘড়ি ঘড়ি শোস্‌রাল মে যাইব
মৌগী কে শোস্‌রাল সে লাইব

সাসু লিহে মোর বালাইয়া
সালি করি হেঁ খেল খেলাইয়া
ঝাঁকত জব্ তু লোগ কে পাইব
মড়ই মে মৌগীকে ছিপাইব
দেখলে্কো তু লোগ তরসবা
মৌজ করব্ হাম, মুহতু তাকওয়া।।

১৪

কিস্ গাবরুকো সাইয়াঁ বানাউঙ্গি
আপনে দিল্ কি লাগি কো বুঝউঙ্গি।
আই জোওয়ানী হুয়ি দিওয়ানী
উভরে যৌবন সে ভয়ি মস্তানী।
বান নয়নো কে দিল্ পর চালাউঙ্গি।।

দিল্‌কো লুভাকে ছনবল্ দেখাকে
ঘুঘঁট হটাকে মুখড়া দেখাকে
আজ অবরুকে খঞ্জর চালাউঙ্গি।।

১৫

কৃষ্ণ কানাইয়া আয়ো মন্‌মে মোহন মুরলী বাজাও।
কান্তি অনুপম নীল পদ্মসম সুন্দর রূপ দিখাও।
শুনাও সুমধুর নূপুর গুঞ্জন
'রাধা, রাধা' ক্যরি ফ্যির ফ্যির বন্‌বন্
প্রেম-কুঞ্জমে ফুলসেজ্ পর মোহণ রাস্ রচাও
মোহন মুরলী বাজাও।
রাধা নাম লিখে অঙ্গ-অঙ্গমে
বৃন্দাবন মে ফিরো গোপী সঙ্গমে,
পহরো গলে বনফুল কি মালা
প্রেমকা গীত শুনাও,
মোহন মুরলী বাজাও।

১৬

খেলত বায়ু ফুলবন মে, আও প্রাণ-পিয়া।
আও মন মে প্রেম-সাথী আজ রজনী, গাও প্রাণ-পিয়া॥

মন বন মে প্রেম মিলি গাওত হায় ফুলকলি
বোলত হায় পিয়া পিয়া বাজে মুরলিয়া॥

মন্দির মে রাজত হায় পিয়া তব মুরতি।
প্রেম-পূজা লেও পিয়া, আও প্রেম-সাথী॥

চাঁদ হাসে তারা সাথে আও পিয়া প্রেম-রথে
সুন্দর হ্যয় প্রেম-রাতি আও মোহনিয়া
আও প্রাণ-পিয়া॥

১৭

গাও সব ভারত কা প্যারা
ঝাণ্ডা উঁচা র‍্যহে হামারা
হিন্দুস্থানকা তিলক থা বো
মিটগ্যয়ে আব্ মিটগ্যয়ে উয়ো
ভ্যকত্ তুমহি হো দেশ তুমহারা॥

হিন্দু-মুসলমান স্যব মিলি আও
ভুলো ভেদ আর গ্যল ল্যগ যাও
গাও প্রেম নদী কিনারা
ঝাণ্ডা উঁচা র‍্যহে হামারা॥

১৮

গুলশন কো চুম্‌চুম্ কহতী বুলবুল
রুখসারা সে বে-দরদী বোর্‌খা খুল্‌খুল্।
হাঁস্তি হ্যয় বোঁস্তা
মস্ত্ হো যা দোস্তা
শিঁরী শিরাজী সে হো যা বেহোঁশ জাঁ।

সব্ কুছ্ আজ রঙ্গীণ হ্যায় সব কুছ মশগুল
হাঁসতি হ্যায় গুল্ হো কর্ দোজখ্ বিল্‌কুল !
হারে আশেক মাশুক কি চমনোঁ মে ফুলতা নেই
দোবারা ফুল
ফুল, ফুল, ফুল, ফুল ৷৷

১৯

ঘন–শ্যামকে উদাসী হুঁ ম্যয় এ ভব সংসার মে।
প্রীত্‌কে ব্রজবাসী হুঁ ম্যয় রস যমুনাকি কিনারা মে ৷৷

হির্‌দয় মে মোর নন্দনালা
গলেমে উনহি কে নামকি মালা
উয়ো মোর্ সুন্দর্ চাঁদ উজিয়ালা
রাত্‌কে আঁধিয়ার মে ৷৷
ধেনু চরত যাঁহা বেণু বাজত
কৃষ্ণ কানাইয়া সুমরণ আওয়ত
মদন মোহনকে বিছুয়ানা সুনত
পঞ্জিকি ঝন্‌কার মে ৷৷

২০

চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন তুম ব্যনে বনওয়ারী।
ছিন্ লিয়ে হ্যয় গদা–পদম্ সব মিল করকে ব্রজনারী ৷৷

চার ভুজা আব দো বনায়ে
ছোড়কে বৈকুণ্ঠ ব্রিজ্ মে আয়ে
রাস রচায়ে ব্রিজ্‌কে মোহন বান্ গ্যয়ে মুরলী–ধারী ৷৷

সত্যভামাকো ছোড়কে আয়ে,
রাধা প্যারী সাথমে লায়ে
বৈতরণী কো ছোড়কো বান্ গুয়ে যমুনাকে তটচারী ৷৷

২১

চ্যল চ্যল চ্যল
নওজওয়ান চল্।
আদমিয়াত্ কি ফৌজ তুম্
দর‍্যায়া কি হো মৌজ তুম্
কুওত্ কে হো হৌজ্ তুম্
তুম হো শক্‌তি বল—
চ্যল চ্যল চ্যল।
খোলকে রাতকা নকীব
লাও দিন্‌কা আফ্‌তাব্
জমানে কে তুম্ হো খাব
তুম হো ধ্যান আমল্॥

তুম আলীকে জুলফেকার
তুম হো নূর তুম হো নার
জলজলাকে তুম পোকার
জুলম্ কে আজল্।
চল মচাকে শোর
ভোর ভয়ি রে ভোর
উঠ্ খড়ে হো শুন্ আজান
গাফ্‌লিয়ত্ কো ছোড়্।
আরামকা শিশ্ মহল
তোড়্ জওয়ান চল্
চ্যল চ্যল চ্যল॥

২২

চ্যল চ্যল চ্যল
ন্যওয়্যওয়ান চ্যল্।
ফ্যতহেকি হো ফৌজ তুম্
ব্যহর কি হো মৌজ তুম্
ব্যখত্‌কে হো অওয তুম্
তুম্‌সে হ্যায় জোর ব্যল॥

চাক হ্যায় শ্যব কি ন্যকাব
ছোড় দো গ্যফল্যত কি খ্বাব
নিকলা ওহ্ লো আফ্তাব
তুমভি হো গ্যরমে অ্যস্যল
ফ্যায়লন কো বেকরার
সুরতে নূর আওর নার
জ্যল জ্যলা আফজা পুকার
জুলমকি ব্যনফার অ্যম্যল
চ্যল মচাকে শোর
সাফে দুশম্যন কো তোড় ফোড়
উঠ্ খাড়ে হো সুব আঁজা
গ্যফিলিয়ত্ কো ছোড়
হিম্মত না হারনা আযায়ে গ্যর আয্যল॥

২৩

চঞ্চল শ্যামল আয়ে গগনে।
নয়নে পলকে বিজলী ঝলকে
ঘুংগরালী অলকে ওড়ে পবনে॥

রিম্ ঝিম্ বরষা কে বিছুয়া বোলে
মৃদঙ্গ বাজে গুরু গম্ভীর রোলে
দেখি উয়ো কা নৃত্ ধরণী কা চিত্
মোর্ সম নাচত মগন সাওনে॥

অসন্ত পবন মে রহী বহী বাজে
উদাসী বাঁশরী দূর বন মাঝে
আকাশ মে রংগ লাগে, ইন্দ্রধনু জাগে
প্রেম তরংগ বহে বৃন্দাবনে॥

২৪
ভজন

চঞ্চল সুন্দর নন্দকুমার গোপী চিতচোর
প্রেম্ মনোহর নওল কিশোর।
বাজতহি মন্মে বাঁশুরি কি ঝনকার, নন্দকুমার নন্দকুমার নন্দকুমার॥

শ্রবণ–আনন্দ বিছুয়া কি ছন্দ রুণুঝুণু বোলে
নন্দ্‌কে আঙ্‌নামে নন্দন চন্দ্রমা গোপাল
বন্‌ ঝুমত ঝুমত ডোলে
ডগমগ ডোলে, রাঙ্গা পাউ বোলে লঘু হোকে বিরাট
ধরতী কা ভার।
নন্দকুমার নন্দকুমার নন্দকুমার॥

রূপ নেহারনে আয়ে লুক ছিপ্‌ দেওতা
কোই গোপ গোপী বনা কোই বৃকশ্‌ লতা॥
নদী হো বহে লাগে আনন্দকে আঁসু যমুনা জল সুঁ
প্রণতা প্রকৃতি নিরালা সাজায়ে, পূজা করনেকো ফুল লয়ে
আয়ে বন্‌ডোর।
নন্দকুমার নন্দকুমার নন্দকুমার।

২৫

চৌরঙ্গী হ্যায় ইয়ে চৌরঙ্গী
ইস্‌কী দুনিয়া রং বেরংগী॥

গোরে, কালে আঁয়ে, যায়েঁ
আপনি আপনি ছাব দেখলায়েঁ।
এক ডগর্‌ মেঁ সব সংসার
ইসকী দুনিয়া রংগ্‌ বেরংগী
চৌরঙ্গী হ্যায় ইয়ে চৌরঙ্গী॥

কোই কিসিকো রাহ্‌ লাগায়ে
কোই আ–কর খুদ খো–যায়ে
সীধা রাস্তা ফের হাজার
ইস্‌কী দুনিয়া রং বেরংগী॥

২৬

ছোটাসা দেওরা তরহাদার
আয়ে মেয় সদকে জাউঁ।

বাকাঁ ছাবিলা হেয় উয়ো ইয়ার
এয় মেয় সদকে জাউঁ ॥

ভালা নজরকা প্যারে দেওর ভায়
কর্ দে করেজোয়া কে পার
এয় মেয় সদ্‌কে জাউঁ
আজ লুটাউঙ্গি লুট মোরে দেওরা
যৌবন পে আই হেয় বাহার
এয় মেয় সদ্‌কে জাউঁ ॥

সাজিয়া পে আজো মেরে পারে দেওরভায়
তোরে বিনাই বে–করার
এয় মেয় সদ্‌কে জাউঁ ॥

২৭

জগজন মোহন সঙ্কটহারী
কৃষ্ণকুমারী শ্রীকৃষ্ণকুমারী।
রাম রচাও ত শ্যামরিহারী
পরম যোগী প্রভু ভবভয়–হারী ॥

গোপী–জন–রঞ্জন–ব্রজ–ভয়হারী
পুরুষোত্তম প্রভু গোলক–চারী ॥

বন্‌শী বাজাও ত বন–বন–চারী
ত্রিভুবন–পালক ভক্ত–ভিখারী,
রাধাকান্ত হরি শিখি–পাখাধারী
কমলাপতি জয় গোপী–মনহারী ॥

২৮

জপ লে রে মন মেরা প্রভুকে নামকে মালা
সবের সামমে হর এক কামমে জপ লে উও নাম নিরালা ॥

বসন ভূষণ উওহি নাম্‌সে সাজাও
উওহি নাম্‌সে ভুখ তৃষ্ণা মিটাও
উও নাম লেকে ফিরো রোতে রোতে
নাম্‌সে কর হৃদয় উজিয়ালা ॥

উওহি নাম কি নামাবলী গ্রহতারা
রবিশশী ঝুলে গগণ মণ্ডল মে
ছোড় লোভ মোহ ক্রোধ কামকো
জপত রহো সদা মধুর উও নামকো
নামমে রহো সদা মাতোয়ালা ॥

আদর ভাব কর মন উনহিসে
প্রেম-প্রীতি কর উনহিকে চরণ সে
উওহি নাম ধ্যানমে উওহি নাম জ্ঞানমে
উওহি নাম জপত রহো মন প্রাণ মে
উওহি হায় সবকে পালনওয়ালা ॥

[তথ্যের উৎস : আজহার উদ্দীন খানের তালিকা ও এইচ.এম.ভি. কোম্পানির রেজিস্টার। হিজ, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : মড কস্টেলো : এম. ৬৭২৮]

২৯

জপে ত্রিভুবন শ্রীকৃষ্ণকে নাম
পবন জপে শ্রীকৃষ্ণকে নাম শ্রীকৃষ্ণকে নাম
রাধাকৃষ্ণ নাম রাধাকৃষ্ণ নাম রাধাকৃষ্ণ নাম ॥

গগণ হাতমে লিয়ে তারা কি মালা জপে কৃষ্ণনাম
ফুলকলিকে মালা লিয়ে বনবালা জপে কৃষ্ণনাম।
জপত পন্‌ছী সব কোয়েলা পাপীহারা ওহি নাম অবিরাম।
রাধাকৃষ্ণ নাম রাধাকৃষ্ণ নাম রাধাকৃষ্ণ নাম
(ওহি) নাম জপত হ্যায় শাওন ধারা
জপে নদী জল ওহি নাম প্যারা
সাঁঝ সকার কে রং মে উয়ো নামকা ইশারা
উয়ো নাম সুন্দর জপতে দিবস যাম।
রাধাকৃষ্ণ নাম রাধাকৃষ্ণ নাম রাধাকৃষ্ণ নামা ॥

৩০
মার্চ্চ

জলথল টলমল হিলে আস্মান
বীরদল চলে ময়দান॥

হাথপর হাথিয়ার লে কে চলে,
ওতন্ কে লিয়ে জান দে কে চলে,
আগর এক টলে
লাখ্ লাখ্ নিকলে
লিয়ে মওত্ কে দাওত চলে শহীদান॥

চলে তকলুফ্ কে রাহ্ পর্
কোহ্ সাহ্রা পার হো কর
চলে বগয়র দোস্ত সাথী
চলে জঙ্গকে সিপাহিয়াঁ বেখওফ বে–ডর।
ছোড়ি ঘর কি কবর সব বাহর চলে
রণ–ঝনন রণন রণ–ডঙ্কা বোলে।
সব আরাম কি রাগ পে আগ জ্বলে।
সাথ নিশান–বর্দার ঝড় ও তুফান॥

৩১

জয়তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণমুরারী শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ নারায়বণ পরমেশ্বর প্রভু বিশ্ববিহারী॥

সুর নরযোগী ঋষি ওহি নাম গাবে
সন্সার দুখ শোক সব ভুলে যাবে,
ব্রহ্মা–মহেশ্বর আনন্দ্ পাবে গাওত অনন্ত গ্রহ–নভচারী
জন্ম লেকে সব আয়া এ ধরাধাম
রোতে রোতে মায় প্রথম লিয়া উয়ো নাম
জাউঙ্গা ছোড় ম্যয় ইস্ সন্সার কো
শুনকর কানোমে নাম ভয়হারী॥

৩২

জাগো ভারতরাণী ভারত জন্ তুম হে চাহে
গগণ্ মে উঠাতা যো বাণী
সোহি জনগণ গাহে।
রোবাতা ভারতকে নরনারী
বোলাতা জাগ মাই হামারী
দুঃখ-দৈন্য ভারতকো ঘেরি
তুম অব সেবত কাহে।
নীল-সিন্ধু তুম্হা লাগি
গ্যরজত ঘন অনুরাগী
কেঁউ নাহি উঠত জাগি
যব্ ভারত প্রেম গাহে॥

[হিজ, সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। শিল্পী : কুমারী বিজনবালা ঘোষ। এন. ১৭১৯০. সুর : শিল্পী]

৩৩

ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা পে কিশোরী কিশোর,
দেখে দোউ এক এককে মুখকো চন্দ্রমা চকোর
যেয়সে চন্দ্রমা চকোর হোকে প্রেম নেশা বিভোর।
মেঘ মৃদং বাজে ওহি ঝুলনাকে ছন্দ্‌মে
রিমঝিম্ বাদর বরসে আনন্দ্ মে
দেখনে যুগল শ্রীমুখ চন্দকো গগণ ঘেরি
আয়ে ঘনঘটা ঘোর॥

নব নীর বরসনে কো চাতকিনী চায়
ওয়সে গোপী ঘনশ্যাম দেখ তৃষ্ণা মিটায়,
সব দেবদেবী বন্দনা গীত গায়,
ঝরে বরসামে ত্রিভুবন কি প্রেমাশ্রুলোর॥

৩৪

ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক্ ঝোরে, দেখো সখি চম্পা চ্‌কে,
বাদরা গরজে দামিনী দমকে

আও বৃজ কি কোঙারী ওড়ে নীল সাড়ি
নীল কমল–কলিকে পহনে ঝুমকে॥

হায়রে ধান কি লও মে হো বালি,
ওড়নী রাঙাও সতরঙ্গী আলি
ঝুলা ঝুলো ডালি ডালি,
আও প্রেম কোঙারী মন ভাও
প্যারে প্যারে সুরমে শাওনী সুনাও।
রিমঝিম রিমঝিম পড়তে কোয়ারে
সুন্ পিয়া পিয়া কহে মুরলী পুকারে,
ওহি বোলী সে হিরদয় ঘটকে॥

৩৫

তুম্ আনন্দ ঘনশ্যাম
ম্যয় হুঁ প্রেম দিওয়ানী রাধা।
বাঁশরী শুনকে তোরি আয়ি মধুবনমে
না মানু কলঙ্ককি রাধা॥

যুগ–যুগান্ত অনন্তকাল সে হৃদয়–বৃন্দাবন মে
তুমহারে হামরে এহি লীলা নাথ
চলত্ রহি মনমে।
মেরে সঙ্গে রোয়ে প্রেম বিগলিতা
ভক্তি বিশাখা ললিতা
তুমকো যো চাহে মেরি তর্হেসে
রোয়ত জীব সমাধা॥

৩৬

তিনদিন বের হাম রোজ নাহাই
আঁখিয়া ভরভর কাজরা লাগাই।
পওয়াহ তৈল দাবাই
কাংহা লে কর বলি বানাই
সুন্দর দেখ পড়ব জব ওয়োকে

মৌগী ছাতিয়া লাগাই মোকে
দেওয়া মে দিন রায়ন রহি উ
কেয়্সন্ ফের মেয় আউর তু
মোটি মোটি টিকরি পাকাই
হামকা খিলাকে আপনে খাই।
দেখিনা যব্ খোজি মেয় কো
উহো হো হো উহো হো হো॥

৩৭

তুম প্রেমকে হো ঘনশ্যাম মেয় প্রেম কি শ্যাম প্যারী।
প্রেমকা গান তুমহারে দান মেয় হুঁ প্রেম-ভিখারী॥

হৃদয় বিচমে যমুনা তীর—
তুমহরি মুরলী বাজে ধীর
নয়ন নীর কি বহত যমুনা প্রেম সে মাতোয়ারী॥

যুগ যুগ হোয়ে তুমহরি লীলা মেরে হৃদয় বনমে,
তুমহরে সুন্দর-মন্দির-মোহন মোহত মেরে মনমে।
প্রেম-নদী নীর নিত বহি যায়,
তুম হরে চরণ কো কবহুঁ না পায়,
রোয়ে শ্যাম-প্যারী সাথ ব্রিজনারী আও মুরলীধারী॥

৩৮

তুমহি মোহন চাঁদকে জ্যোতি
মেরে হির্দয় গগণ প্যারে।
বন্শী বাজে হির্দয় মাহি
প্রাণমন মেরে হরণ ক্যারে॥

রাস রচো মন মে মেরে
রহো রাধা কুন্জন্ ঘেরে।
জীবন মেরে সফল পিয়া
তুঁহারে চরণ পূজা না ক্যারে॥

মধুর হোয়ি মিলন রাতি
প্রেম কুসুম সেজ পে পিয়া,
শোওন্ করি শীতল তব
প্রেম্‌কে দ্যুতি মুরলিয়া।
সাগর নদী মিলন হোবে
চন্দ্র বিনা চকোর রোবে
তুহারি মিলন হোবে মেরে
নয়ন নীর আরতি ক্যরে।

৩৯

তুম্ হো মেরে মন্‌কে মোহন বায় হুঁ প্রেম অভিলাষী।
তুম্‌হারি মায়া হরতি মনকো নাহি অপরাধী য়ে দাসী॥

প্র্যভুজী তুম্‌হারি মূরতি শ্যামাবিহারী
মোহত যোগী আওরা সন্‌সারী,
ম্যয়তো অব্‌লা ব্রিজকি নারী উন্ চরণু তীরথ–বাসী॥

মায় হুঁ তুমহারে মোহন রূপ নিহারে নরভি
আপন ভুলতে সারে
রমণী ভাও প্রভু জাগত মনমে চাহে হো সন্ন্যাসী॥
প্র্যভুজী নাহি অপরাধী দাসী॥ প্র্যভুজী

৪০

দেখোরি মেরো গোপাল ধরো হ্যায় নবীন নট কি সাজ ;
রুণক ঝনুক নূপুর বাজে উন্‌কে চরণোঁ পর
আজ (দেখো সব)
লচক লচক চলতে মোহন নাচন্ত মুকুট শিশ উন্ সন
গোপ গোপীন সব আনন্দ মগন
চাঁদ পারত লাজ (দেখো সব)
সুন্দর মোহন রূপ নেহারী চাঁদ পারত লাজ
নির্মল নীল অম্বর আওর ছান ছান অমিয়্যা সাগর

কওন বচো হ্যায় কৃষ্ণ কুঁওর গিরধর নটরাজ
নাচত যত তিন লোক বিসরত কাজ ॥

৪১

নার্গিস বাগ মে বাহার কি আগমে ভরা কি দিল্ দাগমে
কাঁহা মেরি পিয়ারা, আ যা পিয়ারা।
দুরু দুরু ছাতিয়া, ক্যায়সে এ রাতিয়া কানু বিনা সাথিয়া
ঘাবরায়ে জিয়ারা, তড়পত জিয়ারা ॥

দরদে দিল্ জোর, রঙ্গীলা কও সর্
শরাবন তহুরা লাও সাকী লাও ভর্
পিয়ালা তু ধর্ দে মস্তানা কর্ দে, দরদ মে ভর দে
দিল মেরী পিয়ারা, আ যা পিয়ারা ॥

৪২

নাচে যশোদাকে আঙনামে শিশু গোপাল
চরণমে মধুর ধুন বাজে ঝাঝন তাল্ ॥

অধর ভ্যয়ে ধীর পবন কাঁপন লাগে থির গগণ,
অরুণ-অনুরাগ সে ভ্যয়ে নভো-লোচন লাল ॥

নাচত মহাকাল মেঘ কি জটাজুট খোলে
বাউরি ধ্বনি ভোলে ত্রিলোক ব্রহ্ম ধ্যান ভোলে !
বহে উজান যমুনা বারি নাচন লাগি ব্রজ-কুমারী
নাচে ইন্দ্র, চন্দ্র রবি বানকে গোয়াল ॥

৪৩

নাজো নামকে প্যলে ব্যয়ঠে ক্যা হো
মিল্কে গলে লড়নেকো চ্যলো।
হাথ্মে হাতিয়ার লেকে চ্যলো
যান্ প্যর আপনে খেল্কে চ্যলো।

আগর এক গিরে, দশ আগে বঢ়ো
স্যেলায়ে ম্যওত্ পে ল্যব্ব্যয়েক ক্যহকে চ্যলো॥

ন্যহো ত্যক্‌লিফ্ কি তুমহে প্যরওয়া
পার হো ক্যর দ্যশতো স্যহ্‌রা
ক্যরো ম্যরহ লোঁকে ত্যয়
চ্যলো জ্যঙ্গয়ু সেপাহী বিনা খ্যওফ্ খ্যতর্
ছোড় আপনা ওয়াতন্ স্যব আগে ব্যঢ়ো
রণ ঝণন রণ-ডংকা ব্যজে
যোশমে ন্যওজোয়ানকো দিল তড়পে
ব্যঢ়ো তেজ র্যফ্‌তার কস্তেওয়ালো॥

৪৪

নেহি তোড়ো ইয়ে ফুলোঁ কি ডালি রে হা ;
মালি ভোমরা বুলবুল তেরি গালি রে হা॥

যাও সওতন কে পাশ শুনো ভিগা ভিগা বাত
ম্যয়তো হোনেকা চাহতি হুঁ প্রীত বিমার
আভি চাহ ফেকা যায়েগা কালীরে হা॥

হায়রা হায় বান্দা অবু দালা যৌবন অভি
অভি ফুলো মে নেহি আয়ি হ্যায় সৌগন্ধ।
আভি গ্যালো পে আয়ি নেহি লালীরে হা॥

নেহি আওকী আভি রাহাজানে পাও নেহি বাত
আভি ছোটি হ্যায় ফুল কলি কাচ্চা আনার
জবানসে মে অবতক্ হর যাতে॥

৪৫

পতিত উধারণ জয় নারায়ণ
কমলাপতে জয় ভব-ভ্যয় হ্যরণ
জয় জগদীশ হ্যরে

৪৬

পল্লু ছোড়ো সজন ঘর যানা রে
জরা নয়নো সে নয়না বিতানা রে
মাটি পড়ে সরাবো সে পিনেসে গগরিয়া
সুবাহ হো গায়ি করকা বাহানা রে॥

বড়া পেয়ার হ্যায় তুমসে পলঘট আনে কা
জরা ধীরে সে বীন বাজানা রে॥

সাড়ি তেরি হ্যায় পল রঙ্গীণ আঁখিয়া টুটেগা
জরা সিনে সে আঁচল হটানা রে॥

৪৭

পাপী তাপী সব তারলে চলি হয়্
কৃষ্ণ প্রেম কি নাইয়া।
চলি হয় কৃষ্ণ–প্রেম কানাইয়া॥

কৃষ্ণ প্রেমসে যাওয়ে উদাসী
সঙ্গ রাখ্‌লে নিত্ জগবাসী,
মিট্ জাওয়েগা লাখ্ চৌরাশি
বনয়া কৃষ্ণ সেওইয়া।
চলি হয় কৃষ্ণ প্রেম–কানাইয়া॥

একবার তু কৃষ্ণনাম লে,
মধুর নাম সব জগকো লিখালে
প্রেম নগরকি রাহ বানালে
কৃষ্ণকে নাম লেওইয়া
চলি হয় কৃষ্ণ প্রেম–কানাইয়া॥

৪৮

প্রেম কাটারী লাগ গ্যই তোরে কারী কারী
প্যায়ারে ভঁ্যাওরে ডোলাঙ হ্যায় যো নিস্ দিন ডারী ডারী॥

শুনা প্যায়ারে ভাঁওর ও প্রেম-কাহানী
বাগমে যাতা হ্যায় প্রেমসে গাতা হ্যায়
মেরী তারহা ক্যয়া তু প্রেমী ব্যনা হ্যায়
ত্যড়পত হ্যায় কিসকী তু বিরহা মেঁ নিস্ দিন
পাই হ্যায় কিস্‌সে ইয়ে প্রেমনিশানী
ফুলমে হ্যায় গুলসে গালো কি রং গাঙ
মিলতি হ্যায় ইনসে প্রীতম কি প্যারী সুরাত
ইস্‌সে ম্যায় কারতি হু ফুলসে উলফত
ফিরতি হু ব্যন ব্যন ব্যন্‌কে দিওয়ানী॥

[হিজ মাস্টার্স ভয়েজ, নভেম্বর ১৯৩৭। শিল্পী : মিস্ সীতা দেবী। এন ১৯৯৬, সুর : নজরুল]

৪৯

প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে প্রেম নগরকা ঠিকানা।
ছোড় কারিয়ে দোদিন কা ঘর ওহি রাহপে জানা॥

দুনিয়া দওলত হ্যায় সব মায়া
সুখ দুখ দো হ্যায় জগৎকা কায়া,
দুখকো তু প্রেম্‌সে গলে লাগালে—জাগে না পছ্‌তানা॥

আতি হ্যায় আব রাত আঁধারি ছোড় তুম
মায়া বন্ধন-ভারি,
প্রেম নগর কি কর্ তৈয়ারী, আয়া হ্যায় পরোয়ানা॥

৫০

ব্যনমে শুন স্যখিরি পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া।
স্যখি ক্যওন উও বন্‌শী ব্যজায়ে ঘ্যরমে ন্য র্যহ্‌ন যায়,
মন্ ভ্যয়ে উদাস স্যখি ন্যহি মানে জিয়া রি
পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া॥

নিরালা ঢং বাজে মৃদঙ্গ ম্যওর পাপিহা বোলে রি
চারণ ন মে জাগে তান্ মন্ প্রাণ ডোলে রি
প্রেম্‌সে ম্যতয়ালী ভ্যয়ি চাঁদ কি আঁখিয়া রি
পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া॥

সাখি প্যহনো নীল সাড়ি
চূড়া বাঁধো ম্যন্‌হারি
যাঁহা বান্‌চারী চ্যলো ক্যরকে সিঙ্গার
চ্যরণ্‌ মে গুজরী গ্যলেমে চম্পা হার—
নাচুঙ্গী আজ ওয়াকে সাথ্‌ গাওঙ্গি র‍্যসয়ারি
পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া ॥

[হিজ মাস্টার্স ভয়েস, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, শিল্পী : মিস্‌ প্রমোদা। এন. ১৭০৪২]

৫১

বরষা মে বাজে সখিরী উয়ো শুন।
মোরে শাওল কী বীছুয়া কী ধুন ॥

চঞ্চল চপল বিজলী চমকে
উনকে হাসি দেখায়ে আজ ঘনশ্যাম আয়ে
জুই কে লগী ফুল সে উনকো দেহকী সুগন্ধি আই
শ্যামকে গলেকী বনমালা সখী কদমকে ডার পাই।
বাদর গরজে নহী সখী ওরী
শ্যাম শ্রীহংসে আকাশ ছোড়ী
বায়ু পূরবৈয়া মে স্যখিরী
বাঁশরী শুনায় ধুন ॥

৫২

বাতা দে রে যমুনাকে জল কাঁহা মেরে শ্যামল।
কোন বন্‌মে বাঁশরী বজায় রে উয়ো মেরে চঞ্চল ॥

নন্দকে ভবন কাঁহা খেলত গোপাল যাঁহা
বার করত কাঁহা উয়ো মেরে শ্যামল ॥

ম্যয় পুছা ব্রজবাসীকো সব ম্যয় পুছা
কৃষ্ণ কাঁহা হোই ;
শুনতে হি সব্‌ রোনে ল্যগে বাত্‌ বোলে কোই।
লেতা কৃষ্ণজিকে নাম আয়া রোরো রোরো কে ইয়ে ব্রজধাম,
হায় দরশন কি আশ্‌ কোন্‌ মিটায়ে ক্যরে জীবন সফল্‌ ॥

৫৩

বালা যোবান মোরি স্যখিরি পরদেশে পিয়া।
ক্যয়সে স্যামহালুঁ সোলা ব্যয়স উম্যারিয়ারি
পরদেশ পিয়া॥
ব্যয়রি ভ্যয়রি যোবান্ দিলমে নাহি চ্যয়ন্
দিল না লাগে কাম্‌মে জাগি কাটে বয়ন
সোতে ড্যর লাগে একেলি স্যবরিয়া রি
পরদেশে পিয়া॥
ফিকা লাগে খানা পিনা ন্যয়নোমে নিদ ন্যহিরা,
যাঁহা মোরি বিদেশীয়া লেবা মোহে ওয়াহিরি।
আয়ে ফাগান চৈত্ স্যখি খিলা যোবান ফুল মোর
স্যত্যয়ে নিস্‌দিন মোহে বুলবুল আওর ফুলচোর
ক্যয়সে ছিপাউঁ উও ফুল পাতরি আঙ্গিয়ারি
পরদেশ পিয়া।

[হিজ মাস্টার্স ভয়েস, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮। শিল্পী : মিস প্রমোদা। এন. ১৭০৪২। 'তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে' গানটির সুরে এই গানটি রচিত]

৫৪

বাঁকে ছায়লা সাঁওরিয়া আওরে
মোরি স্যুনি পড়ি হেয় সেজরিয়া।
যব্‌সে বসে তুম সৌতানা নাগরিয়া
কবহুঁনা লিনি মেরি খবরিয়া
প্যারে সাইয়াঁ মান বাতিয়াঁ
লাগুঁ তোরে পাইয়াঁ॥

আঁখিয়ানকে বাদরা বরধনে লাগে
রোতি হেয় হর্দম, গম্‌মে তুমহারে
আজ প্যারে শকল দেখা দে
সীনে লাগ্ কর চিন্তা মিটায়ে॥

৫৫

বিকেল বেরকী চম্পা আউর
সবেরা কি যুইন্

কিস্‌কো কঁহা রাঁখু য়্যহী
সোচ্‌না হর্‌য়্যেক দিন্‌॥

গুলদানী মে রাঁখু কিসে গলে কী হার করুঁ কিসে
দেওতা কো মেয়্‌ দুঙ্গা কিসে
(কিসে) দিল্‌ মে রাখুঁ মৈঁন্‌॥

অভিমানী উন্‌ দোনো মুলায়েম বরাবর
চম্পা মেরী আঁখ্‌কি রোশনী
যুঁইন আঁখ্‌কি লোর
বরষে বাদর শাওন্‌ মে যব
যুঁইন কে সাথ রোতা হঁ তব
চৈতী রাত মে চাঁহু চম্পা
প্যর করুঁ দো মৈঁন॥

৫৬

বৃজমে আজ স্যখী ধূম ম্যাচাও
আওরী ব্রজবালা ম্যঙ্গল গাও॥
গুঁথো স্যখীরী স্যব কুসুম-মালা
দ্যেখন্‌ কো চ্যলো নন্দকে লালা,
বৃজকে ঘ্যর ঘ্যর হর্‌ষ ম্যনাও॥

৫৭

সুনা হোয়েগা গুলজার
রোয়োঙ্গ গুলে তর॥
খিয়াল তো আয়া (?) মিট জায়েঙ্গে
একদিন য়্যু হি হাম।
আখ মে ভর আয়েঙ্গে আঁশু
পি গিয়া জরতে গম॥

[গানটির সঠিক পাঠোদ্ধার করা যায়নি। দ্রষ্টব্য : হিন্দী গান, পৃ. ৬৭১, 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড)]

৫৮

ম্যায় প্রেম নগরকো জাউঙ্গী ;
সুন্দর দিলবর দেখ্‌ন কো
ফুল চড়াউঁ অঙ্গ অঙ্গ মে
মন রঙ্গুঙ্গি পিয়া রঙ্গ মে।
পিয়া নাম মেরি গলে কি হার কর্
পীতম মম বাহ্ লাউঙ্গী॥

৫৯

মেরে তন্‌কে তুম অধিকারী ও পিতাম্বরী।
অঞ্জলি ম্যায় দে চুকি হুঁ (উন) চারণ্য পে বনওয়ারী॥

যতন এ তন্‌কা কর্‌তি হুঁ মায়
সোলাহ্ সিঙার রচিত হুঁ ম্যয়
তুম হারি বস্তু ও মনোহর করতিহুঁ বাখওয়ারী
তুম্‌হারে খাত্যর সাজাউঁয়ো তন
পহরু মোহন কঙ্কন ভূষণ,
বন্ বন্ ফিরতি সাথ তুমহারে গোপীজন–মন্‌হারী॥

মোহন বন্‌শী শুনতি হুঁ ম্যয়,
নূপুর গুঞ্জন গিন্‌তি হুঁ ম্যয়।
তুমহারে খাতের যমুনা তট্‌কো (ব্যন ব্যন)
আতি সব্ ব্রিজনারী॥

৬০

মেরে বেটে কি খালা—বিবি ঝাঁপ ঝপক ঝালা।
খুব উস্‌কো দেখা ভালা, ঢং উস্‌কো হেয় নিরালা॥

উস্‌কি আঁখ বড়ি বসিলি, উস্‌কি সুরত হেয় আলবেলি
হেয় বড়ি নবেলি, বাকী বদন হেয় এক ঘোটালা॥

খাতি পান মে হাঁ উয়ো জর্দা, উস্‌কা চেহারা মর্দা মর্দা
কলহু কা জেয়সা বর্‌ধা, মেয় উস্‌কা হি মাত্‌ওয়ালা॥

শালিকো মোলকে জানা, বিবি পন্দর আনা
উস্‌কো দিয়া জব্‌ এক আনা, লায়ে কার্‌কে পুরিয়া তানা।
বিবি হুয়ি উয়ো ষোলো আনা
বোলো ভাইয়া ক্যা বলো?
সোতি রাত্‌ মে জাগা, আজ জিট্‌ জপট্‌ জে ঠগা
উস্‌কো রেল মে লেকে ভাগা, গোয়া গলে মে ফাঁসি ডালা॥

৬১

মেরে শ্রীকৃষ্ণ ধরম শ্রীকৃষ্ণ করম
শ্রীকৃষ্ণ তন মন প্রাণ॥

সবসে নিয়ারে পিয়ারে শ্রীকৃষ্ণজি
নঁয়নুকে তারে সমান।
সুখ দুখ সব শ্রীকৃষ্ণ মাধব
কৃষ্ণহি আত্মা জ্ঞান,
কৃষ্ণ কণ্ঠহার আঁখকে কাজর
কৃষ্ণ হৃদয়মে ধ্যান,
শ্রীকৃষ্ণ ভাষা শ্রীকৃষ্ণ আশা
মিটায়ে পিয়াস ওয়ো নাম
স্বামী সখা পিতা-মাতা শ্রীকৃষ্ণজি
ভ্রাতা বন্ধু সন্তান॥

[টুইন, অক্টোবর, ১৯৩৫। শিল্পী : কুমারী রেবা সোম ও হেমন্ত সোম। এফ. টি. ৪১০৯। সুর : নজরুল।]

৬২

মোরে মন মন্দিরমে শুনো সখিরি
শোওত হায় গিরিধারী।
জাগ জাগ কর প্রেম হামারা প্যহরা দেও দ্বারী।

ছাতিপে মেরে কৃষ্ণ শোওত হায় ভক্তি
চাঁওর তুরাওয়ে
উন্‌কে শিরাহনে দীপগ মোরি আঁখিয়া
প্রীতি হায় দাসী হামারি॥
চোরি চোরি শাস ননদ মোরা দেখ রহি হায় নেম।
উনকা ডার মোহে কুছওয়া না লাগে
জাগত হায় মোরা প্রেম॥
আধি রাত যব জাগে বিহারী
ধ্যারি হাঁয় হাথ কৃষ্ণ মুরারী
ধ্যান ধ্যরে অব ইয়ে প্রাণ মেরা য়্যয়সে রাধা পারী॥

[তথ্যের উৎস : আজহারউদ্দীন খানের তালিকা ও এইচ. এম. ভি কোম্পানির রেজিস্টার। হিজ মাস্টার্স ভয়েস, ডিসেম্বর, ১৯৩৬। শিল্পী : মড কস্টেলো। এন. ৬৭২৮]

৬৩
ভজন

যমুনাকে তীরপে সখিরি সুনি ম্যায় চঞ্চল
সাঁরব কোঙর কে বাঁসরী।
বিসর গ্যায়ি নীর ভরণে কো ফির আগ্যয়ি ঘর, ছোড়কে গাগরী।
নাম্ লে ব্যজানে ল্যগে বাঁসুরিয়া নিলাজ বাঁসুরিয়া
বন্‌মে পাপিহা বোল্ উঠা পিয়া পিয়া
পান্ ঘট্‌পে হাঁস্‌নে লাগি আকুল কি নাগরী॥

নিস্‌দিন মোহে সাঁম ননদ্ দেত গারি
নির্মল মোরে কুলমে লাগে কৃষ্ণকারি
যাঁহা জাউঁ দেখতে পাউঁ খ্যড়ে হাঁয় কিশোর হরি॥

৬৪
ভজন

রাধা শ্যাম কিশোর প্রীতম কৃষ্ণ গোপাল, বনমালী
ব্রিজকে গোয়াল।
কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল॥

কাভি রাম্ রাঘব কাভি শ্যাম মাধব
কাভি ব্যনে কেশব যাদব ভূপাল।
কৃষ্ণ গোপাল শ্রী কৃষ্ণ গোপাল শ্রী কৃষ্ণ গোপাল॥
কুঞ্জ-বিহারী মুরলীধারী বৃন্দাবন্ ব্যসে গোপী মন্হারী।
কাভি মথুরা পতি কাভি পার্থ সারথী
ব্রিজ্‌মে যশোদা আওর নন্দকে লাল॥

কৃষ্ণ গোপাল শ্রী কৃষ্ণ গোপাল শ্রী কৃষ্ণ গোপাল॥

সোহে গ্যলেমে তোহার ফুল কদম্‌কে হার
বাজতি চরণোঁ মে মধুর ঝাঁঝন্ ঝন্‌কার।
কালিয়-দমন কাভি করেহো মুরারী
কাননচারী শিখী পাখা ধারী
সাঁবর সুন্দর গির্‌ধারী লাল
শ্রী কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল।

৬৫

শো'জা শো'জা শো'জা জাগ নরনারী
বাদল গরোজো, বিজলী চমকো
রজনী হোয় আঁধিয়ারী॥

৬৬

শ্যাম সুন্দর মন-মন্দিরমে আও আও।
হৃদয়-কুঞ্জমে রাধা নামকি বন্‌শী শুনাও শুনাও॥

বহ্‌তা যমুনা নয়ন-নীরকে,
আও শ্যাম ওহি যমুনা তীরপে,
বয়ঠি বনঠন্ ভক্তি-গোপীন কাহে তুম্ বিল্‌মাও আও আও॥

চঞ্চল মোহন চরণ-কমল পে নূপুর বাজাও
প্রীতি চন্দন মনকে মেরে লেকে অঙ্গ সাজাও,
বিরহ কি মৌর পাপিহা বোলে, প্রেম কি নাইয়া ডগমগ ডোলে।
আও কানাইয়া রাস রচাইয়া মধুর সুরত দেখ্‌লাও, আও আও॥

৬৭

স্যখিরি দেখেতো বাগমে কামিনী
জুঁহি চাম্বেলী কি ক্যয়সী বাহার হ্যায়॥

আও আও হর্ ডালি সে তোড়কে
ক্যচ্চি কলিও কো গুঁথে হম্ যোড়কে।
প্রেমমালা পিন্হায়ে দিলদার ইয়ার কো
ম্যস্ত হোকর গলে মিলতী হর্ ডার হ্যায়॥

ম্যয় হুঁ সুন্দর ন্যর নওয়েলী প্যারী
প্যহেনা ফুলোঁ কা গ্যহনা যো ম্যয়নে স্যখী
ছুলহান ব্যন গ্যই॥
প্যয়ারে প্রীতম্কে মিলনে কি আই ঘ্যড়ি ;
ইসী আশা পে সারা ইয়ে সিঙ্গার হ্যায়॥

৬৮

সবেরে শাম্সে হর তক্ কাম্ মে
প্রভু গাও তুমহারা নাম।
অন্ধেরী রাত্ মে তারা কী তরাহ
প্রভু গাও তুমহারা নাম॥

[অসম্পূর্ণ বাণী]

৬৯

জাগত সোওত আঁঠু জাম রাহত প্রভু মনমে তুমহারে ধ্যান।
রাত আঁধেরি মে চাঁদ সমান প্রভু উজ্জ্বল কর মেরা প্রাণ॥

এক সুরে বোলে ঝিওর সারি রাত
এ্যায় সে হি জপত হুঁ তেরা নাম হে নাথ,
রুম রুম মে রম রহো মেরে এক তুমহারা গান॥

গয়ি বন্ধু কুটুম স্বজন
ত্যজ দিনু ম্যায় তুমহারে কারণ,
তুমহো মেরে প্রাণ-আধারণ, দাস তুমহারী আন॥

৭০

সাদি কি হাঁ মুছন্দর মে যব নেকালি রাহ।
পকড় ধকড় কর উসকা সব নে কর দিয়া আখের বিয়াহ॥

যব তক কোঁয়ারা যা বেচারা মস্ত মগন বহতা
হাল্‌কা হাল্‌কা পাঁও লিয়ে দো, খেলতা কদতা উড়তা
কর্‌কে মুছন্দর ব্যাহ
ভারি পয়রোওকে উড়নে মে করতে দেখা ভয়হ।
এ্যাডিশনাল দো পয়র লটক্‌ তে পিছে চলে হামরাহ।
পয়র মুছন্দর কা দো মোটা, বিবিকা সুখমারু
ছোটে বড়ে দো জোড়ে পায়র, ঠিক ক্যাঙারু॥

এ্যায়সি তরক্কি কর হোতি হেয়, বোলো ঘরকি শালি
দু'চার প্যায়র বঢ়তে জাতে ইগগা বহত্তে মাহ॥

বহু শুনেনা কহনা, কহে গোসসা হো কর আচ্ছা
ঝম্মা ঝম্মি লাতি জায়ে, হর্দম বাচ্চি বাচ্চা
চার পাইয়া কা ইন্‌সাঁ দেখো, হুয়ে ছ পয়রী মক্ষি
আট পায়ের কি চিওটি বন্‌ কর ভুলা মুছন্দর খিক্ষি
আখের পাগল হ্যায় মুছন্দর
তাখা যব যো ঢণঢ কমণ্ডর্‌
উয়ো থে বন্দর য়ো কলন্দর
বোলা ক্যায়সে শাদী কর্‌কে হো চেঁ চেঁ মে নিবাহ॥

৭১

সারা দিন ছাদ পীটি হাত হুঁ দুখাইরে।
তবই তো পেট ভরকে খাইকা ন পায়ীরে॥

তু বোল্ বহিন্ আজ ঘরে কা কা পকাই হ্যায়
তু ওভি চুল্‌হো তক্ বারো নাহি,
বাচ্চা ভুকায়ে হ্যায়ে
হুমহুঁ কুছ খাওয়া নাহী বাল বানওয়া নাহী
সাস মোরী জুলমী ভোর উঠ্ সাতায়ে হ্যায়
বৈরেন ননদ, বহুতে হ্যর জায়ীরে।
সারা দিন ছাত পীটি হাত হুঁ দুখাইরে॥

৭২
দ্বৈত গান

পু॥ পরদেশী আয়া হুঁ দরিয়া কে পার।
রাহ্ বাতা কোয়ি য়্যার দিলদার॥

স্ত্রী॥ নাওজওয়াঁ পরদেশী পিয়া
আ যাও দিল কনার
পু॥ সমঝতা হুঁ বে-জবাঁ তুঝে
স্ত্রী॥ জবান ফজুল যব সামঝা মুঝে
পু ॥ মেরে খাব মে বে-নকাব হো তুম রকৌলি
কোহে কাঁফ মে।
স্ত্রী॥ মেরে আসমান কিয়া রওশন তুম পিয়া
তুম্ লায়ে বাগ মে বাহার॥

পু॥ তেরে লব পে মিটি সরাব
আঁখি মে দরিয়াকে আব
সত্রী॥ তুম্ হো সুর্‌হ্ উমেদ রঙ্গীন তুম আফতাব॥
উভয়ে॥ পরী আওর ইন্‌সান্ হুয়া দোনো একজন
দুনিয়া পরেস্তান
এক হো গিয়া আজ
এশ্‌ক মে গুলজার॥

[মেগাফোন, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। মিস বারালক্ষ্মী ও জ্ঞানদত্ত রেকর্ড নং জে. এ. জি. ৫১৭]

৭৩

উভয়ে॥ আশক ও মাশক চলো মিল্ কর্ হাম্
ছোড় কর্ দুনিয়া দূর বাগ রেজওয়ান।
দুনিয়া মে সব কোয়ি এশ্ক কে দুশমন
কোয়ি নেহি হেয় দিল্ কি করদান্॥

স্ত্রী॥ হামার য়্যে শিক্ওয়া দুনিয়া বো ফয়্লি
তুম নয়া মজনু মেয় নেয়ি লায়লি।
পু॥ যব্ তক্ বুলবুল ও ফস্লে গুল্ হেয়
হ্যায় য়্যে শিকওয়া দুনিয়া বো হো আমান
দিল্ কে করীব যব দিল্দার হো
স্ত্রী॥ ফির কাঁহা ফিরদৌস শারাবন্ তহুরা
চাহে সারা দুনিয়া হাম পে বেজার হো
পু॥ মওদমে জাওয়ানী তব্কে শারাব ক্যা
দুনিয়া মে আশেক বেহেশতী মেহমান॥

[রেকর্ড নং—জে. এ. জি.৫১৭]

নজরুলের রচিত উপরোক্ত ৭৩টি হিন্দী গান কলকাতার হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬, ১২৭ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) শীর্ষক গ্রন্থ হতে (তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪) সংকলিত। উক্ত পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের সম্পাদক ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। মূল সম্পাদনা : আবদুল আজীজ আল আমান এম. এ।

সংযোজন

ভজন-চাঁচার

বন্দে নন্দকুমারম্
শ্রীধর বেলয় বহুগুণ আরাম্॥

সুরতিধর শ্যাম, অতিগুণ সায়ম
শ্যাম মনোহর অতি সব পারম্
গোপী চিত্-বিশ্বরম॥

বন্দে নন্দ কুমারম॥

২
যোগিয়া-চাঁচর

করলে সিঙ্গার চতুর আলবেলি
স্বজনকে ঘর জানা হোগা॥

না কোয়ি কুটুম কাবিলা তেরা
না কোয়ি আপনা বেগানা হোগা॥

কান্তি শ্রী দাও তনু মনে।

৩
সুহাঁ-তেতালা

য়োহি গণিমত্ মত জানা হাম্‌বস।
তুমনে হামকো জানা।
ইশ্‌ক দিদার শুনো মিঞা সমরঙ্গ
তুম শামা হাম পরওয়ানা॥

৪

খিয়ালতো আয়া মিট জায়েঙ্গে
একদিন য়্যুহি হাম
আঁখমে কর আয়ে যে আঁসু
পি গিয়া জারতে গম॥

৫

কার্ফা উভয়ে যৌবনকো কোঁওকর ছিপাউঁরে
প্যারে সাইয়াঁসে বাচাউঁরে (২)
দেখো ছুওত হেয় বালম যোয়ি ছাতিয়া

দাদ্‌রা হেয় মানত নহি নিরদর বাতিয়া
মোরি বাইয়াঁ মারোরি মাস্‌কাই আঙ্গিয়া
কার্ফা হুঁ ম্যায় ভোলি ঠাঠলে ম্যায় ক্যা জানু॥

দাদ্‌রা প্রেম বন্ধন মে বাঁদোনা মেয় কো পিয়া
মন্ মোহন্ দেখা কর্‌কে বাঁকি আদা
যান্‌তি হুঁ পুরুষ হোতে হ্যায় রে বাঁকা
কার্ফা কাম হোয় ইন্‌কা দিল্ লেকে ভুল জানা॥

গজল গান

৬

আল্‌গা করগো খোঁপার বাঁধন
দীল্ ওঁহি মেরা ফঁস্ গয়ি।
বিনোদ বেণীর জরীন ফিতায়
আন্ধা এশ্‌কে মেরা কস্‌গয়ি॥

তোমার কশের গন্ধে কখন
লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন।
বেহুশ হো কর্ গির পড়ি হাথ্‌মে
বাজ্জ বন্ধমে বস গয়ি॥

কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিঁধিয়া,
আখ্ ফেরা দিয়া চোরা কর নিদিয়া,
দহের দেউরিতে বেড়াতে আসিয়া
আউর নেহি, উয়ো ওয়াপস গয়ি॥

নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুলের হিন্দী গান' (সংগ্রহ ও সম্পাদনা জনাব আসাদুল হক) শীর্ষক গ্রন্থ থেকে (জুন, ১৯৯৫) উপরোক্ত ৬টি গান সংকলিত হয়েছে।

পত্রাবলি

এক

[আজ পর্যন্ত নজরুলের যত চিঠি পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে কালের দিক দিয়ে এটি প্রথম। ১৯১৭ সালে ছাত্রাবস্থায় নজরুল এটি তাঁর স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক মৌলবি আবদুল গফুর সাহেবকে লেখেন।]

Raniganj
Moslem Hostel
23.7.17

পাক জোনাবেষু—

আদাব কোর্ণোশাৎ হাজার হাজার পাক জোনাবে পহুছে। বাদ আরজ, ইতঃপূর্বে খাদেম আপনাকে ২ খানা পত্র বর্দ্ধমানের ঠিকানায় লিখিয়াছিল, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কোনো উত্তর পাই নাই। পড়াশুনা মন্দ হয় নাই। বোর্ডিং অবস্থা মাঝামাঝি। সকলেই ভাল।

রমজান শাহের পিতা শুরৎ শাহের নিকট আপনি যে ছয় টাকার মান্‌তা হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল ২ টাকা সে আপনাকে দিয়াছিল। বাকি ৪ টাকা আপনি চলিয়া যাইবার সময় আমার নামে চাপাইয়া দিয়াছিলেন এবং লিখাইয়াও লইয়াছিলেন। আমি জানি যে, সে চারি টাকা আপনি রমজানের হিসাবে চাপান নাই। তথাপি শুরৎশাহ বলিতেছে "মৌলবি সাহেব তোমার টাকা চারিটি রমজানের হিসাবে চাপাইয়া দিয়াছেন ; তুমি পাইবার কে ?" আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতেছে না। শেষে বলিয়াছে, যদি মৌলবি সাহেব লিখিয়া দেন যে তাহা রমজানের হিসাবে চাপান নাই তাহা হইলে আমি টাকা দিতে স্বীকৃত আছি। আপনি পুনরায় যখন টাকার জন্য এখানে আসেন তখনও বলিয়া যান যে, সে টাকা রমজানের টাকা হইতে কাটাইয়া লই নাই। তথাপি সে বুঝিবে না। অতএব মেহেরবানিপূর্বক অপর কার্ডে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়া বাধিত করিবেন যে, রমজানের টাকা হইতে বা তাহার হিসাবে আমার টাকা কাটাইয়া লন নাই। নতুবা এ গরিবের টাকা কয়টি অনর্থক যায়। আশা করি আমার পত্রপাঠ স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া বাধিত করিবেন। পত্রের আশায় রহিলাম।

আজ কাল কি করিতেছেন ও কোথায় আছেন জানাইবেন। পাক জোনাবে আরজ। ইতি—

খাদেম
নজরুল এসলাম

দুই

['বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র মুখপত্র ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৩২৬, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের 'মুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন মৌলবি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম. এ., বি. এল. এবং কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বি.এ.। প্রকাশক ছিলেন জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ। যতদূর জানা যায়, নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি'। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা 'কবিতা-সমাধি'—১৩২৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। 'মুক্তি' প্রকাশের পর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদককে এই পত্রখানি লিখিত হয়। পত্রখানি প্রায় ১০ বছর পরে সাপ্তাহিক 'সওগাত'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।]

From :
Qazi Nazrul Islam
Battalion Quartermaster Havilder
49th Bengalis,
Dated, Cantonment, Karachi,
The 19th August, 1919

আদাব হাজার হাজার জানবেন !

বাদ আরজ, আমার নগণ্য লেখাটি আপনাদের সাহিত্য-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি বেশি। আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হয়েছিল, পাছে বেচারি লেখা, 'কোরকে'র কোঠায় পড়ে। অবশ্য যদিও আমি 'কোরক' ব্যতীত প্রস্ফুটিত ফুল নই; আর যদিই সেরকম হয়ে থাকি কারুর চক্ষে, তবে সে বে-মালুম ধুতরো ফুল। যা হোক, আমি তার জন্যে আপনার নিকট যে কত বেশি কৃতজ্ঞ, তা প্রকাশ করবার ভাষা পাচ্ছিনে। আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটি মস্ত জবর কবি ও লেখক হব, তা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিব, এ একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি কথা। কারণ, এবারে পাঠালুম একটি লম্বাচওড়া 'গাথা' আর একটি 'প্রায় দীর্ঘ' গল্প আপনাদের পরবর্তী সংখ্যা কাগজে ছাপাবার জন্যে, যদিও কার্তিক মাস এখনও অনেক দূরে। আগে থেকেই পাঠালুম, কেননা, এখন হতে এটা ভালো করে পড়ে রাখবেন এবং চাই কি আগে হতে ছাপিয়েও রাখতে পারেন। তাছাড়া আর একটি কথা। শেষে হয়তো ভালো ভালো লেখা জমে আমার লেখাকে বিলকুল 'রদ্দি' করে দেবে, আর তখন হয়তো এত বেশি লেখা না পড়তেও পারেন। কারণ আমি বিশেষরূপে জানি, সম্পাদক বেচারাদের গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হয় এই নতুন কাব্যি-রোগাক্রান্ত ছোকরাদের দৌরাত্ম্যিতে। যাক, অনেক বাজে কথা বলা গেল। আপনার সময়টাকেও খামকা টুটি চেপে রেখেছিলুম। এখন বাকি কথা-কটি মেহেরবানি করে শুনুন।

যদি কোনো লেখা পছন্দ না হয়, তবে ছিঁড়ে না ফেলে এ গরিবকে জানালেই আমি ওর নিরাপদে প্রত্যাগমনের পাথেয় পাঠিয়ে দেব। কারণ সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন। আর তার চেয়ে হাজার গুণ পরিশ্রম করে একটু-আধটু লেখি। আর কারুর কাছে এ

একেবারে worthless হলেও আমার নিজের কাছে ওর দাম ভয়ানক ! আর ওটা বোধ হয় সব লেখকের পক্ষেই স্বাভাবিক। আপনার পছন্দ হল কিনা, জানাবার জন্যে আমার নাম ঠিকানা লেখা একখানা Stamped খামও দেওয়া গেল এর সঙ্গে। পড়ে মত জানাবেন।

আর যদি এত বেশি লেখা ছাপাবার মতো জায়গা না থাকে আপনার কাগজে, তা হলে যে কোনো একটি লেখা 'সওগাতে'র সম্পাদককে hand-over করলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হব। 'সওগাতে' লেখা দিচ্ছি দু-একটা করে। যা ভালো বুঝেন জানাবেন।

গল্পটি সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাসা বা বক্তব্য থাকলে জানালেই আমি ধন্যবাদের সহিত তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিব, কারণ এখনও অনেক সময় রয়েছে।

আমাদের এখানে সময়ের money-value ; সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গসুন্দর হতেই পারে না। Undisturbed time মোটেই পাই না। আমি কোনো কিছুরই কপি বা duplicate রাখতে পারি না সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

By the by আপনারা যে 'ক্ষমা' বাদ দিয়ে কবিতাটির 'মুক্তি' নাম দিয়েছেন, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকম দোষগুলি সংশোধন করে নেবেন। বড্ডো ছাপার ভুল থাকে, একটু সাবধান হওয়া যায় না কি? আমি ভালো, আপনাদের কুশল সংবাদ দিবেন। নিবেদন ইতি—

খাদেম
নজরুল ইসলাম

তিন

[কাজী নজরুল ইসলামের 'আশায়' শীর্ষক অনুবাদ-কবিতাটি ১৩২৬ পৌষের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি করাচির সেনানিবাস থেকে কবিতাটি 'সবুজপত্রে' প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী কবিতাটি 'অমনোনীত' করলে সবুজপত্রের তৎকালীন সহকারী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নিজের দায়িত্বে তা 'প্রবাসী'-র তৎকালীন সহকারী চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশের জন্য দেন। কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হলে পরে পবিত্র-বাবু করাচিতে নজরুলকে সে খবর জানিয়ে এক পত্র লেখেন। পত্রোত্তরে নজরুল যা লিখেছিলেন, তার কিয়দংশ পবিত্রবাবু তাঁর 'চলমান জীবন' দ্বিতীয় পর্বে ছাপিয়েছেন নিম্নোক্তরূপে :]

... 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছে 'সবুজপত্র'-এ পাঠানো কবিতা, এতে কবিতার মর্যাদা বেড়েছে কি কমেছে, তা আমি ভাবতে পারছি না। 'সবুজপত্র'-এর নিজস্ব আভিজাত্য থাকলেও 'প্রবাসী'র মর্যাদা একটুকুও কম নয়। প্রচার আরো বেশি। তাছাড়া আমি কবিতা লিখেছি। পারসিক কবি হাফেজের মধ্যে বাংলার সবুজ দুর্বা ও জুঁইফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে সবই তো খাঁটি বাংলার

কথা, বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দরসের পরিপূর্ণ সমারোহ। কত শত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির-ভেজা সবুজ বাংলা। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যুসমারোহের মধ্যে বসে এই যে চিরন্তন প্রেমিক-মনের সমভাব আমি চাক্ষুষ করলাম আমার ভাষায়, আমার আপন জন বাঙালিকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই এক টুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানি না জুঁইফুলের মৃদু গন্ধ ও দূর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কিনা। তবু বাঙালির সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই একাত্মবোধ যদি জাগাতে পারে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। অবশ্য বাঙালির কাছে পৌঁছে দেবার ও যোগ্য বাহনে পরিবেশন করবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার ...

চার

[পূর্বোক্ত চিঠির জবাবে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যে চিঠি লেখেন তার উপরে নজরুল ইসলাম পুনরায় যে চিঠি দেন, নিম্নের পত্রটি তারই অংশবিশেষ। এটিও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' দ্বিতীয় পর্বে ছাপা হয়েছে :]

... চুরুলিয়ার লেটুর দলের গান লিখিয়ে ছোকরা নজরুলকে কে-ই বা এক কানাকড়ি দাম দিয়েছে ! স্কুল-পালানো ম্যাট্রিক পাশ-না-করা পল্টন-ফেরত বাঙালি ছেলে কী নিয়েই-বা সমাজে প্রতিষ্ঠার আশা করবে ! আমার একমাত্র ভরসা মানুষের হৃদয়। হয়তো তা আগাছা বা ঘাসের মতো অঢেল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলা দেশে তা যে দুর্লভ নয়, তার প্রমাণ আমি এই সুদূরে থেকেও পাচ্ছি। নিঃসঙ্কোচে ও নির্বিকারে প্রাণ দেওয়া-নেওয়া প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু মন দেওয়া যে স্থান-কাল দূরত্বের ব্যবধান মানে না, তাও উপলব্ধি করছি। ...

পাঁচ

[১৯২০-এর মার্চে নজরুল ইসলাম করাচি থেকে কলকাতা আসেন। কলকাতা এসে নজরুল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর অফিসে যান। সেখানে তাঁকে না পেয়ে নজরুল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে এই চিঠিটি লিখে আসেন। এটিও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন'-এর দ্বিতীয় পর্বে ছাপা হয়েছে :]

পবিত্রবাবু, কাল কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। দেখা করতে এলাম, কিন্তু বরাত খারাপ। আছি ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে। বাড়িটা আপনার সুপরিচিত। দেখা পাওয়ার আগ্রহে বসে থাকব।

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

ছয়

[দেওঘর থেকে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। ডাকঘরের সিলমোহরের তারিখ : ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২০। পত্রোক্ত 'আফজল' হচ্ছেন মোহাম্মদ আফজাল-উল হক এবং খাঁ হচ্ছেন আলী আকবর খান।]

Dr. Bose's Sanatorium
Quarter no, 49
Deoghar
শুক্রবার, বিকাল

ভো ভো লিভঁ মশিয়েঁ !

গত কাল শুভ দিবা দ্বিপ্রহরে অহম্ দানবের এই দেওঘরেই আসা হয়েছে। আপাতত আসন পেতেছে ঐ উপরের ঠিকানাতে। শিমুলতলা যাওয়া হয়নি। পথের মাঝে মত বদলে গেল। পরে সমস্ত কথা জানাব। জায়গাটা মন্দ নয়। তবে এক মাসের বেশি থাকতে পারব না এখানে, কেননা এখানে খুব বেশি আনন্দ পাচ্ছি না ! ... 'নারায়ণ'-এর টাকাটা দিয়েছিস অবিনাশদাকে ? যদি হাতে টাকা থাকে, তবে 'বিজলী'র দুটাকা তাদের অফিসে দিয়ে আমার ঠিকানায় কাগজ পাঠাতে বলিস। ... তোর বৌ-এর খবর কি ? তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির মারফতে আলাপ করিয়ে দিস। কালই চিঠি না পেলে কিন্তু তোদের মাঝে জোর কলহ বাধিয়ে দেব। ... কান্তিবাবুকে আমার প্রীতি ভালোবাসা আর প্রণাম জানাস। তোর গল্প লিখব, একটু গুছিয়ে নিই আগে। বড্ডো শীত রে এ শা-র জায়গায়। টাকা ফুরিয়ে গেছে। আফজল কিংবা খাঁ যেন শিগগির টাকা পাঠায়। খোঁজ নিবি, আর বলবি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে তা ব্যর্থ হবে না—আমি তা সুদে-আসলে পুরে দেবো। ইতি—

তোর পীরিত দধি-লুব্ধ মার্জ্জার
নজর

সাত

[নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের আক্‌দ হওয়ার পর কোনো অজ্ঞাত কারণে নজরুল নার্গিসের দৌলতপুরের পিতৃগৃহ ত্যাগ করে কুমিল্লা শহরে চলে আসেন। সেখান থেকে তিনি নার্গিসের মামা আলী আকবর খানকে 'বাবা শ্বশুর' সম্বোধন করে যে চিঠি লেখেন, সেটিই নিম্নের চিঠি :]

কান্দিরপাড়, কুমিল্লা,
23 June, 1921
(বিকেল বেলা)

বাবা শ্বশুর !

আপনাদের এই অসুর জামাই পশুর মতন ব্যবহার করে এসে যা কিছু কসুর করেছে, তা ক্ষমা করো সকলে, অবশ্য যদি আমার ক্ষমা চাওয়ার অধিকার থাকে।

এইটুকু মনে রাখবেন, আমার অন্তর-দেবতা নেহায়েৎ অসহ্য না হয়ে পড়লে আমি কখনো কাউকে ব্যথা দিই না। যদিও ঘা খেয়ে খেয়ে আমার হৃদয়টাতে ঘাটা বুজে গেছে, তবু সেটার অন্তরতম প্রদেশটা এখনো শিরীষ ফুলের পরাগের মতোই কোমল আছে। সেখানে খোঁচা লাগলে আর আমি থাকতে পারিনে। তাছাড়া, আমিও আপনাদেরই পাঁচজনের মতন মানুষ, আমার গণ্ডারের চামড়া নয়, কেবল সহ্যগুণটা কিছু বেশি। আমার মান-অপমান সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না বা 'কেয়ার' করিনি বলে আমি কখনো এত বড় অপমান সহ্য করিনি। যাতে আমার 'ম্যানলিনেসে' বা পৌরুষে গিয়ে বাজে—যাতে আমাকে কেউ কাপুরুষ হীন ভাবতে পারে। আমি সাধ করে পথের ভিখারি সেজেছি বলে লোকের পদাঘাত সইবার মতন 'ক্ষুদ্র-আত্মা' অমানুষ হয়ে যাইনি। আপনজনের কাছ হতে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এত হীন ঘৃণা, অবহেলা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। বাবা ! আমি মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। দোওয়া করবেন, আমার এ ভুল যেন দু-দিনেই ভেঙে যায়—এ অভিমান যেন চোখের জলে ভেসে যায় !

বাকি উৎসবের জন্য যত শিগগির পারি বন্দোবস্ত করব। বাড়ির সকলকে দস্তুর মতো সালাম-দোয়া জানাবেন। অন্যান্য যাদের কথা রাখতে পারিনি, তাদের ক্ষমা করতে বলবেন। তাকেও ক্ষমা করতে বললেন, যদি এ ক্ষমা চাওয়া ধৃষ্টতা না হয় ! আরজ—ইতি

চির-সত্য স্নেহ-সিক্ত
নুরু

আট

[এই চিঠিটি নজরুল-নার্গিস বিবাহ সংক্রান্ত প্রতিবাদলিপি। নজরুল-বিবাহে আলী আকবর খান যে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপান, নজরুল-বন্ধুরা ধারণা করেছিলেন সেটা নজরুলের মুসাবিদায় ছাপা হয়। নজরুল ইসলাম তার প্রতিবাদ করেন। এটি সাপ্তাহিক 'বিজলী'র ২২শে জুলাই ১৯২১ সংখ্যায় 'কবিবরের প্রতিবাদ' শিরোনামে ছাপা হয়।]

'কবিবরের প্রতিবাদ'

প্রথমেই বলে রাখি, আমার এই 'কবি-বরে'র অর্থ 'কবি-শ্রেষ্ঠ' নয়, এ 'কবি-বরের' মানে—'যে কবি বিয়ের বর'। কারণ, দিন কতক আগে আমি বাস্তবিকই—অন্তত ঘন্টা কয়েকের জন্যে 'বর' সেজেছিলুম, যদিও বরের এখনো বধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। যাক সে কথা, আমার ঐ 'ত্রিশঙ্কু বিয়েতে' শ্বশুরকুলের কর্তৃপক্ষগণ এক কাব্যিক নিমন্ত্রণপত্র ছাপিয়েছিলেন এবং সেটি চরমে গিয়ে পৌঁছেছে এই জন্যে যে, সেটা আবার আমার সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুবর্গকে পাঠানো হয়েছে। সেটা একপ্রকার জামাই-বিজ্ঞাপন বললেও হয়। ওতে আমার নামের আগে ও পেছনে এত লেজুড় লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে

যে, কোনো চতুষ্পদ জীবেরই অতগুলো ল্যাজ থাকে না। অবশ্য ওটা কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রণপত্র, অতএব আমার ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। কিন্তু মজা হয়েছে এই যে, আমার অধিকাংশ বন্ধু ওটা নিয়ে এই ভেবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, আমি আমার নামে এই অভিধান উজাড় করা বিশেষণ লাগানোতে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়েছি।

তাই তাদিকে আমি জানাচ্ছি যে, চোখে দেখাটাই বেশি প্রমাণ ; অন্যের প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি আমার সত্যিকার পরিচয় নয়। এতদিনের চেনাশোনার পরেও যাঁরা গোটাকতক কালির আঁখরের ঢাকনায় আমাকে ঢেকে দিতে চান, তাঁদের আমার কিছুই বলবার কইবার নেই। আমি পথের ভিখারি, আমার পথিক জীবনের শেষও ঘনিয়ে এসেছে। 'রবি'র সাথে এ খাদ্যোত কবির তুলনায় আমি গভীর প্রতিবাদ করছি। সৈনিক কবি হয়তো হতে পারি, কারণ আমি দিনকতক ছন্দ নিয়ে সৈনিকের মতনই কোস্তাকুস্তি করেছি। আর কথাকে পাট করে সাজাই বলে কবি, যেমন কাপড় ধোলাই পাট করতে পারলেই ধোবি হওয়া যায় ! ক্ষমা চাইলুম না, কেননা আমি কোনো দোষ করিনি। যাক আর শিয়ালের গু নিয়ে পর্বত করব না।

ইতি—
কাজী নজরুল ইসলাম
কুমিল্লা

নয়

['মোসলেম ভারত' পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আফজাল-উল হক সাহেবকে লিখিত। ডাকঘরের সিলমোহর থেকে বোঝা যায় পত্রখানি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে লিখিত। ১৩২৮ সালের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে নজরুলের 'আরবি ছন্দের কবিতা' প্রকাশিত হয়, তারই উল্লেখ 'আরবি ছন্দ' কথাটিতে করা হয়েছে।]

Kandirpar
Comilla
15th Chaitra

ভাই ডাবজল !

'মোসলেম ভারত' কি ডিগবাজি খেল নাকি ? খবর কি ? 'ব্যথার দান' কেমন কাটছে ? কত কাটল ? অন্যান্য কাগজে সমালোচনা বা বিজ্ঞাপন বেরুল না কেন ? 'সার্ভেন্ট' আর 'মোহাম্মদী'-র সমালোচনা এবং 'বিজলী'ও 'বাংলার কথা'-য় বিজ্ঞাপন দেখেছি মাত্র। 'আরবি ছন্দ' দেখেছেন ? কে কি বললে ? আপনার মুমূর্ষু অবস্থা দেখেই ওটা 'প্রবাসী'তে দিয়েছি। তার জন্য দুঃখিত হয়েছেন নাকি ? আর সব খবর কি ? 'মোসলেম ভারতে'র অবস্থা জানবার জন্য বড্ড উদ্বিগ্ন। এতদিন চট্টগ্রাম বা অন্য কোথাও যেতে পারিনি ; তার কারণ এ-বাড়িতে অন্তত দু-জন করে অনবরত শয্যাগত

রোগশয্যায়। এখন আবার বসন্ত হয়েছে মেয়েদের। এসব ছেড়ে যেতে পারিনি। তাছাড়া মায়ের স্নেহ আর নিজের আলস্য ঔদাস্য তো আছেই। চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে আসবেন নাকি? আমি যাব নিশ্চয়ই দেখতে। দুই কাজই হবে। নিজের শরীরও ভাল নয়। মনের অশান্তির আগুন দাবানলের মতো দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। অবশ্য 'আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন!' হ্যাঁ, আমার আজই কুড়িটি টাকা টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে পাঠাবেন kindly। বড্ড বিপদে পড়েছি। আর কারুর কাছে আমি যাই-ই হই, আপনার কাছে আমি হয়তো ভালোতে-মন্দতে মিশে তেমনি আছি। এই অসময়ে আমার আর কেউ নেই দেখে আপনারই শরণ নিলুম। আশা করি বঞ্চিত হব না। তা আপনি যত দুর্দশাগ্রস্ত হোন না কেন! টাকা চাই-ই-চাই, ভাই। নইলে যেতে পারব না! অনেক কষ্ট দিলুম—আরো দেব। 'ব্যথার দান' মোট নয়খানা পেয়েছি মাত্র; আরো খান পনেরো আমার দরকার। যাক টাকা পাঠাবেনই যা করে হোক।

আমার লেখাটা তাহলে 'উপাসনা'য় দিয়ে দেবেন যদি 'মোসলেম ভারত' না বেরোয়।

চির-স্নেহানুবদ্ধ
নজরুল

দশ

[এই পত্রখানি জনাব মাহফুজুর রহমান খানকে লিখিত। পত্রে প্রাপকের নাম ঠিকানা লেখা আছে : শ্রীমান মহফুজুর রহমান, P.O কুড়িগ্রাম Dt. Rangpur পত্রে উল্লেখিত। প্রাণতোষ হচ্ছে হুগলি জেলার প্রতাপপুরের প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। ১৩৬২ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ 'কাজী নজরুল' নামে তাঁর লেখা একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।]

হুগলি
১৬-৭-২৫

স্নেহভাজনেষু—

মহফুজ! অনেক দিন তোমার খবর পাইনি। আমিও বাড়ি থাকি না। —এখান ওখান ঘুরছি। কাল ফিরছি বাঁকুড়া থেকে। মাঝে মাঝে প্রাণতোষের কাছে খবর পাই তোমার। সেও দেখা দিচ্ছে না কয়দিন থেকে। এখন কোথায় আছ, পাশ করেছ কিনা— এবং কোথায়, কি কি পড়বে—পাশ করলে—তা জানিয়ো অবশ্য। —বইয়ের টাকা আদায় হয়ে থাকলে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবে। বড্ডো দরকার পড়েছে টাকার। আদায় না হয়ে থাকলে আদায় করবে পত্রপাঠ। বই বিক্রি না হলে ফেরৎ পাঠাবে—বই-এর বড্ডো দরকার। সকল ছেলেদের স্নেহাশিস দিও। ইতি—

P.S. পত্রোত্তর দিও শিগগির।

শুভার্থী—
নজরুল

এগারো

[মাহফুজুর রহমান খানকে লিখিত]

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলুম। তুমি পাশ করেছ জেনে খুশি হলুম। কলেজেই পড় এখন। তুমি বোধ হয় রংপুরের ইদরিস ও ইলিয়াসকে চেন। যদি না চেন তোমাদের প্রফেসর সাতকড়ি মিত্র (আমার বড়দা)-কে জিজ্ঞেস করো—তিনি বলে দেবেন। ওদের সঙ্গে পরিচয় করো। তোমার আনন্দ হবে। ওরা বড্ড ভালো ছেলে। ইদরিসের সঙ্গে দেখা হলে বলো—কতকগুলি বই ছিল ওদের কাছে (ওর এবং আজিজ বলে একটি ছেলের কাছে)—তার কী হল? আজিজের সঙ্গেও আলাপ করো। রংপুরে সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে বড়দা (সাতকড়ি মিত্র) এতদিন নিশ্চয় আলাপ হয়েছে তোমার। তাঁকে এবং বৌদিকে (ওখানে থাকলে) আমার প্রণাম দিও। ইদরিস, ইলিয়াস, আজিজ প্রভৃতি সব ছেলেদের এবং তোমাকে আমার স্নেহাশিস। আমি বড় ব্যস্ত। বীরভূম যাচ্ছি ৪/৫ দিনের জন্য।

ইতি—

শুভার্থী—
নজরুল

বারো

[বর্ধমানের 'শক্তি' পত্রিকার সম্পাদক বলাই দেবশর্মাকে লিখিত]

হুগলি
৩১শে শ্রাবণ ১৩৩২

শ্রীচরণেষু—

বলাইদা! আবার তুমি 'শক্তি'র হাল ধরে ভয়ের সাগরে পাড়ি দিলে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। 'ধূমকেতু'তে চড়ে আমার আর একবার বাংলার পিলে চমকে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গোবর মন্ত (সরকার) সাহেব পেছনে ভীষণ লেগেছে। কোনোক্রমেই একে উঠতে দেবে না। তাই 'বারো বাড়ি তেরো খামার যে বাড়ি যাই সেই বাড়িই আমার' নীতির অনুসরণ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাংলার আবহাওয়া বড্ড বেশি ভেপসে উঠেছে এবং তাতে অনেক না-দেখা জীবের উদ্ভব হয়েছে। এখন একজন শক্ত বেটাছেলের দরকার—যে কোদাল হাতে এগুলোকে সাফ করবে। লাভ-লোভকে এড়িয়ে চলার অসম-সাহসিকতা নিয়ে তবে এতে নামতে হবে। যাক, তুমি যখন নেমেছ তখন কিছু একটা হবে বলে জোর আশা করছি। দেখো দাদা, তুমিও শেষে ভেস্তে যেয়ো না। এ ধূমকেতুল্যাজাও পেছনে রইল; নুড়ো জ্বালাবার আগুনের জন্য যখনি দরকার হবে চেয়ে পাঠিও। আর একটি কথা দাদা, মহাত্মা হবার লোভ কোরো না। ইতি—

তোমার স্নেহধন্য
নজরুল

তেরো

[মাসিক 'কালিকলম' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লিখিত। এই পত্রে উল্লেখিত 'নলিনীদা', 'নৃপেন', 'শৈলজা', 'প্রেমেন' ও 'অচিন্ত্য' হচ্ছেন যথাক্রমে নলিনীকান্ত সরকার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।]

হুগলি
২৫ নভেম্বর '২৫

প্রিয় মুরলীদা !

আজ তোমার চিঠি পেয়ে জ্বরজ্বর মনটা বেশ একটু ঝরঝরে হয়ে উঠল। দুটো কথাতেই তোমার যে প্রীতি উপচে পড়েছে, তা আমার হৃদয়-দেশ পর্যন্ত গড়িয়ে এসেচে ! দিন ছয়েক থেকে ১০৩, ৪, ৫ ডিগ্রি করে জ্বরে ভুগে আজ একটু অ-জ্বর হয়ে বসেছি। পঞ্চাশ গ্রেন কুইনাইন মস্তিষ্কে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর ভিড় জমিয়েছে। আমার একটা মাথাই এখন হয়ে উঠেছে দশমুণ্ড রাবণের মতো ভারি, হাত দুটো নিশপিশ করছে—সেই সঙ্গে যদি বিশটা হাতও হয়ে উঠত। তাহলে আগে দেবতাগুষ্ঠির নিকুচি করে আমাদের ভাঙা ঘরে সত্যিকারের চাঁদের আলো আসে কি-না দেখিয়ে দিতাম। মুশকিল হয়েছে মুরলীদা, আমরা কুম্ভকর্ণ হতে পারি, বিভীষণ হতে পারি—হতে পারিনে শুধু রাবণ। দেবতা হবার লোভ আমার কোনো দিনই নেই—আমি হতে চাই তাজা রক্ত মাংসের শক্ত হড্ডিওয়ালা দানব-অসুর ! দেখছ কুইনাইনের গুণ ! ...

যাক, এখন ভাবছি শৈলজার মাটির ঘর তুলি কি করে? মাথা তো একেবারে তুর্-র্-র্-ভোঁ ! ... 'লাঙলে'র ফাল আমার হাতে—'লাঙলে'র শুধু বা কাঠেরটাই বেরোয় প্রথমবার। শুধু একটা 'কৃষাণের গান' দিয়েছি। নলিনীদাও নাকি চিদানন্দকে স্মরণ করেছেন—জ্বরে চিৎ। অফিসটা বোধ হয় চিৎপুরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অফিসের দ্বারে একটা আস্ত লাঙল টাঙিয়ে দিতে বলেছি। ঐ হবে সাইনবোর্ড। বেশ হবে, না? যাক, শৈলজাকে বলো একটা কিছু করবই।

তোমাদের একদিন আসতে হবে কিন্তু এখানে। Sincerely-র বাংলা যা হয়—তাই করে বলছি। ... 'দোলন-চাঁপা' পেয়েছ নৃপেনের কাছ থেকে? তোমাদের সবাইকে দিয়েছি তার হাতে। ...

হাঁ, তোমাকে লিখতে হবে কিন্তু 'লাঙলে'। প্রথমবারই দিতে হবে। সকলে মিলে কাঁধ দেওয়া যাক ... শৈলজা, প্রেমেন, অচিন্ত্যকে তাড়া দিও লেখার জন্য। ... আর জায়গা নেই ...

—নজরুল

চোদ্দ

[আন্‌ওয়ার হোসেনকে লিখিত]

হুগলি
২৩শে অগ্রহায়ণ (১৩৩২)

আমার প্রীতি ও সালাম নিন !

আপনার চিঠি ... পেয়েছি। সময়মতো উত্তর দিতে পারিনি। তার কারণ, আমার অনবসরের আর অন্ত নেই। তজ্জন্য আমি বড় লজ্জিত আছি ভাই—ক্ষমা করবেন। আপনি এত ভালো বাংলা লিখতে পারেন ; আপনার আইডিয়া, ভাব, ভাষা এত স্বচ্ছ ও সুন্দর যে, আপনার সাথে কাগজে অনেক আগেই পরিচয় হওয়া উচিত ছিল। অথচ আপনি আপনাকে গোপন রেখেছেন—আর যত বাজে পুঁথি-পড়া লেখকরাই আজ মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ লেখক ! ... আপনার চিঠি পড়ে এত আনন্দ লাভ করেছি যে, অনেককে পড়ে শুনিয়েছি। মুসলমান সমাজ আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে। তবু আমি দুঃখ করিনি বা নিরাশ হইনি। তার কারণ, বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানেরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানেরা ঈর্ষাপরায়ণ। এ আমি একটুও বানিয়ে বলছিনে। মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে—আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান—কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু-কবি, মুসলমান-কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি।

আমি আপাতত শুধু এইটুকুই বলে রাখি যে, আমি শরিয়তের বাণী বলিনি—আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না জন্মও লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ—আরব দেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর থেকে আর সেথা কবি জন্মাল না। এটা সত্য ...

—নজরুল ইসলাম

পনেরো

[১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় নজরুল ইসলামের নিকট লিখিত অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁর 'একখানি পত্র' প্রকাশিত হয়েছিল ; সেই 'চিঠির উত্তরে' ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'সওগাত'-এ নজরুলের এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।]

শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খান সাহেব !

আমাদের আশি বছরে নাকি স্রষ্টা ব্রহ্মার একদিন। আমি অত বড় স্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা তো বটে, তা আমার সে সৃষ্টির পরিসর যত ক্ষুদ্রই হোক। কাজেই আমারও একটা

দিন অন্তত তিনটে বছরের কম যে নয়, তা অন্য কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক, আপনি নিশ্চয়ই করবেন।

আপনার ১৯২৫ সালের লেখা চিঠির উত্তর দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন। এমনও হতে পারে, ১৯২৭-এর সাথে সাথে হয়তো বা আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, তাই আমিও আমার অজ্ঞাতে কোনো অনির্দেশের ইঙ্গিতে আমার শেষ বলা বলে যাচ্ছি আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগে। কেননা, আমি এই তিন বছরের মধ্যে কারুর চিঠির উত্তর দিয়েছি, এত বড় বদনাম আমার শত্রুতেও দিতে পারবে না—বন্ধুরা তো নয়ই। অবশ্য আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে—এ সুসংবাদটা উপভোগ করবার মতো সৎসাহস আমার নেই, বিশ্বাসও হয়তো করিনে ; কিন্তু আমারই স্বজাতি অর্থাৎ কবি জাতীয় অনেকেই এ বিশ্বাস করেন এবং আমিও যাতে বিশ্বাস করি তার জন্যে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণেই করছেন। কিন্তু আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা যে নিশ্বাস মোচন করেন, তা হ্রস্ব নয় এবং সে নিশ্বাস বিশ্বাসীরও নয় ! হতভাগা আমি, তাঁদের এই আমার প্রতি অতি মনোযোগ নাকি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনে—মন্দ লোকে এমন অভিযোগও করেছে তাঁদের দরবারে।

লোকে বললেও আমি মনে করতে ব্যথা পাই যে, তাঁরা আমার শত্রু। কারণ একদিন তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আজ যদি তাঁরা সত্য সত্যই আমার মৃত্যু কামনা করেন, তবে তো আমার মঙ্গলের জন্যই, এ আমি আমার সকল হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি। আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি—তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যত বেশিই পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে ওঠে, তা-ও আমি ভালো করেই জানি। তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি—ভালোবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চিররহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধুলোর নিচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সাথে প্রাণ ভরে যেন কাঁদতে পাই !

কিন্তু এ তো আপনার চিঠির উত্তর হচ্ছে না। দেখুন, চিঠি না লিখতে লিখতে চিঠি লেখার কায়দাটা গেছি ভুলে। তাতে করে কিন্তু লাভ হয়েছে অনেক। যদিও চোখ-কান বুঁজে উত্তর দিয়ে ফেলি কারুর চিঠির, সে উত্তর পড়ে তাঁর প্রত্যুত্তর দেবার মতো উৎসাহ বা প্রবৃত্তির ইতি ঐখানেই হয়ে যায়। কেননা, সেটা তার চিঠির উত্তর ছাড়া আর সব কিছুই হয়। এ-বিষয়ে ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য নিতে পারেন। সুতরাং এটাও যদি আপনার চিঠির উত্তর না হয়ে আর কিছু হয়, তবে সেটা আপনার অদৃষ্টের দোষ নয়, আমার হাতের অখ্যাতি।

আমাদের দেখা না হলেও শোনার ত্রুটি কোনো পক্ষ থেকেই ঘটেনি দেখছি। আপনাকে চিনি, আপনি আমায় যতটুকু চেনেন তার চেয়েও বেশি করে ; কিন্তু জানতে যে আজো পারলাম না, তার জন্য অভিযোগ আমার অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাকে করব বলুন। এতদিন ধরে বাংলার এত জায়গা ঘুরেও যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল না, তখন আর যে হবে সে আশা রাখিনে। বিশেষ করে—আজ যখন ক্রমেই নিজেকে জানাশোনার আড়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ ভালোই হয়েছে—অন্তত আপনার দিক থেকে। আমার দিকের ক্ষতিটাকে আমি সইতে পারব এই আনন্দে যে, আপনার এত শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয়েছে বলে দুঃখ করবার সুযোগ আপনাকে দিলাম না। এ আমার বিনয় নয় ; আমি নিজে অনুভব করেছি যে, আমায় শুনে যাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন, দেখে তাঁরা তাঁদের সে শ্রদ্ধা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করছি, কাছ থেকে যাঁদের কেবল ব্যথাই দিলাম, দূরে গিয়ে অন্তত তাঁদের সে দুঃখ ভুলবার অবসর যদি না দিই, তবে মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা সত্য নয়।

তাছাড়া নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় কলঙ্ক নেই, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে। দূরে থেকে চাঁদ চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু মৃত চন্দ্রলোকে গিয়ে কেউ খুশি হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বাতায়ন দিয়ে যে-সূর্যালোক ঘরে আসে তা আলো দেয় কিন্তু চোখে দেখার সূর্য দগ্ধ করে। চন্দ্র-সূর্যকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু তাঁদের পৃথিবী-দর্শনের কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ভালোই হয়েছে ভাই, কাছে গেলে হয়তো আমার কলঙ্কটাই বড় হয়ে দেখা দিত।

তারপর শ্রদ্ধার কথা। ওদিক দিয়ে আপনার জিতে যাবার কোনো আশা নেই, বন্ধু। শ্রদ্ধা যদি ওজন করা যেত, তাহলে আমাদের দেশের একজন প্রবীণ সম্পাদক—যিনি মানুষের দোষগুণ বানিয়ার মতো করে কড়ায়-গণ্ডায় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাছে গিয়েই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যেত ! গ্রহের ফেরে তার কাঁচিপাকি ওজনের ফের আমার পক্ষে কোনোদিনই অনুকূল নয় ; তা সত্ত্বেও আপনিই হারতেন, এ আমি জোর করে বলতে পারি।

হঠাৎ মুদির প্রসঙ্গটা এসে পড়বার কারণ আছে, বন্ধু ! জানেন তো, আমরা কানাকড়ির খরিদ্দার। কাজেই ওজনে এতটুকু কম হতে দেখলে প্রাণটা ছ্যাঁক করে ওঠে। মুদিওয়ালার ওতে লাভ কতটুকু জানিনে, কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা ছাড়া কেউ বুঝবে না ; —মুদিওয়ালা তো নয়ই। তবু মুদিওয়ালাকে চুল-দাঁড়ি ধরতে দেখলে একটু ভরসা হয় যে, চোখের সামনে অতটা ঠকাতে তার বাধবে ; কিন্তু তার পাঁচসিকে মাইনের নোংরা চাকরগুলো যখন দাঁড়ি-পাল্লার মালিক হয়ে বসে, তখন আর কোনো আশা থাকে না। আগেই বলেছি, আমরা দরিদ্র খরিদদার। থাকত বড় বড় মিঞাদের মতো সহায়-সম্বল, তাহলে এ অভিযোগ করতাম না।

পায়াভারি লোকের ভারি সুবিধে। তা সে পায়াভারি পায়ে ফাইলেরিয়া গোদ হয়েই হোক, বা ভারগুণেই হোক। এঁদের তুলতে হয় কাঁধে করে, আর কাছে যেতে হয় মাথাটা ভুঁই-সমান নিচু করে। ব্যবসা যারা বোঝে, তারা অন্য দোকানির বড় খদ্দেরকে হিংসা ও

তজ্জনিত ঘৃণা যতই করুক, তাঁকে নিজেদের দোকানে ভিড়াতে তার দোকানের সবটুকু তেল তাঁর ভারি পায়ে খরচ করতে তার এতটুকু বাধে না। দরকার হলে তার পুত্র ছোটে তেলের টিন ঘাড়ে করে, সাঁতরে পার হয় রূপনারায়ণ নদ, তাঁর ভারি পায়ে ঢালে তেল—তা সে পা যতোই কেন ঘানি-গাছের মতো অবিচলিত থাক। সাথে সে ভাঁড় ও স্তুতিগাইয়ে নিয়ে যেতেও ভোলে না।

যাক, এখন এসব বাজে কথা। অনেক কথার উত্তর দিতে হবে।

আমি আপনার মতো অসঙ্কোচে 'তুমি' বলতে পারলাম না বলে ক্ষুণ্ণ হবেন না যেন। আমি একে পাড়াগেঁয়ে স্কুল-পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরি নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না। (পেটে বোমা মারার উপামাটা দিলাম না স্পেশাল ট্রিবিউনালের ভয়ে।) যদি বা 'খাজা' বা ইবরাহিম খানকে 'তুমি' বলতে পারতাম, কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারে পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে। আরে বাপ? স্কুলের হেড মাস্টারের চেহারা মনে করতেই আমার আজো জলতেষ্টা পেয়ে যায়, আর কলেজের প্রিন্সিপাল, সে না জানি আরো কত ভীষণ! আমার স্কুলজীবনে আমি কখনও ক্লাসে বসে পড়েছি, এত বড় অপবাদ আমার চেয়ে এক নম্বর কম পেয়ে যে 'লাস্ট বয়' হয়ে যেত—সেও দিতে পারবে না। হাই বেঞ্চের উচ্চাসন হতে আমার চরণ কোনোদিনই টলেনি, ওর সাথে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেছিল। তাই হয়তো আজো বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হয়, মাস্টারমশাই হাইবেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি, তাকে আপনি সাধ্যসাধনা করেও 'তুমি' বলাতে পারবেন না, এ স্থির নিশ্চিত।

এইবার পালা শুরু।

বাংলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কিনা জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনোদিন অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের-আখ্যায় বিভূষিত হবার মতো বড় তো আমি হইনি। অথচ হাফেজ-খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষের সাথে কাফেরের পঙক্তিতে উঠে গেলাম।

হিন্দু-লেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহ—যে নিবিড় প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দু-সভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদের আঙুল দিয়ে গোনা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিব না। তাছাড়া আজকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান

এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ—আমি যত বেশি অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল—এটা অস্বীকার করিনে ; কিন্তু তাই বলে মুসলমানেরা যে আমায় কদর করেননি, এটাও ঠিক নয়। যাঁরা দেশের সত্যিকার প্রাণ, সেই তরুণ মুসলিম বন্ধুরা আমায় যে ভালোবাসা, যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে নিন্দার কাঁটা বহু নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রবীণদের আশীর্বাদ—মাথার মণি হয়তো পাইনি, কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা, বুকের মালা আমি পেয়েছি। আমার ক্ষতির ক্ষেতে ফুলের ফসল ফলেছে।

এই তরুণদেরই নেতা ইব্রাহীম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর, ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেন। আর এই বন্ধুরাই তো আমায় বড় করেছেন, এই তরুণদের বুকে আমার জন্য আসন পেতে দিয়েছেন—প্রীতির আসন ! ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুরে যারা তাদের গলার মালা দিয়ে আমায় বরণ করল, তারা এই তরুণদেরই দল। অবশ্য এই তরুণের জাত ছিল না। এরা ছিল সকল জাতির।

সকলকে জাগাবার কাজে আমায় আহ্বান করেছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের আহ্বানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি—সে শুধু লিখে তা নয়,—আমার জীবনী ও কর্ম-শক্তি দিয়েও।

আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—লিখেছি, বলেছি, চারণের মতো পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোনোদিন হয়েছি, এ-বদনাম আর যে-ই দিক, আপনি দেবেন না বোধ হয়। আমার এই দেশসেবার সমাজসেবার 'অপরাধের' জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজির আমার উপর দৃষ্টি অতি মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই গেল বাজেয়াফত হয়ে। এই সেদিনও পুলিশ আবার জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব-প্রকাশিত 'রুদ্র-মঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্য ঋষি হুইটম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি :

'Behold, I do not give a little charity.
When I give, I give myself.'

তাহলে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভুল করবেন না। ...

আপনি সমাজকে 'পতিত, দয়ার পাত্র' বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত demoralized মনে করি—কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ-সমাজ সর্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে ; এর দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয়তো হাসছেন, কিন্তু আমি তো জানি, আমার শির লক্ষ্য করে কত ইট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভালো করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পেকে পচে ওঠে তখন রুগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়তো কখন আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়ে ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রুগীরও খুশি হয়ে উঠবার কথা। কিন্তু বেচারি 'অবিশ্বাসী' অস্ত্রচিকিৎসক তা বিশ্বাস করে না। সে বেশ করে তার ধারালো ছুরি চালায় সে-ঘায়ে ; রোগী চেঁচায়, হাত পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্তব্য করে যায়। কারণ সে জানে, আজ রুগী গালি দিচ্ছে, দু-দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা করে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে ; তা সইবার মতো শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ-সেবা হয়তো চলবে না। এই জন্যই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে। এ-সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারি নয়। দারিদ্র্য সইবার মতো পেট, আর মার সইবার মতো পিঠ যদি কারুর থাকে, তো এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা-ব-তাজা'র গান।

আপনি হয়তো আমায় এদেরই অগ্রনায়ক হতে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আপনার মতো আমিও ভাবি, আজো ভাবি যে, কে সে ভাগ্যবান এদের অগ্রনায়ক। আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান আজো আসেনি। আমি অনেকবার বলেছি, আজ বলছি—সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি, কিন্তু দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী—তাঁরই আগমনী-গান। আমি তাঁরই অগ্রপথিক তূর্যবাদক। আমার মনে হয়, সেই ভাগ্যবান পুরুষেরই ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে চলছি—জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার উপর, তবু আমি তাঁর দেওয়া তূর্য বাজিয়ে চলছি। এ-বিশ্বাস কোথা হতে কি করে যে আমার মাঝে এল, তা আমি নিজেই জানিনে। আমার শুধু মনে হয়, কার যেন আদেশ—কার যেন ইঙ্গিত আমার বেদনার রন্ধ্রপথে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাঁর আসার পদধ্বনি আমি নিরন্তর শুনছি আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আক্ষেপে।

তবে, এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের, আমাদের যে-কারুর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।

আমি এতদিন তাঁকে খুঁজেছি আমার ঊর্ধ্বে। তাঁকে আমারই মাঝে খুঁজতেও হয়তো চেয়েছি। দেখা তাঁর পেয়েছি এমন কথা বলব না, তবে এ-কথা বলতেও আমার আজ দ্বিধা নেই যে, আমি ক্রমেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছি। এমনও মনে হয়েছে কতদিন, যেন আর একটু হাত বাড়ালেই তাঁকে ধরতে পারি।

আপনার 'হাত বাড়াবে কি?' কথাটা আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ-হতাশ্বাসে সেই নিশ্চিত শান্তি—যার ধ্যানলোকে বসে আমি

তপস্যাপ্রোজ্জ্বল নেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব। এ-শান্তি আমার এ জীবনে পাব কিনা জানি না ; যদি পাই—আপনার জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর দিয়ে যাব সেদিন।

আপনার কয়েকটি মৃদু অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব এবার।

আপনি আমার যে-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন, সে-দায়িত্ব আমার সত্যিকার কাব্য-সৃষ্টির, না সমাজ-সংস্কারের? আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে।

'এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুণ্ন থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে'—এমনতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বলগা কষে কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের পরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হল—এ কথা মানতে আর্টিস্টের হয়তো কষ্টই হয়, প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। জানি, ক্লাসিকের কেশো রোগীরা এতে উঠবেন হাড়ে হাড়ে চটে, তাঁদের কলম হয়ে উঠবে বাঁশ। এরই মধ্যে হয়েও উঠেছে তাই। তবু আজ এ-কথা জোর গলায় বলতে হবে নবীনপন্থীদের। এই সমালোচকদের নিষেধের বেড়া যাঁরাই ডিঙিয়েছেন, তাঁদেরই এঁদের গোদা পায়ের লাথি খেতে হয়েছে, প্রথম শ্রেণি হতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে নেমে যেতে হয়েছে।

বেদনা-সুন্দরের পূজা যাঁরাই করেছেন, তাঁদের চিরকাল একদল লোক হুজুগে বলে নিন্দা করেছে। আর, এরাই দলে ভারি। এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুর-তাল-লয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে হল্লা করে যে, ও কান্না হাততালি দেবার মতো কান্না হল না বাপু, একটু আর্টিটিস্টকভাবে নেচে নেচে কাঁদো ! সকল সমালোচনার উপরে যে-বেদনা, তাকে নিয়েও আর্টশালারক্ষী—এই প্রাণহীন আনন্দ-গুণ্ডার কুশ্রী চিৎকারে হুইটম্যানের মতো ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল।

আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো-গেলা অবস্থা। 'সর্বহারা' লিখলে বলে—কাব্য হল না ; 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট' লিখলে বলে—ও হল ন্যাকামি ! ও নিরর্থক শব্দ-ঝঙ্কার দিয়ে লাভ হবে কি? ও না লিখলে কার কি ক্ষতি হত?

'লিরিক' নাকি 'লভ' এবং 'ওয়ার' নিয়ে। আমাদের দেশে যুদ্ধ নাই (হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ ছাড়া) ; কাজেই মানুষের নির্যাতন দেখে তার সেই মর্মব্যথার গান গাইলে এখানে হয় তা 'বীভৎস বিদ্রোহ-রস'। ওটা দিয়ে নাকি মানুষের প্রশংসা সহজলভ্য হয় বলেই আজকালকার লেখকেরা রসের চর্চা করে।

'আমার লেখা কাব্য হচ্ছে না, আমি কবি নই'—এ বদনাম সহ্য করতে হয়তো কোনো কবিই পারে না। কাজেই যারা করছিল মানুষের বেদনার পূজা, তারা এখন করতে চাচ্ছে প্রাণহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি। এমন একটা যুগ ছিল—সে সত্যযুগই হবে হয়তো—যখন মানুষের দুঃখ আজকের মতো এত বিপুল হয়ে ওঠেনি। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র মানুষ নিপীড়িত হতে লাগল, অমনি সৃষ্টি হল বেদনার মহাকাব্য—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি। আর তাতে সমাজের আজকালকার বেঁড়ে-ওস্তাদ সমালোচকদের

তথাকথিত 'বীভৎস বিদ্রোহ বা রুদ্র রসের' প্রাধান্য থাকলেও—তা কাব্য হয়নি, এমন কথা কেউ বলবে না।

এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্যস্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়, পুশকিন, দস্তয়ভসকি, হুইটম্যান, গোর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে ; এই তো আমাদের সাধনা।

দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়েই আমি বেদনার গান গেয়েছি,—সে-গানে হয়তো রূপ-রঙ ফুটে ওঠেনি আমি ভালো ইংরেজ নই বলে ; কিন্তু সেই বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মতো নীচতা মানুষের কেমন করে আসে। অথচ এই সব গালাগালির বিপক্ষে কোনো প্রতিবাদও তো হতে দেখিনি।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে, শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণে এতটা বিচলিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার দিনের সূর্য ওদের শরনিক্ষেপে মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বে না—আমার এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য দুঃখও করিনে। অন্তত আমি তো জানি, আমার এই তো চলার আরম্ভ, আমার সাহিত্যিক জীবনের এই তো সবেমাত্র সেদিন শুরু। আজই আমি আমার পথের দাবি ছাড়ব কেন? ওদের রাজপথে ওরা চলতে যদি না-ই দেয়, কাঁটার পথেই চলব সমস্ত মারকে সহ্য করে। অন্তত পথের মাঝ পর্যন্ত তো যাই। আমার বনের রাখাল ভাইরা যে মালা দিয়ে আমায় সাজাল, সে-মালার অবমাননা-ই বা করব কেমন করে? ঠিক বলেছ বন্ধু, এবার তপস্যাই করব—পথে চলার তপস্যা।

'বিদ্রোহী'র জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক বলে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি। বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়তো আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝকমকানিটাকেই দেখাইনি—এই তো আমার অপরাধ। এরই জন্য তো আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি, এর দরকার ছিল মনে করেই।

যাক। আগেই বলেছি, এ কুম্ভকর্ণ-মার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে। একদল প্রগতিশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না হলে এর চেতনা আসবে না। কুম্ভকর্ণের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বা চিমটি কেটে এর ঘুম ভাঙাবার যেসব পলিসির উল্লেখ আছে, তা একেবারে মোলায়েম নয়। সেই পলিসিই একবার একটু পরখ করে দেখুকই না ছেলেরা ! এতে কি আর এমন হবে ! আপনি বলবেন, কুম্ভকর্ণ না হয় জাগল ভায়া,

কিন্তু জেগে সে যে রকম 'হাঁ'টা করবে, সে 'হাঁ' তো সংকীর্ণ নয়, তখন ! আমি বলি কি, তখন কুম্ভকর্ণ তাদেরই ধরে 'জলপানি' করবে, যারা তার ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল।

এতেই তো মরেছে, নাহয় আরো দু-দশটা মরবে ! আপনি বলবেন, ভয় তো ঐখানেই, বন্ধু : বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে এগোয় কে ? আমি বলি, সে দুঃসাহস যদি আমাদের কারুর না থাকে, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে সকলে 'আসহাব কাহাফে'র মতো রোজ-কিয়ামত তক ঘুমোতে পারেন। সমাজকে জাগাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিন ! কারুর পান থেকে এতটুকু চুন খসবে না, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না ; তেল-কুচকুচে নাদুস-নুদুস ভুঁড়িও বাড়বে এবং সমাজও সাথে সাথে জাগতে থাকবে—এ আশা আলেমসমাজ করতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে।

আমার কথাগুলো 'মরিয়া হইয়া'র মতো শুনাবে, কিন্তু বড় দুঃখে দেখে-শুনে তেতো-বিরক্ত হয়ে এসব বলতে হচ্ছে। তাই তো বলি যে, 'বাবা ! তোকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। মরতে হয় তো এদেরই একজনের হাতে মর বেশ একটু হাতাহাতি করে ; তাতে সুনাম আছে। কিন্তু ঐ হনুমানের হাতে মরিস কেন ? হনুমানের হাতে মরার চেয়ে বরং কুম্ভকর্ণকে জাগাতে গিয়ে মরা ঢের ভালো।' কথাগুলো যখন বলি, তখন লোকে হাততালি দেয়, 'আল্লাহু আকবর', 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিও করে ; কিন্তু তারপর আর তাদের খবর পাইনে।

আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নূতন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নূতন করে গড়ার আশাতেই তো যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি। আমিও জানি, তৈমুর, নাদির সংস্কারপ্রয়াসী হয়ে ভাঙতে আসেনি, ওদের কাছে নতুন-পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙেছিল দিল্লি-আগ্রা-ময়ূরাসন-তাজমহল গড়ে তোলার জন্য। আমার বিদ্রোহ 'যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ববন্ধন-মুক্তের—পূর্ণতম স্রষ্টার।

আপনার 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয়তো। ওর মানে কি মুসলমানের-সৃষ্ট-সাহিত্য না মুসলিম-ভাবাপন্ন সাহিত্য ? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্যরচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোনো ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি ; গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি তো স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলামধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমার গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে-

গানের সুর। উঠতে পারেও না। তাহলে তা কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান, তা আমি বুঝতে পারি—কিন্তু সমাজ যা চায়, তা সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখনও—

'আল্লা আল্লা বলো রে ভাই নবি করো সার।
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভবনদীর পার॥'

রীতিমতো কাব্য। বুঝবার কোন কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং নবিকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হল, মাজাও দুলল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল ! যাক, বাঁচা গেল—কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য। সে বেচারি ভবনদীর এপারেই রইল পড়ে। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে—মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা, তবে ছন্দ রেখে দোলাও, পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি—আর এরাই শতকরা নিরানব্বই জন—তারা বলে, কমলবন, টমলবন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয়, সেও-ভি আচ্ছা—কিন্তু একেবারে ভবনদীর পারঘাটায় লাগাও নৌকা। এ-অবস্থায় কি করব বলতে পারেন ? আমি 'হুজ্জতুল ইসলাম' লিখব, না সত্যিকার কাব্য লিখব ?

এরা যে শুধু হুজ্জতুল ইসলামই পড়ে, এ আমি বলব না ; রসজ্ঞানও এদের অপরিমিত। আমি দেখেছি, এরা দল বেঁধে পড়ছে—

'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।'

অথবা—

'লাখে লাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার।
শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার॥'

আর এই কাব্যের চরণ পড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে। উম্মর উম্মিয়ার প্রশংসায় রচিত—

'কাগজের ঢাল মিঞার তালপাতার খাঁড়া
আর লগির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল্ হামারা ঘোড়া।'

পড়তে পড়তে আনন্দে গদগদ হয়ে উঠেছে।

বিদ্রূপ আমি করছিনে, বন্ধু এ আমার চোখের জল-মেশানো হাসির শিলাবৃষ্টি। সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তাহলে আর মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি। কিন্তু আমার এ ভালোবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কিনা কশাঘাত করেছেন সমাজকে ;—তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই। সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়তো ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দুজাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।

আমি জানি যে, বাংলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।

হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে। কিন্তু ইসলামের 'সভ্যতা-শাস্ত্র-ইতিহাস' এ-সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কি?

আমার মনে হয়, আমাদের নূতন সাহিত্যব্রতীদল এর এক-একটা দিক নিয়ে রিসার্চ ও আলোচনার দায়িত্ব নিলে ভাল হয়। আগেই বলেছি, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার পূর্ণ শান্তি কোনোদিন পাইনি। যদি পাই, সেদিন আপনার এই উপদেশ বা অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা যেন করতে পারি—তাই প্রার্থনা করছি আজ।

আবার বলি, যাঁরা মনে করেন—আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ-ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—তাকে ইসলাম বলে না-মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ-ভুল যাঁরা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে—এ ছাড়া আমার কি বলবার থাকতে পারে?

আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে, হাফেজ-রুমিকে শ্রদ্ধা করেন—এ-ও আমার মনে হয় না। আমি তো আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদেরে। এঁরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তাহলে মুসলমান কবি দিয়ে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি কোনোকালেই সম্ভব হবে না—জৈগুণ বিবির পুঁথি ছাড়া।

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাংলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরেজি সাহিত্য হতে গ্রিক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায় হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুসলমানি শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্যে অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনেশুনেই তা করেছি।

কিন্তু বন্ধু, এ কর্তব্য কি একা আমারই? আমার শক্তি সম্বন্ধে আপনার যেমন বিশ্বাস, আপনার উপরও আমার সেই একই বিশ্বাস—একই শ্রদ্ধা। আপনিও 'কামাল পাশা' না লিখে এই হতভাগ্য মুসলমানদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করুন না কেন? আমার মনে হয়, ওদিকে আপনার জুড়ি নেই অন্তত আমাদের মধ্যে কেউ। 'কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি, কিন্তু তার চেয়েও দরকার—আমাদের চোখের

সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্রাজেডি তুলে ধরা। কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখকের আমাদের অভাব নেই। নাটক-লিখিয়ের অভাবও আপনাকে দিয়ে পূরণ হতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব কথাসাহিত্যিকের। এর তো কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে। অথচ কথাসাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না। অনুবাদকের দিক দিয়েও আমরা সবচেয়ে পিছনে। সংগীত, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি ফাইন আর্টের কথা না-ই বললাম।

এত অভাবের কোনো অভাব পূর্ণ করব আমি একা, বন্ধু! অবশ্য একাই হাত দিয়েছি অনেকগুলি কাজে—তাতে করে হয়তো কোনোটাই ভালো করে হচ্ছে না।

জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।

আপনার এত সুন্দর, এমন সুলিখিত চিঠির কি বিশ্রী করেই না উত্তর দিলাম। ব্যথা যদি দিয়ে থাকি, আমার গুছিয়ে বলতে না পারার দরুন, তাহলে আমি ক্ষমা না চাইলেও আপনি ক্ষমা করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।

আপনার বিরাট আশা, ক্ষুদ্র আমার মাঝে পূর্ণ যদি না-ই হয়, তবে তা আমাদেরই কারুর মাঝে পূর্ণত্ব লাভ করুক, আমি কায়মনে এই প্রার্থনা করি।

—কাজী নজরুল ইসলাম

ষোলো

[১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারি ময়মনসিংহ শহরে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক-শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ; সেই উপলক্ষে কবি কৃষ্ণনগর থেকে এই পত্রখানি লেখেন। হেমন্তকুমার সরকার তা সম্মেলনে পাঠ করেন। লেখাটি 'লাঙল'-এর প্রথম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যায় ৭ই মাঘ, ১৩৩২ প্রকাশিত হয়।]

আমার প্রিয় ময়মনসিংহের প্রজা ও শ্রমিক ভ্রাতৃবৃন্দ!

আপনারা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, আপনাদের এই নব-জাগরিত প্রাণের স্পর্শে নিজেকে পবিত্র করিয়া লইব, ধন্য হইব। কিন্তু দৈব প্রতিকূল হওয়ায় আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমার শরীর আজো রীতিমতো দুর্বল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার মতো শক্তি আমার একেবারেই নাই। আশা করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা সকলে ক্ষমা করিবেন।

এই ময়মনসিংহ আমার কাছে নূতন নহে। এই ময়মনসিংহ জেলার কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী। আমার বাল্যকালের অনেকগুলি দিন ইহার বুকে কাটিয়া গিয়াছে।

এইখানে থাকিয়া আমি কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া গিয়াছি। আজো আমার মনে সেই সব প্রিয় স্মৃতি উজ্জ্বল, ভাস্বর হইয়া জ্বলিতেছে। এই আশা করিয়াছিলাম, আমার সেই শৈশব-চেনা ভূমির পবিত্র মাটি মাথায় লইয়া ধন্য হইব, উদার হৃদয় ময়মনসিংহ জেলাবাসীর প্রাণের পরশমণির স্পর্শে আমার লৌহ-প্রাণকে কাঞ্চনময় করিয়া তুলিব ; কিন্তু তাহা হইল না, দুরদৃষ্ট আমার। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ দিন দেন, আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আপনাদের গফরগাঁওয়ের নিখিল বঙ্গীয় প্রজাসম্মিলনীতে যোগদান করিয়া ও আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইব।

আপনারাই দেশের প্রাণ, দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যত ! মাটির মায়ায় আপনাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই ! রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিজলে ভিজিয়া দিন নাই—রাত নাই—সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাই তো এই মাটির পৃথিবীকে প্রিয় সন্তানের মতো লালন-পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। আপনাদের মাঠের এক কোদাল মাটি লইলে আপনারা আততায়ীর হয় শির নেন, কিংবা তাকে শির দেন—এত ভালোবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর যে শস্যশ্যামল মাঠ—আপনারা আমার কৃষাণ ভাইরা ছাড়া অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার এই কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষায় আকাশ ভরিয়া বাদল নামে, তাদের বুকের স্নেহধারার মতোই মাঠ-ঘাট পানিতে বন্যায় সয়লাব হইয়া যায়, আমার এই কৃষাণ ভাইদের আদর সোহাগে মাঠ-ঘাট ফুলে ফলে ফসলে শ্যাম-সবুজ হইয়া ওঠে, আমার কৃষাণ ভাইদের বধূদের প্রার্থনায় কাঁচা ধান সোনার রঙে রাঙিয়ে ওঠে—এই মাঠকে জিজ্ঞাসা করো, মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে, এ মাঠ চাষার এ মাটি চাষার, এর ফুল-ফল কৃষক-বধূর।

আর আমার শ্রমিক ভাইরা, যাহারা আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিয়া হুজুরদের অট্টালিকা লালে লাল করিয়া তুলিতেছে, যাহাদের অস্থির মজ্জা ছাঁচে ঢালিয়া রৌপ্য মুদ্রা তৈরি হইতেছে, যাহাদের চোখের জল সাগরে পড়িয়া মুক্তা মাণিক ফলাইতেছে,— তাহারা অবহেলিত, নিষ্পেষিত, বুভুক্ষু। তাহাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ক্ষুধায় পেট পুরিয়া আহার পায় না ; পরনে বস্ত্র নাই।

হায় রে স্বার্থ ! হায় রে লোভী দানব-প্রকৃতির মানব ! আজ কৃষাণের দুঃখে শ্রমিকের কাৎরানিতে আল্লার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। দিন আসিয়াছে, বহু যন্ত্রণা পাইয়াছ ভাই—এইবার তাহার প্রতিকারের ফেরেশতা, দেবতা আসিতেছেন। তোমাদের লাঙল, তোমাদের শাবল তাঁহার অস্ত্র, তোমাদের কুটির তাঁহার গৃহ। তোমাদের ছিন্ন মলিন বস্ত্র তাঁহার পতাকা। তোমরাই তাঁহার পিতামাতা। আমি আপনাদের মাঝে সেই অনাগত মহাপুরুষের শুভ আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনাদের নব-জাগরণকে সালাম করিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি, ঐ বুঝি নব দিনমণির উদয় হইল ! ইতি

—নজরুল ইসলাম

সতেরো

[হুগলি বাবুগঞ্জের শচীন করকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর
১০-২-২৬

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের শচীন ! তোর কোনো চিঠিও পাইনি, এলিও না। এলে খুব খুশি হতুম। আমার সব কথা প্রাণতোষের কাছে শুনবি।

মার্চে গীস্পতি আসবে—তখন অবশ্য আসিস। তুই নাকি খুব ভালো কবিতা লিখেছিস আরো কতকগুলো। আসবার সময় সবগুলো নিয়ে আসিস। ভুলিসনে যেন।

যে জোয়ালে গর্দান দিয়েছিস সেটার প্রতি যেন আসক্তি না জন্মে তোর—এই আমার বড় আশিস ! আমাদের সকলের স্নেহাশিস নে। ইতি—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
'কাজীদা'

আঠারো

[আনওয়ার হোসেনকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর
১লা মার্চ, ১৯২৬

ভাই !

... আমার স্বাস্থ্য ছিল অটুট, —জীবনে ডাক্তার দেখাইনি। এই আমার প্রথম অসুখ ভাই, বড্ড ভোগাচ্ছে। প্রায় সাত মাস ধরে ভুগছি জ্বরে। বড্ড জীবনীশক্তি কমে গেছে। বাইরে থেকে খুব দুর্বল হইনি। এতদিন সুস্থ হয়তো হয়ে উঠতাম কিন্তু অবসর বা বিশ্রাম পাচ্ছিনে জীবনে কিছুতেই। এই শরীর নিয়েই আবার বেরুব ৬ই মার্চ দিনাজপুরে। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট কন্ফারেন্স, সেখান থেকে মাদারিপুর Fishermen's Conference-এ attend করতে যাব। ওখান থেকে খুব সম্ভব ঢাকা যাব। যদি যাই দেখা হবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হচ্ছে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য। এত দুর্বল আমি এখনো যে ধৈর্য ধরে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারিনে। আমাদের বাঙালি-মুসলমানের সমাজ, নামাজ পড়ার সমাজ। যত রকম পাপ আছে করে যাও—তার জবাবদিহি করতে হয় না এ সমাজে,—কিন্তু নামাজ না পড়লে তার কৈফিয়ত তলব হয়। অথচ কোরানে ৯৯৯ জায়গায় জেহাদের কথা এবং ৩৩ জায়গায় সালাতের বা নামাজের কথা বলা হয়েছে।

আমার লেখার পূর্বে তেজ ইত্যাদির কথা,—আপনি কি আমার বর্তমান লেখাগুলো পড়েছেন? আমি জানি না—লেখা প্রাণহীন হচ্ছে কিনা ! হলেও আমি দুঃখিত নই।

আমি যার হাতের বাঁশি, সে যদি আমার না বাজায় তাতে আমার অভিযোগ করবার কিছুই নেই। কিন্তু আমি মনে করি—সত্য আমায় তেমন করেই বাজাচ্ছে, তার হাতের বাঁশি করে। আমার লেখার উদ্দামতা হয়তো কমে আসছে। —তার কারণ আমার সুরের পরিবর্তন হয়েছে। আপনি কি আমার 'সাম্যবাদী' পড়েছেন ? তা হলে বুঝবেন সব কথা। আপনার অভিযোগ আর যার হোক না কেন, সাহিত্যিকের নয়—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আমায় অধিকতর উৎসাহ দিচ্ছেন। তাছাড়া আমি আমার মনের কুঞ্জে আমার বংশীবাদকের বিদায়-পদধ্বনি আজো শুনতে পাইনি। তবে তার নবীনতর সুর শুনছি। সেই সুরের আভাস আমার 'সাম্যবাদী'তে পাবেন। বাংলা সাহিত্যে আমার স্থান সম্বন্ধে আমি কোনোদিন চিন্তা করিনি। এর জন্য লোভ নেই আমার। সময়ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমালোচক। যদি উপযুক্ত হই, একটা ছালা-টালা পাব হয়তো। ...

—নজরুল ইসলাম

উনিশ

[শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। মাসিক 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসু। নজরুলের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা 'মাধবী-প্রলাপ' ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'কালিকলমে' প্রকাশিত হয়]

কৃষ্ণনগর
১০-৪-১৯২৬

প্রিয় শৈলজা !

কন্‌ফারেন্সের হিড়িকে মরবার অবসর নেই। কনফারেন্সের আর মাত্র একমাস বাকি। হেমন্তদা আর আমি সব করছি এ যজ্ঞের। কাজেই লেখাটা শেষ করতে পারিনি এতদিন। রেগো না লক্ষ্মীটি। আমি তোমাদের লেখা দিতে না পেরে বড় লজ্জিত আছি। 'মাধবী-প্রলাপ' পাঠালুম। বৈশাখেই দিও। দরকার হলে অদলবদল করে নিও কথা—অবশ্য ছন্দ রক্ষা করে। আমি এবার কলকাতায় গিয়েছিলুম—আল্লা ... আর ভগবান, ... এর মারামারির দরুন তোমার কাছে যেতে পারিনি। আমি ২/৩ দিন পরে শ্রীহট্ট যুবক সম্মিলনীতে যোগদান করতে যাচ্ছি। ওখান থেকে ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

আজ ডাকের সময় যায়, বেশি লিখব না। ... মুরলীদা ও প্রেমেনকে ভালোবাসা দিও। তোমরা নিও।

—নজরুল

বিশ

[বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে লিখিত। ১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বুলবুল' পত্রিকায় 'চিঠি' শিরোনামে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ; তার শেষে পাদটীকায় বলা হয়েছিল : 'চিঠিখানি কবি নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত কোনো বালিকাকে কয়েক বৎসর আগে লিখেছেন।']

কৃষ্ণনগর
১১-৮-২৬
সকাল

স্নেহের নাহার,

কাল রাত্তিরে ফিরেছি কলকাতা হতে। চট্টগ্রাম হতে এসেই কলকাতা গেছলাম। এসেই পড়লাম তোমার দ্বিতীয় চিঠি—অবশ্য তোমার ভাবীকে লেখা। আমি যেদিন তোমার প্রথম চিঠি পাই, সেদিনই—তখনই কলকাতা যেতে হয় মনে করেছিলাম কলকাতা গিয়ে উত্তর দেবো। কিন্তু কলকাতার কোলাহলের মধ্যে এমনই বিস্মৃত হয়েছিলাম নিজেকে যে কিছুতেই উত্তর দেবার অবসর করে নিতে পারিনি। তাছাড়া ভাই, তুমি অত কথা জানতে চেয়েছ, শুনতে চেয়েছ, যে কলকাতার হট্টগোলের মধ্যে সে বলা যেন কিছুতেই আসত না। আমার বাণী হট্টগোলকে এখন রীতিমতো ভয় করে, মূক হয়ে যায় ভীরু বাণী আমার—ঐ কোলাহলের অনবকাশের মাঝে। চিঠি দিতে দেরি হলো বলে তুমি রাগ কোরো না ভাই লক্ষ্মীটি। এবার হতে ঠিক সময়ে দেবো, দেখে নিও। কেমন? বাহারটাও না জানি কতো রাগ করেছে, কী ভাবছে। আর তোমার তো কথাই নেই, ছেলেমানুষ তুমি, পড়তে না পেয়ে তুমি এখনো কাঁদো! বাহার যেন একটু চাপা, আর তুমি খুব অভিমানী না? কী যে করেছ তোমরা দুটি ভাই-বোনে যে এসে অবধি মনে হচ্ছে যেন কোথায় কোনো নিকটতম আত্মীয়কে আমি ছেড়ে এসেছি। মনে সদাসর্বদা একটা বেদনার উদ্বেগ লেগেই রয়েছে। অদ্ভুত রহস্যভরা এই মানুষের মন! রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যার, সে-ই কখন পথের সম্বন্ধকে সকল হৃদয় দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার করে নেয়। ঘরের সম্বন্ধটা রক্তমাংসের, দেহের কিন্তু পথের সম্বন্ধটা হৃদয়ের অন্তরতম-জনার। তাই ঘরের যারা, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, মেনে চলি, কিন্তু বাইরের আমার-জনকে ভালোবাসি, তাকে না-মানার দুঃখ দিই। ঘরের টান কর্তব্যের, বাইরের টান প্রীতির—মাধুর্যের। সকল মানুষের মনে সকল কালের এই বাঁধনহারা মানুষটি ঘরের আঙিনা পেরিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। যে নীড়ে জন্মেছে এই পলাতক, সেই নীড়কেই সে অস্বীকার করেছে সর্বপ্রথম উড়তে শিখেই! আকাশ আলো কানন ফুল, এমনি সব না-চেনা জনেরা হয়ে ওঠে তার অন্তরতম। বিশেষ করে গানের পাখি যারা, তারা চিরকেলে নিরুদ্দেশ দেশের পথিক। কোকিল বাসা বাঁধে না, 'বৌ কথা কও'-এর বাসার উদ্দেশ্য আজো মিলল না, 'উহু উহু চোখ গেল' পাখির নীড়ের সন্ধান কেউ পেল না! ওদের আসা-যাওয়া একটা রহস্যের মতো। ওরা যেন স্বর্গের পাখি,

ওদের যেন পা নেই, ধূলার পৃথিবীতে যেন ওরা বসবে না, ওরা যেন ভেসে-আসা গান। তাই ওরা অজানা ব্যথার আনন্দে পাগল হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দেশে বিদেশে, বসন্ত-আসা বনে, ফুল-ফোটা কাননে, গন্ধ-উদাস চমনে। ওরা যেন স্বর্গের প্রতিধ্বনির টুকরার—আনন্দের উল্কাপিণ্ড ! সমাজ এদের নিন্দা করেছে, নীতিবাগীশ বায়স তার কুৎসিত দেহ—ততোধিক কুৎসিত কণ্ঠ নিয়ে এর ঘোর প্রতিবাদ করেছে, এদের শিশুদের ঠুকরে 'নিকালো হিঁয়াসে' বলে তাড়িয়েছে, তবু আনন্দ দিয়েছে এই ঘর-না-মানা পতিতের দলই। নীড়-বাঁধা সামাজিক পাখিগুলি দিতে পারল না আনন্দ, আনতে পারল না স্বর্গের আভাস, সুরলোকের গান ...।

এত কথা বললাম কেন, জানো ? তোমাদের যে পেয়েছি এই আনন্দটাই আমায় এই কথা কওয়াচ্ছে, গান গাওয়াচ্ছে। বাইরের পাওয়া নয়, অন্তরের পাওয়া। গানের পাখি গান গায় খাবার পেয়ে নয় ; ফুল পেয়ে আলো পেয়ে সে গান গেয়ে ওঠে। মুকুল-আসা কুসুম-ফোটা বসন্তই পাখিকে গান-গাওয়ায়, ফল-পাকা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় নয়। তখনো পাখি হয়তো গায়, কিন্তু ফুল যে সে ফুটতে দেখেছিল, গন্ধ সে তার পেয়েছিল—গায় সে সেই আনন্দে, ফল পাকার লোলুপতায় নয়। ফুল ফুটলে পায় গান, কিন্তু ফল পাকলে পায় খিদে ; আমি পরিচয় করার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি মানুষের মাঝে, কিন্তু ফুল-ফোটা মন মেলে না ভাই, মেলে শুধু ফল-পাকার ক্ষুধাতুর মন। তোমাদের মধ্যে সেই ফুল-ফোটানো বসন্ত, গান-জাগানো আলো দেখেছি বলেই আমার এত আনন্দ, এত প্রকাশের ব্যাকুলতা। তোমাদের সাথে পরিচয় আমার কোনো প্রকার স্বার্থের নয়, কোনো দাবির নয়। ঢিল মেরে ফল পাড়ার অভ্যেস আমার ছেলেবেলায় ছিল, যখন ছিলাম ডাকাত, এখন আর নেই। ফুল যদি কোথাও ফোটে, আলো যদি কোথাও হাসে সেখানে আমায় গান গাওয়ায় পায়, গান গাই। সেই আলো, সেই ফুল পেয়েছিলাম এবার চট্টলায়, তাই গেয়েছি গান। ওর মাঝে শিশিরের করুণা যেটুকু, সেটুকু আমার আর কারুর নয়। যাক, কাজের কথাগুলো বলে নিই আগে।

আমায় এখনো ধরেনি, তার প্রমাণ এই চিঠি। তবে আমি ধরা দেওয়ার দিকে হয়তো এগোচ্ছি। ধরা পড়া আর ধরা দেওয়া এক নয়, তা হয়তো বোঝো। ধরা দিতে চাচ্ছি, নিজেই এগিয়ে চলেছি শত্রু-শিবিরের দিকে, এর রহস্য হয়তো বলতে পারি। এখন বলব না। অত বিপুল যে সমুদ্র, তারও জোয়ারভাটা আসে অহোরাত্রি। এই জোয়ার-ভাটা সমুদ্রেই খেলে, আর তার কাছাকাছি নদীতে ; বাঁধ-বাঁধা ডোবায়, পুকুরে জোয়ার-ভাটা খেলে না। মানুষের মন সমুদ্রের চেয়েও বিপুলতর। খেলবে না তাতে জোয়ার-ভাটা ! যদি না খেলে, তবে তা মানুষের মন নয়। ঐ শান-বাঁধানো ঘাট-ভরা পুকুরগুলোতে কাপড় কাঁচা চলে, ইচ্ছে হলে গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মরাও চলে, চলে না ওতে জাহাজ, দোলে না ওতে তরঙ্গদোলা, খেলে না ওতে জোয়ার-ভাটা ... আমি একবার অন্তরের পানে ফিরে চলতে চাই, যেখানে আমার গোপন সৃষ্টি-কুঞ্জ, যেখানে আমার অনন্ত দিনের বধূ আমার জন্য বসে মালা গাঁথছে। যেমন করে সিন্ধু চলে ভাটিয়ালি টানে, তেমনি করে ফিরে যেতে চাই গান-শ্রান্ত ওড়া-ক্লান্ত আমি। আবার

অকাজের কথা এসে পড়ল। পুষ্প-পাগল বনে কাজের কথা আসে না, গানের ব্যথাই আসে, আমায় দোষ দিও না।

'অগ্নি-বীণা' বেঁধে দিতে দেরি করছে দফতরি, বাঁধা হলেই অন্যান্য বই ও 'অগ্নি-বীণা' পাঠিয়ে দেবো একসাথে। ডি. এম. লাইব্রেরিকে বলে রেখেছি। আর দিন দশকের মধ্যেই হয়তো বই পাবে। আমার পাহাড়ে ও ঝর্নাতলে তোলা ফটো একখানা করে পাঠিয়ে দিও। গ্রুপের ফটো একখানা (যাতে হেমন্তবাবু ও ছেলেরা আছে), আমি, বাহার ও অন্য কে একটি ছেলেকে নিয়ে তোলা যে ফটোর তার একখানা এবং আমি ও বাহার দাঁড়িয়ে তোলা ফটোর একখানা—পাঠিয়ে দিও আমায়। ফটোর সব দাম আমার বই বিক্রির টাকা হতে কেটে নিও।

এখন আবার কোনদিকে উড়ব, ঠিক নেই কিছু। যদি না ধরে কোথাও হয়তো যাব, গেলে জানাব। এখন তোমার চিঠিটার উত্তর দিই। তোমার চিঠির উত্তর তোমার ভাবীই দিয়েছে শুনলাম। আরো শুনলাম, সে নাকি আমার নামে কতগুলো কী সব লিখেছে তোমার কাছে। তোমার ভাবীর কথা বিশ্বাস কোরো না। মেয়েরা চিরকাল তাদের স্বামীদের নির্বোধ মনে করে এসেছে। তাদের ভুল, তাদের দুর্বলতা ধরতে পারা এবং সকলকে জানানোই যেন মেয়েদের সাধনা। তুমি কিন্তু নাহার, রেগো না যেন। তুমি এখনও ওদের দলে ভিড়োনি। মেয়েরা বড্ড অল্পবয়সে বেশি প্রভুত্ব করতে ভালোবাসে। তাই দেখি, বিয়ে হবার এক বছর পর ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই মেয়েরা হয়ে ওঠে গিন্নি। তাঁরা যেন কাজে-অকাজে, কারণে অকারণে-স্বামী বেচারিকে বকতে পারলে বেঁচে যায়। তাই সদাসর্বদা বেচারা পুরুষের পেছনে তারা লেগে থাকে গোয়েন্দা পুলিশের মতো। এই দেখো না ভাই, ছটাকখানেক কালি ঢেলে ফেলেছি চিঠি লিখতে লিখতে একটা বই-এর ওপর, এর জন্য তোমার ভাবীর কী তম্বিহ, কী বকুনি। তোমার ভাবী বলে নয়, সব মেয়েই অমনি। স্ত্রীদের কাছে স্বামীরা হয়ে থাকে একেবারে বেচারাম লাহিড়ী।

একটা কথা আগেই বলে রাখি, তোমার কাছে চিঠি লিখতে কোনো সঙ্কোচের আড়াল রাখিনি। তুমি বালিকা এবং বোন বলে তার দরকার মনে করিনি। যদি দরকার মনে করো, আমায় মনে করিয়ে দিও। আমি এমন মনে করে চিঠি লিখিনি, যে কোনো পুরুষ কোনো মেয়েকে চিঠি লিখছে। কবি লিখছে চিঠি তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা কাউকে, এই মনে করেই চিঠিটা নিও। চিঠি লেখার কোথাও কোনো ত্রুটি দেখলে দেখিয়ে দিও।

আমার 'উচিত আদর' করতে পারোনি লিখেছ, আর তার কারণ দিয়েছ, পুরুষ নেই কেউ বাড়িতে এবং অসচ্ছলতা। কথাগুলোয় সৌজন্য প্রকাশ করে খুব বেশি, কিন্তু ওগুলো তোমাদের অন্তরের কথা নয়। কারণ, তোমরাই সবচেয়ে বেশি করে জানো যে তোমরা যা আদর-যত্ন করেছ আমার, তার বেশি করতে কেউ পারে না। তোমরা তো আমার কোথাও ফাঁক রাখোনি আমার শূন্যতা নিয়ে অনুযোগ করবার। তোমরা আমার মাঝে অভাবের অবকাশ তো দাওনি তোমাদের অভাবের কথা ভাববার ; এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি সহজেই সহজ হতে পারি সকলের কাছে, ওটা আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু তোমাদের কাছে যতটা সহজ হয়েছি—অতটা সহজ বুঝি আর

কোথাও হইনি। সত্যি নাহার আমায় তোমরা আদর-যত্ন করতে পারনি বলে যদি সত্যিই কোনো সংকোচের কাঁটা থাকে তোমাদের মনে, তবে তা অসংকোচে তুলে ফেলবে মন থেকে। অতটা হিসেব-নিকেশ করবার অবকাশ আমার মনে নেই, আমি থাকি আপনার মন নিয়ে আপনি বিভোর। মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে বলতেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, খেই হারিয়ে ফেলি কথার। আমার গোপনতম কে যেন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে আদেশ করে। আর আর্থিক অসচ্ছলতার কথা লিখেছ। অর্থ দিয়ে মাড়োয়ারিকে, জমিদার মহাজনকে বা ভিখিরিকে হয়তো খুশি করা যায়, কবিকে খুশি করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাটি পড়েছ? ওতে এই কথাই আছে।—কবি রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করে রাজপ্রদত্ত মণি-মাণিক্যের বদলে চাইলে রাজার গলার মালাখানি। কবি লক্ষ্মীর প্যাঁচার আরাধনা কোনো কালে করেনি, সরস্বতীর শতদলেরই আরাধনা করেছ—তাঁর পদ্মগন্ধে বিভোর হয়ে শুধু গুনগুন করে গান করেছে আর করেছে। লক্ষ্মীর ঝাঁপির কড়ি দিয়ে কবিকে অভিবন্দনা করলে কবি তাতে অখুশি হয়ে ওঠে। কবিকে খুশি করতে হলে দিতে হয় অমূল্য ফুলের সওগাত। সে সওগাত তোমরা দিয়েছ আমায় অঞ্জলি পুরে। কবি চায় না দান, কবি চায় অঞ্জলি, কবি চায় প্রীতি, কবি চায় পূজা। কবিত্ব আর দেবত্ব এইখানে এক। কবিতা আর দেবতা—সুন্দরের প্রকাশ। সুন্দরকে স্বীকার করতে হয় সুন্দর যা তাই দিয়ে। রূপার দাম আছে বলেই রূপা অত হীন ; হাটে-বাজারে মুদির কাছে, বেনের কাছে ওজন হতে হতে ওর প্রাণান্ত ঘটল ; রূপের দাম নেই বলেই রূপ এত দুর্মূল্য, রূপ এত সুন্দর, এত পূজার ! রূপা কিনতে হয় রূপেয়া দিয়ে, রূপ কিনতে হয় হৃদয় দিয়ে। রূপের হাটের বেচা-কেনা অদ্ভুত। যে যত অমনি—যে যত বিনা দামে কিনে নিতে পারে, সে তত বড় রূপ-রসিক সেখানে। কবিকে সম্মান দিতে পারোনি বলে মনে যদি করেই থাক, তবে তা মুছে ফেল। কোকিল পাপিয়াকে বাড়িতে ডেকে ঘটা করে খাওয়াতে পারনি বলে তারা তো অনুযোগ করেনি কোনোদিন। সে-কথা ভাবেওনি কোনোদিন তারা। তারা তাই বলে তোমার বাতায়নের পাশে গান গাওয়া বন্ধ করেনি। তাছাড়া কবিকে হয়তো সম্মান করা যায় না—কাব্যকে সম্মান করা যায়। তুমি হয়তো বলবে, গাছের যত্ন না নিলে ফুল দেয় না। কিন্তু সে যত্নেরও তো ত্রুটি হচ্ছে না। —অনাত্মীয়কে লোকে সংবর্ধনা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ; বন্ধুকে গ্রহণ করে হাসি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে।

উপদেশ আমি তোমায় দিইনি। যদি দিয়ে থাকি, ভুলে যেয়ো। উপদেশ দেওয়ার চাণক্য আমি নই। দিয়েছি তোমার অনাগত বিপুল সম্ভাবনাকে অঞ্জলি—তোমার মাঝের অপ্রকাশ সুন্দরকে প্রকাশ-আলোতে আসার আহ্বান জানিয়েছি শঙ্খধ্বনি করে। উপদেশের ঢিল ছুঁড়ে তোমার মনে বনের পাখিকে উড়িয়ে দেবার নির্মমতা আমার নেই, এ তুমি ধ্রুব জেনো। আমি ফুল-ঝরা দিয়ে হাসাই, শাখার মার দিয়ে কাঁদাইনে।

তোমায় লিখতে বলেছি, আজো বলছি লিখতে। বললেই যে লেখা আসে, তা নয়। কারুর বলা যদি আনন্দ দেয়, তবে সেই আনন্দের বেগে সৃষ্টি হয়তো সম্ভব হয়ে ওঠে। তোমরা আমায় বলেছ লিখতে। সে-বলা আমায় আনন্দ দিয়েছে, তাই সৃষ্টির বেদনাও

জেগেছে অন্তরে। তোমাদের আলোর পরশে শিশিরের ছোঁওয়ায় আমার মনের কুঁড়ি বিকচ হয়ে উঠেছে। তাই চট্টগ্রামে লিখেছি। নইলে তোমরা বললেই লেখা আসত না। তোমার মনের সুন্দর যিনি, তিনি যদি খুশি হয়ে ওঠেন, তাহলে সেই খুশিই তোমায় লিখতে বসাবে। আমার বলা তোমার সেই মনের সুন্দরকে অঞ্জলি দেওয়া। বলেছি, অঞ্জলি দিয়েছি। তিনি খুশি হয়ে উঠেছেন কিনা তুমি জানো। তুমি আজো অনেকখানি বালিকা। তারুণ্যের যে উচ্ছ্বাস, যে আনন্দ, যে ব্যথা সৃষ্টি জাগায়, সেই উচ্ছ্বাস, সেই আনন্দ, সেই ব্যথা তোমার জীবনে আসার এখনো অনেক দেরি। তাই সৃষ্টি তোমার আজো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। তার জন্য অপেক্ষা করবার ধৈর্য অর্জন করো। তরুর শাখায় আঘাত করলে সে ফুল দেবে না, যখন দেবে সে আপনি দেবে। আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবিতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায়, তাদের ঘিরে রেখেছে বারো হাত লম্বা আটহাত চওড়া দেওয়াল। বাহিরের আঘাত এ দেওয়ালে বারেবারে প্রতিহত হয়ে ফিরল। এর বুঝি ভাঙন নেই অন্তর হতে মার না খেলে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে আমরা বন্দিনী। দ্বার খোলার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগদেবতা। দ্বার ভাঙার পুরুষতার নারীদের প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের দ্বার ভিতর হতে বন্ধ, বাহির হতে নয়। তোমারও যে কী হবে বলতে পারিনে। তার কারণ তোমায় চিনলেই তো চলবে না, তোমায় চালাবার দাবি নিয়ে জন্মেছেন যাঁরা তাঁদের আজো চিনিনি। আমার কেন যেন মনে হলো বাহার তোমার অভিভাবক নয়। ভুল যদি না করে থাকি, তাহলেই মঙ্গল। অভিভাবক যিনিই হন তোমার, তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর আলোর ছোঁয়া পাননি বলেই মনে হলো। তোমায় যে আজ কাঁদতে হয় বসে বসে কলেজে পড়তে যাবার জন্য, এও হয়তো সেই কারণেই। মিসেস আর. এস. হোসেনের মতো অভিভাবিকা পাওয়া অতি বড় ভাগ্যের কথা। তাঁকেও যখন তাঁরা স্বীকার করে নিতে পারলেন না, তখন তোমার কী হবে পড়ার, তা আমি ভাবতে পারি নে! তোমার আর বাহারের ওপর আমার দাবি আছে—স্নেহ করার দাবি, ভালোবাসার দাবি, কিন্তু তোমার অভিভাবকদের ওপর তো আমার দাবি নেই। তবু ওপর-পড়া হয়ে অনেক বলেছি এবং তা হয়তো তোমার আম্মা ও নানীসাহেবাও শুনেছেন। বিরক্তও হয়েছেন হয়তো। আলোর মতো, শিশিরের মতো আমি তোমার অন্তরের দলগুলি খুলিয়ে দিতে পারি হয়তো, দ্বারের অর্গল খুলি কি করে? —তুমি আমার সামনে আসতে পারোনি বলে আমার কোনোরূপ কিছু মনে হয়নি। তার কারণ, আমি তোমাকে দেখেছি এবং দেখতে চাই লেখার মধ্য দিয়ে। সেই হল সত্যিকার দেখা। মানুষ দেখার কৌতূহল আমার নেই, স্রষ্টা দেখার সাধনা আমার। সুন্দরকে দেখার তপস্যা আমার। তোমার প্রকাশ দেখতে চাই আমি, তোমায় দেখতে চাইনে। সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে যে দেখেছে, সেই বড় দেখা দেখেছে। এই দেখা আর্টিস্টের দেখা, ধেয়ানীর দেখা, তপস্বীর দেখা। আমার সাধনা অরূপের সাধনা। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের যে রাজকুমারীর

বন্দিনী সেই রূপকথার অরূপাকে মায়া, নিদ্রা হতে জাগাবার দুঃসাহসী রাজকুমার আমি। আমি সোনার কাঠির সন্ধান জানি—যে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বন্দিনী উঠবে জেগে, রূপার কাঠির মায়ানিদ্রা যাবে টুটে, আসবে তার আনন্দের মুক্তি। যে চোখের জল বুকের তলায় আটকে আছে, তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যথা-হানা আমি। মানস সরোবরের বদ্ধ জলধারাকে শুভ শঙ্খধ্বনি করে নিয়ে চলেছি কবি আমি ভগীরথের মতো। আমার পনেরো আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর, সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সঙ্ঘ। নদীর জল চলছে সমুদ্রের সাথে মিলতে, দুধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে দুধারের গ্রামবাসীদের জন্য, তা তার এক আনা। বাকি পনেরো আনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। আমার পনেরো আনা চলেছে আর চলেছে সৃষ্টি-দিন হতে আমার সুন্দরের উদ্দেশে। আমার যত বলা আমার সেই বিপুলতরকে নিয়ে, আমার সেই প্রিয়তম, সেই সুন্দরতমকে নিয়ে। তোমাকেও বলি, তোমার তপস্যা যেন তোমার সুন্দরকে নিয়েই থাকে মগ্ন। তোমার চলা, তোমার বলা যেন হয় তোমার সুন্দরের উদ্দেশে, তাহলে তোমায় প্রয়োজনের বাঁধ দিয়ে কেউ বাঁধতে পারবে না। তোমার অন্তরতমকে ধ্যান করো তোমার বলা দিয়ে। বাধা যেন তোমার ভিতর দিক থেকে জমা না হয়ে ওঠে। এক কাজ করতে পারো, নাহার? তোমার সকল কথা আমায় খুলে বলতে পার? কী তোমার ব্রত, কী তোমার সাধনা—এই কথা। আমার কাছে সঙ্কোচ কোরো না। আমি তাহলে তোমার গতির উদ্দেশ পাব, আর সেইরকম করে তোমায় গড়ে উঠবার ইশারা দিতে পারব। আমি অনেক পথ চলেছি, পথের ইঙ্গিত হয়তো দিতে পারব। তাই বলে আমি পথে চালাব, এ ভয় কোরো না।

বড় বড় কবির কাব্য পড়া এই জন্য দরকার যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায়, চিন্তার বদ্ধ ধারা মুক্তি পায়। মনের মাঝে প্রকাশ করতে না পারার যে উদ্বেগ, তা সহজ হয়ে ওঠে। মাটির মাঝে যে পত্র-পুষ্পের সম্ভাবনা, তা বর্ষণের অপেক্ষা রাখে। নইলে তার সৃষ্টি-বেদনা মনের মাঝেই গুমরে মরে।

আমার কাছে দামি কথা শুনতে চেয়েছ। দামি কথার জুয়েলার আমি নই। আমি ফুলের বেসাতি করি। কবি বাণীর কমল-বনের বনমালী। সে মালা গাঁথে, সে মণি-মাণিক্য বিক্রি করে না। কবি কথাকে দামি করতে পারে না, সুন্দর করতে পারে। 'বৌ কথা কও' যে কথা কয়, কোকিল যে কথা কয় তার এক কানাকড়ি দাম নেই। ওরা দামি কথা বলতে জানে না। ওদের কথা শুধু গান। তাই বুদ্ধিমান লোক তোতাপাখি পোষে, ময়না পাখি পোষে, ওরা ওদের রোজ 'রাধা কেষ্ট' বুলি শোনায়। আমরা যা বলি, তার মানেও নেই, দামও নেই। তোমায় বুদ্ধিমান লোকের দলের জানিনে বলে এত বকে যাচ্ছি। শুনতে যদি ভালো না লাগে জানিয়ো, সাবধান হবো।

আমার জীবনের ছোট-খাট কথা জানতে চেয়েছ। বড় মুশকিল কথা ভাই। আমার জীবনের যে বেদনা, যে রঙ তা আমার লেখায় পাবে। অবশ্য লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার, ওর বেদনাটুকু আমার। ঐখানেই তো আমার সত্যিকার জীবনী লেখা রয়ে গেল। জীবনের ঘটনা দিয়ে কৌতুক অনুভব করতে পারো।

কিন্তু তা দিয়ে আমাকে চিনতে পারবে না। সূর্যের কিরণ আসলে সাতটা রঙ—রামধনুতে যে রঙ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সূর্য যখন ঘোরে, তখন তাকে দেখি আমরা শুভ্র জ্যোতির্ময় রূপে। সূর্যের চলাটা প্রতারণা করে আমাদের চোখকে—তার বুকের রঙ দেখতে দেয় না সে। কিন্তু ইন্দ্রধনু যখন দেখি, ওরেই দেখতে পাই ওর গোপন প্রাণের রঙ। ইন্দ্রধনু যেন সূর্যের লেখা কাব্য। মানুষের জীবনই মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রতারণা করে। রাধা ভালোবেসেছিল কৃষ্ণকে নয়, কৃষ্ণের বাঁশিকে। তোমরাও ঠিক ভালোবাসো আমাকে নয়—আমার সুরকে, আমার কাব্যকে। সে তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। আবার আমায় নিয়ে কেন টানাটানি, ভাই? সূর্যের কিরণ আলো দেয়, কিন্তু সূর্য নিজে হচ্ছে দগ্ধ দিবানিশি। ওর কাছে যেতে যে চায় সেও হয় দগ্ধীভূত। আলো সওয়া যায়, শিখা সওয়া যায় না। আমি জ্বলছি শিখার মতো, আপনার আনন্দে আপনি জ্বলছি, কাছে এলে তা দেয় দাহ, দূর হতে দেয় আলো। তোমাদের কাছে ছিলাম যে-আমি, সেই-আমি আর চিঠির-আমি কি এক? তোমরা কবিকে জানতে চাও, না নজরুল ইসলামকে জানতে চাও, তা আগে জানিও ; তাহলে আমি এর পরের চিঠিতে একটু একটু করে জানাব তার কথা। চাঁদ জোছনা দেয়, কথা কয় না—বহু চকোর-চকোরীর সাধ্য-সাধনাতেও না। ফুল মধু দেয়, গন্ধ দেয়, কথা কয় না—বহু ভ্রমরার সাধ্যসাধনাতেও না। বাঁশি কাঁদে, যখন গুণীর মুখে তার মুখে চুমোচুমি হয় ; বাকি সময়টুকু সে এক কোণে নির্বাক, নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে। একই ঝাড়ের বাঁশ ভাগ্যদোষে বা গুণে কেউ হয়ে ওঠে লাঠি, কেউ হয় বাঁশি। বীণা কত কাঁদে, কথা কয় গুণীর কোলে শুয়ে, বাকি সময়টুকু তার খোলের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে সে নিস্পন্দিত হয়ে থাকে। গানের পাখি, তাকে গানের কথাই জিজ্ঞাসা করো, নীড়ের কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। নিজেই বলতে পারবে না যে, কোথায় ছিল তার নীড়। জন্ম নিয়ে গান শিখে উড়ে যাবার পর নীড়টার মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিস আর তার কাছে নেই। নীড়ের পাখি তখন বনের পাখি হয়ে ওঠে। গুরুদেব বলেছেন, ফসল কেটে নেবার পর মাঠটার মতো অপ্রয়োজনীয় জিনিস আর নেই। তবু সেই অপ্রয়োজনের যদি প্রয়োজন অনুভব করে তোমাদের কৌতুক, তবে জানিয়ো।

চিঠি লিখছি আর গাচ্ছি একটা নতুন লেখা গানের দুটো চরণ :

> 'হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
> ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
> কোন অমরার বিরহিনীরে চাহনি ফিরে,
> কার বিষাদের শিশির-নীরে এলে নাহিয়া।'

কবির আসা ঐ শেফালির পথ বেয়ে আসা। কার বিষাদের শিশির-জলে নেয়ে আসে তা সে জানে না। তার নিজের কাছেই সে একটা বিপুল রহস্য।

আমার লেখা কবিতাগুলো চেয়েছ। হাসি পাচ্ছে খুব কিন্তু। কী ছেলেমানুষ তোমরা দুটি ভাই বোন। যে-খন্তা দিয়ে মাটি খোঁড়ে মালী, সেটারও যে দরকার পড়ে

ফুলবিলাসীর, এ আমার জানা ছিল না। যে পাতার কোলে ফুল ফোটে, সে-পাতা কেউ চায় না, এই আমি জানতাম। মালা গাঁথা হবার পর ফুল-রাখা পদ্ম-পাতাটার কোনো দরকার থাকে, এও একটা খুব মজার কথা, না? যাক, চেয়েছ—দেবো। তবে এ পল্লব শুকিয়ে উঠবে দুদিন পরে, থাকবে যা তা ফুলের গন্ধ। তাছাড়া অত কবিতাই বা লিখব কোত্থেকে যে খাতা ভর্তি করে দেবো। বসন্ত তো সব সময় আসে না। শাখার রিক্ততাকে যে ধিক্কার দেয়, সে অসহিষ্ণু ; ফুল ফোটার জন্যে অপেক্ষা করতে জানে যে, সে-ই ফুল পায়। যে অসহিষ্ণু চলে যায়, সে তো পায় না ফুল, তার ডালা চিরশূন্য রয়ে যায়। তোমাদের ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা দেশ, তোমাদের সিন্ধু পর্বত গিরিদরী-বন আমায় গান গাইয়েছিল। তোমাদের শোনার আকাঙ্ক্ষা আমায় গান গাইয়েছিল। রূপের দেশ ছাড়িয়ে এসেছি এখন রূপেয়ার দেশে, এখানে কি গান জাগে? বীণাপাণির রূপের কমল এখানকার বাস্তবতার কঠোর ছোঁয়ায় রূপার কমল হয়ে উঠেছে। কমলবনের বীণাপাণি ঢুকেছেন এখানের মাড়োয়ারি মহলে। ছাড়া যেদিন পাবেন, আসবেন তিনি আমার হৃৎকমলে। সেদিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই আমার।

আমার কবিতার উৎস-মুখের সন্ধান চেয়েছ। তার সন্ধান যতটুকু জানি নিজে দেখিয়ে দেবো।

আর কিছু লিখবার অবসর নেই আজ। মানস-কমলের গন্ধ পাচ্ছি যেন, কেমন যেন নেশা ধরছে ; বোধ হয় বীণাপাণি তার চরণ রেখেছেন এসে আমার অন্তর-শতদলে। এখন চললাম ভাই। চিঠি দিও শীগগীর। আমার আশিস নাও। ইতি—

তোমার
'নূরুদা'

পুনঃ–

তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়ে এসেছি, সেসব ভুলে যেও। তোমার আম্মা ও নানী সাহেবার পাক কদমানে হাজার হাজার আদাব জানাবে আমার। শামসুদ্দিন ও অন্যান্য ছেলেদের স্নেহাশিস জানাবে। তুমি কি বই পড়লে এর মধ্যে বা পড়ছ, কি কি লিখলে, সব জানাবে। তোমার লেখাগুলো আমায় আজই পাঠিয়ে দেবে—চিঠি দিতে দেরি করো না। 'কালিকলম' পেয়েছ বোধ হয়। তোমায় পাঠানো হয়েছে। তোমার লেখা চায় তারা

—'নূরুদা'

একুশ

[খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনকে লিখিত। কার্ডখানিতে ৯-১০-২৬ তারিখ লেখা ; কিন্তু ডাকবিভাগের সিল দুটিতে আছে 'Krishnanagar, 9 Sep ; 26 Calcutta G.P.O. 10 Sep. 26' অর্থাৎ সঠিক

তারিখ ৯-৯-২৬ হওয়া উচিত। চিঠিতে যে 'খোকা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে কবির দ্বিতীয় পুত্র 'বুলবুল'।]

কৃষ্ণনগর
৯-১০-২৬

স্নেহভাজনেষু,

মঈন ! আজ সকালে আমাদের একটি খোকা এসেছে। তোর ভাবী ভালো আছে। খোকা বেশ মোটা-তাজা হয়েছে। নাসিরউদ্দীন সাহেবকে খবরটা দিস। চট্টগ্রাম থেকে কোনো কবিতা পেয়েছিস কি আমার? 'সর্বসহা' দিবি তো 'সওগাতে'? নতুন লেখা শীগগীরই দেবো। আমি যশোর-খুলনা ঘুরে' আজ ফিরছি। —এইবার গিয়ে শামসুদ্দীন সাহেবকে বইগুলো পাঠিয়ে দেবো। কাল কিংবা পরশু যাব কলকাতা। ৩৭ নম্বরে খবর নিস একবার। ভালোবাসা ও স্নেহাশিস নে। ইতি—

কাজী ভাই

বাইশ

[এই পত্রখানি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ দলের অন্যতম মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক গোপাল লাল সান্যাল মহাশয়কে লিখিত। ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ২০শে আগস্ট সংখ্যা 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে তারানাথ রায় 'তারা-রা' ছদ্মনামে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র 'গণবাণী'র সমালোচনা করেন। তারই জবাবে কবি এই পত্রটি লেখেন।]

শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

আপনার (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের) ২০শে আগস্টের 'আত্মশক্তি'র 'পুস্তক-পরিচয়'-এ নতুন সাপ্তাহিক 'গণবাণী'র যে পরিচয় দিয়েছেন তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। কারণ 'গণবাণী'র সাথে আমিও সংশ্লিষ্ট। অবশ্য 'গণবাণী' পুস্তক নয়, 'আত্মশক্তি'র পুস্তক-পরিচয়ের সুবিধা নিয়ে পরিচিত হলেও, যেমন আত্মশক্তি আপনার কাগজ হলেও, ঐ সমালোচনাটা আপনার নয়।

ঐ 'পরিচয়' নিয়ে বলবার কথাটুকু আমারই ব্যক্তিগত, আমাদের কৃষক শ্রমিক দলের নয়। আশা করি, আপনার ঢাউস কাগজের একটুখানি জায়গা ছেড়ে দেবেন আমার বক্তব্যটুকু জানাতে। এ অনুরোধ করলাম এই সাহসে যে, আপনার সম্পাদিত পত্রিকাটি 'শুক্রবারের আত্মশক্তি', 'শনিবারের পত্র' নয়। হঠাৎ এ কথাটা বলার হেতু আছে। কেউ কেউ বলছিলেন 'শনিবারের চিঠি' না-কি একীভূত হয়ে উঠেছে 'আত্মশক্তির' সাথে।

অবশ্য, আমার একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়নি, যদিও দু–তিনবার আমার এইরূপ ভুল ধারণা করিয়ে দিয়েছেন আর কি। এ রকম ধারণার আরো কারণ আছে। হঠাৎ এক দিন কাগজে পড়লাম ইটালির মুসোলিনি আর আফ্রিকার হাবসি রাজার ইয়ার্কি চলতে চলতে শেষে কি এক রকম সম্বন্ধ পাকতে চলেছে। সেই ইয়ার্কিটা গুজব যে, হাবসি দেশটা ইটালির সাথে একীভূত (incorporated) হয়ে যাচ্ছে। হবেও বা। অত সাদা Vs অতো কালোয়, অতো শীত Vs অতো গ্রীষ্মের যদি আঁতাত হতে পারে, তবে শনিবারের পত্র আর শুক্রবারের পত্রিকাতেই বা বন্ধুত্ব হবে না কেন, একীভূত না হোক। আমরা আদার ব্যাপারি, অতো সব জাহাজের খবর নেওয়া ধৃষ্টতা নিশ্চয়ই। তবে জানেন কি, 'খোশ খবরটা ঝুটা ভি আচ্ছা' বলে একটা প্রবাদ আছে, অর্থাৎ ওটাকে উল্টিয়ে বললে ওর মানে হয় 'বুরা খবরকা সাচ্চা ভি না চা' আপনার 'অরসিক রায়' এবং প্রবাসীর অশোকবাবুতে যখন কথা কাটাকাটি চলছিল তখন ওটা ইয়ার্কির মতো অতো হাল্কা বোধ হয় নাই, যা দেখে আমরা আশা করতে পারতাম যে ওটা শিগগিরই একটা সম্বন্ধে পেকে উঠবে। 'ফরেন পলিসি' আমরা বুঝিনে, তবে আমার এক বন্ধু একদিন বলেছিলেন, এ লেখালেখির শিগগিরই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। কেননা, অশোকবাবুর লেখার ক্ষমতা না থাক, তাঁর মুষ্টি লড়বার ক্ষমতা আছে।

চিন্তার বিষয়, সন্দেহ নেই। অশোকবাবুর লেখার কসরৎ দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু বক্সিং শিখলে যে শক্তিশালী লেখক হওয়া যায়, এ সন্ধান তো আগে আমায় কেউ দেননি। তাহলে আমি আমার লেখার কায়দাটা অশোকবাবুর কাছে দেখেই শিখতাম। আর অশোকবাবু ও তাঁর চেলাচামুণ্ডারা আমায় লিখতে শেখাবার জন্য কিরূপ সমুৎসুক তা তাঁদের আমার উদ্দেশ্যে বহু অর্থব্যয়ে ছাপা বিশেষ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'গুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। বাগদেবী যে আজকাল বাগদিনী হয়ে বীণা ফেলে সজনে কাঠের ঠেঙ্গা বাজাচ্ছেন, তাও দেখতে পাবেন।

আপনাকে আমি চিনি, তাই আমার ভয় হচ্ছিল আপনার কাগজের ইদানীং লেখাগুলো দেখে যে, কোনোদিন বা আপনারও নামের শেষে B.A. Cantab দেখে ফেলি। চিঠি মাত্রই প্রাইভেট, এ কথা নীতিবিদ রামানন্দবাবুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত না হলে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারতেন? ও–রকম লেখা ঐ রকম Oxon বা Cantab B.A. ইউরোপ–প্রত্যাগত অতিসভ্য ছাড়া বোধ হয় কেউ লিখতে পারেনই না, পড়তেও পারে না। অশোক বনের চেড়ির মার সীতার প্রতি কিরূপ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল জানা নেই। কিন্তু সে মার সরস্বতীর ওপর পড়লে যে কিরূপ মারাত্মক হয় তা বেশ বুঝছি। আমার ভয় হচ্ছে, কোন দিন বা শ্রীযুক্ত বলাই চাটুজ্জে লেখা শুরু করে দেন।

শিবের গীত গাইতে ধান ভেনে নিলাম দেখে ('ধান ভানতে শিবের গীত' নয়) আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এটা চিঠি, প্রবন্ধ নয়। আর, চিঠিতে যে আবোল–তাবোল বকবার অধিকার সকলেরই আছে, তা শনিবারের চিঠি পড়লেই দেখতে পাবেন। তাই বলে আমার এ চিঠিটা রবিবারের উত্তরও নয়। কেননা, তাঁরা এত চিঠি লিখেছেন আমায় যে, তার উত্তর দিতে হলে আবার গণেশ

ঠাকুরকে ডাকতে হয়। এটাকে মনে করে নিন আসল গান গাইবার আগে একটু তারারা করে নেওয়া, যেমন আপনারা তারারা করেছেন গণবাণীর আলোচনা করতে গিয়ে।

শ্রীযুক্ত তারারা লিখেছেন 'লাঙল উঠে গিয়ে এটা (অর্থাৎ গণবাণী) নামল' কিন্তু 'গণবাণী'র কভারে লেখা আছে, এর সাথে 'লাঙল' একীভূত হয়েছে। যেমন Forward-এর সাথে Indian Daily News প্রভৃতি একীভূত হয়েছে। অতএব আসলে লাঙল উঠে গেল না, সে রয়ে গেল গণবাণীর মধ্যে। এর কারণও দেখিয়েছেন ওর সম্পাদক মুজফফর আহমদ। 'গণবাণী'র কভারের লেখাটুকু বোধ হয় শ্রীযুক্ত তারারার চোখে পড়ে নাই। অবশ্য আমি এ ইচ্ছা করছি না যে, তার চোখে লাঙল পড়ুক। চোখে খরকুটো পড়লেই সে রকম অবস্থা হয়ে ওঠে।

তিনি আরো লিখেছেন এ নামের দল (বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল) এদেশে কবে তৈরি হল, কারা করল, কোন ভাতকাপড়ের সংস্থাহীন অনশন অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকরা এর কর্ণধার তা সাধারণকে জানানো উচিত। কোন সাধারণ সভায় এর উদ্বোধন, সেটাও জানানো দরকার। 'শ্রীযুক্ত তারারা' 'দরিয়া পারে' খবর লেখেন, অনেক কাগজে অনেক রকম কিছু লেখেন, সুতরাং দরিয়ার এপারের দেশি খবরটাও তিনি রাখেন এ বিশ্বাস করা অপরাধের নয় নিশ্চয়। কিন্তু না রাখাটা অপরাধের, অন্তত তাঁর পক্ষে, যিনি রাজনীতি আলোচনা করেন। তিনি আপাতত আপনার কাগজে কৃষক-শ্রমিকের খবরাখবর করলেও আগে নিশ্চয় করতেন না। নইলে তিনি ও রকম প্রশ্ন করে নিজেকে লজ্জায় ফেলতেন না। 'বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল' সম্বন্ধে দু'একটা খবর দিচ্ছি ওঁকে, ওঁর ওগুলো জানা থাকলে কাজে লাগবে। গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ই ও ৭ই তারিখে কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। যার সভাপতি হয়েছিলেন ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঐ কনফারেন্সের বিবরণী বাংলার ইংরেজি-বাংলা প্রায় সব কাগজেই বেরিয়েছিল। লাঙলে তো বেরিয়েছিলই। অবশ্য ধনিক দলের কাগজ 'ফরওয়ার্ড' সে বিবরণ ছাপায়নি—শুধু সভার সংবাদটুকু কোনো নারীহরণের মামলার শেষে দেয়া ছাড়া। এরপর এলবার্ট হল প্রভৃতি স্থানে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের যতগুলো সভাসমিতি হয়েছে, তার কোনো সংবাদই ছাপেনি 'ফরওয়ার্ড'। আমরা দিয়ে আসলেও না। সম্পাদকীয় এই ধর্ম ও সৌজন্যটুকু বাংলার আর কোনো কাগজ অতিক্রম করেনি। অবশ্যই 'ফরওয়ার্ড' বিলেতের ও জগতের আর দেশের শ্রমিকদের কথা লেখে, সুতরাং ও-কাগজে বাংলার জঘন্য চাষী-মজুরের কথাও লিখতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তাতে আবার এ কৃষক-শ্রমিক দলটা তুলসীবাবুর, নলিনীবাবুর মতো ধনিক নেতার গঠিত নয়। গঠন করলে কারা না, যত সব বিভিন্ন জেলার সত্যিকারের মজুর, ক্ষয়কেশো হাড়-চামড়া বের করা, আধ-ন্যাংটা বেগুন সিদ্ধ মৃত মুখওয়ালা চাষা মজুর। আর তাদের নেতাগুলোও তদ্রূপ—না আছে চাল না আছে চুলো। তাতে বলশেভিক ষড়যন্ত্রের আসামী সব। বোঝ ঠ্যালা।

যাক, ঐ প্রজা সম্মিলনের প্রস্তাবসমূহ নবম সংখ্যা লাঙলে বেরিয়েছিল। ঐ সম্মিলনের প্রথম প্রস্তাবই হচ্ছে কৃষক-শ্রমিক দল গঠনের প্রস্তাব।

উহার চতুর্থ প্রস্তাব হচ্ছে : 'লাঙল' পত্রিকাকে কৃষক ও শ্রমিকদের মুখপত্ররূপে আপাতত গ্রহণ করা হউক।'

প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবক ও সমর্থক সকলেই বিভিন্ন জেলার কৃষক ও শ্রমিক।

তারপর তারারার সঙ্গীন প্রশ্ন—'কোন্ কোন্ ভাত-কাপড়ের সংস্থানহীন অনশন অর্ধাশনক্লিষ্ট শ্রমিকরা এর কর্ণধার।' উত্তরে তারারা মহাশয়কে সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি যেন দয়া করে একবার ৩৭ হ্যারিসন রোডের 'গণবাণী' অফিসে পদধূলি দিয়ে যান। গেলে দেখতে পারেন, বহু হতভাগ্যের পদধূলি 'গণবাণী' অফিসে স্তূপীকৃত হয়ে 'গণবাণী'কেও ছাড়িয়ে উঠেছে। সে অফিসে মাদুরের চেয়ে মেঝেই বেশি, চেয়ার টেবিল তো নঞতৎপুরুষ সমাস। মানুষগুলির অধিকাংশই মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। অবশ্য খাবার বেলায় বহুব্রীহি। বাজ-পড়া, মাথা-ন্যাড়া তালগাছের মতো সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে চোখে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি 'গণবাণী'র কর্ণধার হতভাগ্য মুজফফর আহমদকে। অবস্থা তো সব—'ফকির-ফোকরা, হাঁড়িতে ভাত নেই, শানকিতে ঠোকরা।' আর শরীরের অবস্থাও তেমনি। যেন সমগ্র মানবসমাজের প্রতিবাদ ! আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌন কর্মী এমন সুন্দর প্রাণ, মন, ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবির দেশ নোয়াখালিতে, এই মোল্লা-মৌলবির দেশ বাংলায় তা ভেবে পাইনে। ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। আজ তাকে যক্ষ্মা খেয়ে ফেলেছে, আর কটা দিন সে বাঁচবে জানি না। ওর পায়ের তলায় বসে শিষ্যত্ব করতে পারে না, এমন অনেক মুসলমান নেতা আজ এই সাম্প্রদায়িক হুড়োহুড়ির ও যুগের হুজুগের সুবিধে নিয়ে গুছিয়ে নিলে, শুধু মুজফফর দিনের পর দিন অর্ধাশন-অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে শুকিয়ে মরছে। আমি জানি, এই 'গণবাণী' বের করতে তাকে দুটো দিন কাঠে কাঠ অনশনে কাটাতে হয়েছে। বুদ্ধু মিঞাও আজ লিডার, আর মুজফফর মরছে রক্ত-বমন করে। অথচ মুজফফরের মতো সমগ্রভাবে নেশনকে ভালোবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে কোনো মুসলমান নেতা তো দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখিনি। এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দিনে যদি কারুর মাথা ঠিক থাকে, তা মুজফফরের, 'লাঙল' ও 'গণবাণী'র লেখা প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারবেন।

দেশের ছোট বড় মাঝারি সকল দেশপ্রেমিক মিলে যখন 'এই বেলা নে ঘর ছেয়ে' প্রবাদটার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করে পনের দিন বিনাশ্রমে জেল বাসের বিনিময়ে অন্তত একশত টাকার 'ভাত কাপড়ের সংস্থান' করে নিলে, তখন যারা তাদের ত্যাগের মহিমাকে মলিন করল না আত্মবিক্রয়ের অর্থ দিয়ে—তাদের অন্যতম হচ্ছে মুজফফর। মুজফফর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র কেসের দণ্ডভোগী অন্যতম আসামি এবং বাংলার সর্বপ্রথম মুসলমান স্টেট প্রিজনার ! বাংলার বাইরে নানান খোট্টাই জেলে তার উপর

অকথ্য অত্যাচার চলেছে। শেষে যখন যক্ষ্মায় সে মৃতপ্রায় তখন তাকে হিমালয় পর্বতস্থিত আলমোড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। তখন ওজন তার মাত্র ৭৪ পাউন্ড। সেখানে দিনের পর দিন কাটিয়েছে সে অনশনে, তবু সে চায়নি কিছু। সে বলেনি কোনোদিনই মুখ ফুটে যে, দেশের জন্য সে কিছু করেছে। বলবেও না ভবিষ্যতে। সে বলে না বলেই তো তার জন্য এতো কান্না পায়, তার ওপর আমার এতো বিপুল শ্রদ্ধা। সেই নেতা যিনি আজ কর্পোরেশনের মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ব্যাঙ্কে যার জমার অঙ্কের ডান দিকের শূন্যটা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন, যাঁকে কোলকাতা এনে তাঁর টাউন হলের অভিভাষণ লিখিয়ে দিয়ে কাগজে কাগজে তাঁর নামে কীর্তন গেয়ে বড় করে তুলল সেই মুজফফর তার অতি বড় দুর্দিনে একটা পয়সা বা এক ফোঁটা সহানুভূতি পায়নি ঐ লিডার সাহেবের কাছে। সে অনুযোগ করে না তার জন্য, কিন্তু আমরা করি।

যে মুসলমান সাহিত্য সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল মুজফফ্‌র, অথচ তার নিজের নাম চিরকাল গোপন রেখে গেল, সেই মুসলমান সাহিত্য-সমিতির যখন নতুন করে প্রতিষ্ঠা হল এবং তার নতুন সভ্যগণ মুজফফ্‌র রাজলাঞ্ছিত বলে এবং তাদের অধিকাংশই রাজভৃত্য বলে যখন তার বন্দি বা মুক্ত হওয়ার জন্য নাম পর্যন্ত নিলে না— তার ঋণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার তো দূরের কথা, তখন একটি কথা কয়ে দুঃখ প্রকাশ করেনি মুজফফ্‌র। ও যেন প্রদীপের তেল, ওকে কেউ দেখলে না, দেখলে শুধু সেই শিখাকে, যা জ্বলে প্রদীপের তেলকে শোষণ করে। শুধু মুজফফ্‌র নয়, এ দলের প্রায় সকলেরই এই অবস্থা। হালিম, নলিনী সব সমান। এ বলে আমায় দেখো, ও বলে আমায় দেখো। একজনের অ্যাপেন্ডিসাইটিস, একজনের ক্যানসার, ম্যালেরিয়া, একজনের আলসার, একজনের ধরেছে বাতে। আর হাড়হাভাতে ও হা-ভাতে তো সবাই। যাকে বলে নরক গুলজার, বলতে হলে সব শ্রীচরণ মাঝি ভরসা। কোমরের নিচে টাকা জুটল না কারুর, আর পেটের ভিতর সর্বদা যেন বোমা তৈরি হচ্ছে—ক্ষিদের চোটে এমন হুড়মুড় করে। দিনরাত চুপসে আছে—বাতাস বেরিয়ে যাওয়া ফুটবলের ব্লাডারের মতো। চায়ের কাপগুলো অধিকাংশ সময়েই দন্ত 'ক্লাইভ স্ট্রিট' করে পড়ে আছেন। লেখককে তাঁর ইলেকট্রিক ফ্যান শীতলিত এবং লাইট উজ্জ্বলিত ড্রয়ার টেবিল ডেস্ক পরিশোভিত, দারোয়ান দণ্ডায়িত, ত্রিতল অফিসকে ত্যাগ করে একটু নিচে নেমে (লিফট দিয়ে) তাঁদের অফিসের মোটরে করে আমাদের 'গণবাণী' অফিসের ও তার কর্ণধারদের দেখে যাবার নিমন্ত্রণ রইল। বুভুক্ষুগুলো অন্তত তাঁর পয়সার একটু চা খেয়ে নেবে। অবশ্য ওকেও এক কাপ দেবে। আমি নিজে গিয়েই শ্রীযুক্ত তারারাকে নিয়ে যেতাম, কিন্তু এদিকেও ভাঁড়ে ভবানী। কয়েকদিন কোলকাতায় যাবার বিশেষ প্রয়োজন থাকলেও যেতে পারছিনে ট্রেন ভাড়ার অভাবে। বাড়ির হাঁড়িতে ইঁদুরেরা বক্সিং খেলছে, ডন খেলছে! ক্যাপিটালিস্টরা আমার চেয়েও সেয়ানা, তারা বলে, 'হাত বুলোতে হয় গায়ে বুলোও বাবা, মাথায় নয়, তোমার হাত-খরচটা মিলে যাবে, কিন্তু ও কর্মটা হবে না, দাদা। এমন কি মুজফফরের মতো সুটকি হয়ে মর-মর হলেও না।'

তারপর 'গণবাণী'র লেখা নিয়ে 'তারারা' বলছেন—'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকেরা লেখাপড়ার সঙ্গে গোটা কয়েক মতবাদ শিখলে ওগুলো শিগগিরই বুঝতে পারবেন?' —তাঁর ইঙ্গিতটা এবং রসিকতাটা দুটাই বুঝলাম না, বুঝলাম শুধু তাঁর জানাশোনা কতটুকু—অন্তত সেই সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি কি জানেন না, যে কোনো দেশের কোনো শ্রমিক কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' পড়ে বুঝতে পারবে না। ঐ মতবাদটা যারা পড়বে তারা কৃষকশ্রমিক নয়, তারা লেনিন ল্যান্সব্যারির নমুনার লোক। কার্ল মার্ক্সের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে যারা জগতটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়ছেন। মতবাদ কোনোকালেই জনসাধারণ বুঝবে না, মতবাদ তৈরি করে তুলবেন সেই রকম লোক যাঁরা, বুঝোবেন এ মতবাদের মর্ম জনসাধারণকে। ইনজিন চালাবে ড্রাইভার, কিন্তু গাড়িতে চড়বে সর্বসাধারণ 'গণবাণী'ও কৃষক-শ্রমিকদের পড়ার জন্য নয়, কৃষক-শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যাঁরা— 'গণবাণী' তাঁদের জন্য। কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র, মানে তাদের বেদনাতুর হৃদয়ের মূক মুখের বাণী 'গণবাণী' তাদের বইতে না পারা ব্যথা কথায় ফুটিয়ে তুলবে 'গণবাণী'। ইতি—

৮ই ভাদ্র,
১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

বিনীত
নজরুল ইসলাম

তেইশ

[ব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর
৯-১০-২৬

পরম স্নেহভাজনেষু—

ব্রজ! আজ সকাল ছটায় আমার একটি পুত্র-সন্তান হয়েছে। তোমার বৌদি আপাতত ভালো আছে। আমিও আজ সকালে ফিরে এলাম যশোর, খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর প্রভৃতি ঘুরে। টাকার বড্ডো দরকার। যেমন করে পার, পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে পাঠাও। তুমি তো সব অবস্থা জান। বলেও এসেছি তোমায়। কেবল 'সঞ্চিতা'র প্রুফ পেলাম—'সর্বহারা'র শেষ প্রুফ কই? 'সর্বহারা' কখন বেরুবে? যেদিন বেরুবে অন্তত ৫০ কপি আমায় পাঠিয়ে দেবে।

ভুলো না যেন। টাকা কর্জ করেও পাঠাও। স্নেহাশিস নাও! পত্র দিও। ইতি—

তোমার
কাজীদা

চব্বিশ

[পত্রটি মুরলীধর বসুকে লিখিত। নজরুলের 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার' গানটি এবং ঐ গানের কবিকৃত স্বরলিপি প্রথম বর্ষের ১৩৩৩ আশ্বিন সংখ্যা 'কালিকলমে' প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় তাঁর 'অনামিকা' কবিতাও ছিল। প্রথম বর্ষের ভাদ্র সংখ্যা 'কালিকলমে' লেখরাজ সামন্ত ছদ্মনামে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'শুঁটকি ও ফুপি' গল্পটি লেখেন।]

কৃষ্ণনগর
৯-১০-২৬

প্রিয় মুরলীদা,

আজ সকাল ৬টায় একটি 'পুত্ররত্ন' প্রসব করেছেন শ্রীমতি গিন্নি। ছেলেটা খুব হেলদি হয়েছে। শ্রীমতিও ভালো। আমি উপস্থিত ছিলাম না। হয়ে যাবার পর এলাম খুলনা হতে। খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, দৌলতপুর, বনগ্রাম প্রভৃতি ঘুরে ফিরলাম আজ। শৈলজা কী করছে। প্রেমেন কোথায়? ... চিঠি দিও। কবিতাটির ও স্বরলিপিটার প্রুফ পাঠিও, যদি সম্ভব হয়! ...

'শুঁটকি ও ফুপি' অদ্ভুত—অপূর্ব গল্প হয়েছে।

—নজরুল

পঁচিশ

[ব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত]

স্নেহের ব্রজ,

আজো আমি শয্যাগত। বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগের ও অন্যান্য চিন্তার জ্বালায়। চিন্তার মধ্যে অর্থ-চিন্তাটাই সবচেয়ে বড়। কী করে যে দিন যাচ্ছে আল্লাহ জানেন। তোমার প্রেরিত পনেরো টাকা পেয়েছি। পঁচিশ টাকা চেয়েছিলুম। অবশ্য, তোমারও বিপদ-আপদের কথা শুনলাম। আরো যদি পাঠাতে পার আমার এই দুর্দিনে, বড় উপকৃত হব। তুমি ছোট ভাইয়ের মতো তোমাকে বেশি কি লিখব। তোমার অন্যান্য খবর দিও। 'সর্বহারা' কাটছে কেমন?

তোমার
'কাজীদা'

ছাব্বিশ

[ব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত]

স্নেহের ব্রজ,

এই ছেলেটির সাথে অবশ্য এসো—মিনিট কয়েকের জন্য। বিশেষ দরকার। আমি আজই একটার ট্রেনে কৃষ্ণনগর চলে যাচ্ছি। আসার পরে পরেই জ্বরে শয্যাগত, তাই দেখা করতে পারিনি। —ঘরে সব মরছে না খেয়ে—তাই এসেছিলাম টাকার জোগাড়ে। তুমি অন্তত পঁচিশটি টাকা নিয়ে আসবে এর সাথে। এখনো জ্বর ছাড়েনি। স্নেহাশিস নাও। ইতি—

তোমার
কাজীদা

সাতাশ

[মুরলীধর বসুকে লিখিত।]

কৃষ্ণনগর
২৬-১২-২৬

মুরলীদা,

তোমার চিঠি যখন পাই, তখন আমি বিছানা-সই হয়ে পড়ে আছি। তাই উত্তর দিতে পারিনি। প্রায় মাসখানেক ধরে জ্বরে ভুগে আজ দিন চারেক হল ভালো আছি। তুমি একা পড়েছ 'কালিকলম' নিয়ে। শৈলজা ভুগছে আজো শুনলাম।

আমি এবার এত দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং চারিদিক দিয়ে এত বিব্রত হয়ে পড়েছি যে, এবার বুঝি সামলানো দায় হবে এই ভেবেছিলুম প্রথমে। অবশ্য সামলে যে উঠেছি তা-ও নয়। নিত্য-অভাবের চিত্ত-ক্ষোভ আমায় আরো দুর্বল করে তুলছে। এখনো বাড়ি ছেড়ে বেরোবার সাধ্য নেই। —তোমার এ-সময় সময় নেই ; তবু একটা কাজ দিচ্ছি। আমি শুয়ে শুয়ে কয়েকটা গান লিখেছি উর্দু গজলের সুরে। তার কয়েকটা 'সওগাতে' দিয়েছি। দুটো তোমার কাছে পাঠাচ্ছি—'বঙ্গবাণী'তে দিয়ে আমায় তাড়াতাড়ি কিছু নিয়ে দেবার জন্য। অন্য সব জায়গায় দশ টাকা করে দেয় আমায় প্রত্যেকটা কবিতার জন্য, একথা ওদের বলো। গান দুটি পেয়েই যদি ওরা টাকাটা দেয় আমার খুব উপকারে লাগে। —আমাদের আর মান-ইজ্জত রইল না, মুরলীদা, —না ? অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকেও কেড়ে নেয় শেষে !

তোমার 'কালিকলমে'র জন্য মাঘ পর্যন্ত তো রয়েছে, তারপর আবার লেখা দেব, অন্তত দুটো গজল পাঠিয়ে দেবো। এখন যদি চাও তো লিখো।

হ্যাঁ, 'বঙ্গবাণী'তে জিজ্ঞাসা করো, ওঁরা যদি স্বরলিপি চান তাহলে গজল দুটোর স্বরলিপি করে পাঠাতে পারি ২/১ দিনের মধ্যেই। 'বঙ্গবাণী'র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দাও না মুরলীদা ! ওঁরা প্রতি মাসে কিছু করে দেবেন, আমিও সেই অনুসারে লেখা দেবো প্রতি মাসে। কি হয় লিখে জানিও। ...

আমাদের বাড়ির আর সকলে ভালো। দেখলে কেবল নিজের কথাই এক কাহন করলুম। প্রেমেনের ঠিকানাটা দিও। ...

—নজরুল

আটাশ

['সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনকে লিখিত।]

কৃষ্ণনগর
৩০-১২-২৬

প্রিয় নাসিরুদ্দীন সাব,

এখন রাত্রি। এইমাত্র 'মিসেস এম. রহমান' শীর্ষক কবিতাটি শেষ করে আপনায় চিঠি লিখছি।

আপনার দুইখান Post card-ই পেয়েছি, মঈনের চিঠিও পেয়েছি। একেবারে কবিতার সাথে চিঠি দেব বলে আর আলাদা চিঠি দিইনি ; কিছু মনে করবেন না। আমি গাজী আবদুল করিমের বন্দি-জীবন নিয়ে একটা কবিতা লিখছিলাম, এমন সময় মার (মিসেস এম. রহমানের) মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে আমার আবার সব গুলিয়ে গেল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। আপন পেটের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন মা আমায়। আমি তার প্রতিদানে কিছুই দিতে পারিনি। আমি আজ দেউলিয়া হয়ে যেন জীবনের জোয়ার-ভাটা দেখছি শুধু। মন বড় খারাপ তাই এখন মার নামে যে কবিতাটি পাঠালাম—এটাই মাঘের সওগাতের প্রথমে দিয়ে দেবেন। মা আমায় ভালোবাসতেন বলেই যে এ দাবি করছি, তা নয়। মূলত সাহিত্যের দিক থেকেও এ দাবি করবার মতো গুণ মার ছিল। এটা ছেপে দিলে আমি বড় খুশি হবো, মা-ও বেহেশত হতে তাঁর অবহেলিত প্রতিভার অসময়ে কদর দেখে হয়তো শান্তি লাভ করবেন। আপনাকে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

আমার শরীর আজো যথেষ্ট দুর্বল। জ্বর আর আসছে না। নানান চিন্তায়, বিপদে মন বা মস্তিস্ক স্থির নেই—যা আসছে কলমে, লিখে যাচ্ছি।

'সওগাত' হতে কিছু নিতে আমার কষ্ট হয়। আপনি এটা ঋণ দিচ্ছেন মনে করে দেবেন। আমার বইয়ের দাম হতে এ ঋণের টাকা কেটে নেবেন। আমি হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যেই বা পরেই কলকাতা যাব ইনশাল্লাহ। যদি আপনার কষ্ট না হয়, তাহলে

গোটা বিশেক টাকা পাঠালে বড় উপকৃত হতুম। গোপালদা একশ টাকার সব টাকা দেননি। চিঠি লিখে উত্তর পাইনি। ও–টাকাটা এলে আপনাকে বিব্রত করতাম না লিখে। গোপালদাকে কিছু বলবেন না যেন। এখানেও তাই অনেক ঋণ হয়ে গেছিল—টাকা পেলেই কিছু কিছু করে তার শোধ দিতে হয়। অন্য পাবলিশারের কাছেও টাকা পাচ্ছিনে চিঠি লিখে ; লেখার দামও পাচ্ছিনে—যেখানে যেখানে পাবার কথা। আপনাকে আমি অসঙ্কোচে সব কথা লিখলাম বলে আপনার হাতে না থাকলে বিব্রত হবার দরকার নেই। আমি তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবো না। এ 'নিত নাই'–এর সমস্যা পূরণ আমাকে করতে হবে এবার কলকাতা গিয়ে।

হ্যাঁ, ফাল্গুনের সওগাতের জন্য ঐ গাজী আবদুল করিমের ওপর লেখা কবিতাটা পাঠিয়ে দেবো ২/৪ দিনের মধ্যেই শেষ করে। গজল–গান দুটো মাঘের সওগাতে দিতে পারেন, মাঝে বা শেষে। বার্ষিক সওগাতের আর কত দেরি? পত্রোত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম।

দলশুদ্ধ সকলে ভালোবাসা নিন। এখানে আর সকলে ভালো। শামসুদ্দিন সাহেবকে আমার জন্য অনেক গাল খেতে হচ্ছে হয়তো, না? ইতি।

প্রাণসিক্ত
নজরুল

ঊনত্রিশ

[মুরলীধর বসুকে লিখিত।]

কৃষ্ণনগর
২–১–২৭

মুরলীদা,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। ... এখন সন্ধ্যা। আজ সকালে শৈলজার চিঠি পেয়েছি—চিঠি তো নয়, বুক–চাপা কান্না! দুই বাল্যবন্ধু যৌবনের মাঝদরিয়ায় এসে পরস্পরের ভরাডুবি দেখছি। কারুর কিছু করবার শক্তি নেই। ... যতো ভাঙাতরীর ভিড় এক জায়গায়। ...

আমার সম্বন্ধে আমার চেয়ে তুমি বেশি চিন্তিত, কাজেই আমার কোনো চিন্তা নেই, যা করবার তুমি করো।

বসে শুয়ে লিখবার কসরৎ করি আর ভাবি, কূল–কিনারা নেই সে ভাবার। ...

আমার জ্বর আসে কিস্তিবন্দি হারে। দ্বিতীয় কিস্তির সময় কখন আসে—কে জানে।

আজ 'কালিকলম' পেলুম। এত ভালো কাগজ বলেই এর অবস্থা এত মন্দ। ...

—নজরুল

ত্রিশ

[শচীন কর-কে লিখিত।]

কৃষ্ণনগর
৩-১-২৭

স্নেহভাজনেষু—

স্নেহের হাবুল ! তুই এবার এলিনে, আসলে বড় খুশি হতুম। তোকে দেখবার ইচ্ছা ছিল, দেখিনি অনেকদিন তোদের ; কিন্তু তার চেয়েও তোর মাঝে যে কবি-শিশুটি দিন দিন বড় হয়ে উঠেছে তাকে দেখবার বেশি ইচ্ছা ছিল। একদিন তোকে দেখবই, তখন হয়তো সে রীতিমতো ঘোড়দৌড় করছে দেখব। কিন্তু মানুষের ঘোড়দৌড় দেখার চেয়ে শিশুর হাঁটি-হাঁটি পা-পা দেখতে অধিক ভালো লাগে। প্রাণতোষকে দেখলাম, তার মনের কবি বোধ হয় তোর অগ্রজ। তার কবিশিশু এখন বেশ চলতে শিখেছে, আগে পা পিছলাত, এখন পা শক্ত হয়েছে। চলার মিল ছিল না আগে, এখন দুইট্টা চরণই বেশ মিলেমিশে চলছে। —ওর দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল বলে। অর্থাৎ ও কবি বলে পরিচিত হল বলে। কবি হওয়ার মতো দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে আর নেই বলেই এ-কথা বললুম। এদেশে কবির কবিতার সব শব্দগুলো পাটকেল হয়ে ফিরে আসে, আর তা আঘাত করে তার বুকে। অবশ্য সব কবিই যে 'ইট' লেখে এবং তা পাটকেল হয়ে ফিরে আসে, তা নয়। যারা ফুল ফোটায় তাদের মাথাই সবচেয়ে অ-নিরাপদ। ...

তোদের একটি 'মুশায়েরা'র বৈঠক বসে তোর অল্পপরিসর কামরাটিতে—শুনলুম। বড় খুশি হয়েছি শুনে। তোদের আরম্ভ এমনি করেই হোক। বিপুল জগৎকে জানবার আকাঙ্ক্ষা। শিশুর দুরন্ত চলায় গোপন থাকে। পা যখন হবে শক্ত তখন সে আপনি টেনে নিয়ে যাবে শিশুটিকে বিরাট বিস্ময়ের অন্তরে। তোদের কাপের চায়ের রসটুকু প্রাণের চুয়ান রসে মদির হয়ে ওঠে যে, একি কম সৌভাগ্যের কথা? আরম্ভের এই আনন্দ মাঝখানে গিয়ে তিক্ত হয়ে ওঠে, ঈর্ষায় বিস্বাদ হয়ে ওঠে এ আমরা অনুভব করছি যারা মাঝখানে এসে পৌঁছেছি। আমাদের আরম্ভের আনন্দ তোদের চেয়ে কম ছিল না। অন্তত দুরন্তপনা কম ছিল না। ফুল ফোটাবার আনন্দ যদি বিশ্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় তাহলে তার পরিণতি হয় ট্র্যাজেডিতে। আনন্দ-লোকে দ্বন্দ্ব নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এ যারা ভোলে, তারা চালের গুদাম খুলুক গিয়ে—ফুলের বেসাতি না করে। তোদের চলা আজো শুরু হয় নাই, আজো তোদের ফোটার আনন্দ কুঁড়ির প্রাকারে গুমরে মরছে—তাই এই সাবধান করে দেওয়া। উপদেশের বেত উঁচাইনি আমি।

তোর খাটুনি দুনো। তোকে খুব আত্মরক্ষা করে চলতে হবে। এটা আমি খুব বুঝি যে কবিতা গান লেখা যায় হয়তো দিনে একশটা, কিন্তু হিসাব লেখা যায় না ক পাতা। ফুল কুড়ান যায় ঝুড়ি ঝুড়ি, কিন্তু বেগুন বোধ হয় এক ঝুড়ির বেশি তোলা যায় না।

অবশ্য আমার এ মত তাঁদের জন্য নয়, যাঁরা কেয়াফুলের চেয়ে ভুট্টাকে বেশি দামি মনে করেন। ... কবিতা লেখার একটা সোয়াস্তি আছে, কেন না তা লেখা যায় কাছা খুলে, কিন্তু হিসাব লিখতে হয় কাছাকোছা এঁটে, যেন একটা পাইও এ ধার-ওধার না হয়।

এই হিসেবের আর বে-হিসেবের দুটো বিপরীত মুখকে যে তুই কি করে মিল খাইয়েছিস, তা ভেবে আমি অবাক হই। তার উপর তুই পড়ছিস। তুই পড়ছিস, লিখছিস, হিসাব লিখছিস। এই তিন শঙ্কায় পড়ে ত্রিশঙ্কু হয়ে পড়িসনে যেন, এই আশীর্বাদ করি। তোর হিসেবের ফিরিস্তি গরমিল হোক বা চুলোয় যাক—আমার তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু কাব্যের ফেরেশতা বেঁচে থাকুক—এ প্রার্থনা আমি চিরকাল করব। অবশ্য ফেরেশতা কখনো পটল তোলেনি, তুলেছে মুদি বা বেনে। ফেরেশতা অমর কিন্তু অনেক পটলাবেনেকে পটল তুলতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

পড়া ছাড়িসনে তুই, তাহলে তোকে লেখায় ছাড়বে। অবশ্য পণ্ডিত হতে আমি বলছিনে, কিন্তু আমার আনন্দকে প্রকাশের পুঁজি তো আমার থাকা চাই। পণ্ডিত জমায়, সে কৃপণ ; কবি বিলোয়, সে দাতা। কবি নেয়, কিন্তু সে দান করে, —নদীর মতো সে চলে গাইতে গাইতে, দান করে করে, দু'পাশে ফুল ফুটিয়ে। পণ্ডিত নেয়, মাড়োয়ারির ভুঁড়ির মতো ওর পরিধি শুধু বেড়েই চলে নিয়ে নিয়ে, ও আর দিতে চায় না তাই ওর মরণং ধ্রুবঃ। মাড়োয়ারির নিলে সে নালিশ করে, নদীর নিলে সে খুশি হয়। জরদগবের মতো তোর পেটটা গজ গজ করুক বিদ্যেয়, এ আমি বলছিনে ; তাই বলে জানতে শুনতে যতটুকু জানা শোনা দরকার—তা থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখবি কেন? কত ফুল কত পাখি কত গান কত রং—এ আমি উপভোগ করব না?

চিঠি বড় হয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ এটা হয়ে উঠছে প্রবন্ধ—যাকে কবি ভয় করে। ক্লাসে ওর দরকার আছে, কিন্তু মুশায়েরায় ওর প্রবেশ নিষেধ। ফুলের ভাষা, কুঁড়ির ব্যথা, পাতার কথা, লতার আবেগ, তরুর বাণী আমরা শুনতে পাই বুঝতে পারি বলে আচার্য জগদীশের ল্যাবরেটরি দেখতে যাইনে। তরুলতাকে মেরে ছুঁচ ফুটিয়ে তার হাসি-কান্না দেখার প্রবৃত্তি আমার নেই।

কদিন বেশ কাটল। প্রাণতোষটা আজ চলে যাচ্ছে। আবার প্রবেশ করব কাব্যলক্ষ্মীর হারেম-খানায়।

আমি শিগগির কলকাতা যাব, তখন দেখা হবে। তোদের মুশায়েরার সব রসপিপাসু হৃদয় কটিকে অভিনন্দন করছি আমি। তোরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশিস ও স্নেহ-ইচ্ছা নে। তোরা সুন্দর হয়ে ওঠ। ইতি—

নিত্যশুভার্থী
'কাজীদা'

একত্রিশ

[মুরলীধর বসুকে লিখিত।]

কৃষ্ণনগর
১১ই মাঘ, ১৩৩৩

মুরলীদা,

তোমার চিঠি পেলাম। ... আমার জ্বর ছেড়েছে, দুর্বলতা সারেনি। কলকাতা গিয়েই জ্বরে পড়ি। অবশ্য যেতে হয়েছিল পেটের জ্বালায়। ... 'কল্লোলে' গিয়ে সেখানেই শয্যা নিই জ্বরে। তারপর 'সওগাত' অফিসে গিয়ে তিন-চারদিন আর উঠতে পারিনি। সেখানে অসুবিধা হওয়ায় জ্বর নিয়েই চলে আসি। তাই আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। —'কালিকলম' ঠিক সময়ে বেরুবে নিশ্চয়। ফাল্গুনের 'কালিকলমে'র জন্য কী লিখব ভাবছি। —'বঙ্গবাণী'র উত্তর যদি পাও কিছু জানাবে। 'ভয়ানক দুর্দিন' আমার এ-বছর। অথচ কোথাও একটু নড়লে চড়লেই জ্বর আসে।

... তুমি একা পড়েছ—খুব খাটনি পড়ছে না? ভালোবাসা নিও। বাড়ির আর সকলে ভাল। চিঠি দিও অবসর করে।

—নজরুল

বত্রিশ

[খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর
১০-২-২৭

স্নেহভাজনেষু,

মঈন! বহুদিন তোকে আর পত্র দিতে পারিনি! আবার জ্বরে পড়েছিলাম। কাল জ্বরশয্যা ছেড়ে উঠেছি। আজো 'গাজী আবদুল করিম' কবিতাটা শেষ করতে পারিনি জ্বরের জন্য। আজ কিংবা কাল শেষ করবো ইচ্ছা আছে। জ্বরে আমার শরীর ও মনের ক্ষতিই করলে না শুধু, কাব্যেরও বড় ক্ষতি করলে। নাসির উদ্দীন সাহেব না জানি কী মনে করছেন। তুই বুঝিয়ে বলিস তাঁকে। তাঁকে আলাদা চিঠি দিলাম না, একেবারে কবিতার সঙ্গে চিঠি দেব বলে অপেক্ষা করছি। তিনি এতদিনে বোধ হয় বাড়ি হতে ফিরেছেন। ফাল্গুনের 'সওগাতে'র কতদূর? এখানে আর সব ভালো। হাঁ, Variety entertainment-এর কী কতদূর করলি জানাবি। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো আমার পক্ষে। কেননা, আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। আর সপ্তাহ

খানিকের মধ্যে কি পারবিনে? নাসির সাহবকে জিজ্ঞাসা করে জানাস। আমি সেইরূপ ভাবে প্রস্তুত হব। আশা করি ভালো আছিস। অন্যান্য খবর দিস। স্নেহাশিস নে। ইতি—

শুভার্থী
নজরুল

তেত্রিশ

[১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি রবিবার ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয় ; সম্মেলনের উদ্বোধন করার জন্য কাজী নজরুল ইসলামকে আমন্ত্রণ করা হয়। সেই উপলক্ষে সাহিত্য সমাজের সম্পাদক আবুল হুসেন সাহেবকে কবি এই পত্রখানি লেখেন।]

কৃষ্ণনগর
১০-২-২৭

প্রিয় আবুল হুসেন সাহেব,

আপনার সাদর আমন্ত্রণলিপি নব-ফাল্গুনের দখিন হাওয়ার মতোই খুশ-খবরি নিয়ে এসেছে। আমার শরীর জ্বরের উপর্যুপরি আক্রমণে জর্জরিত হয়ে উঠেছে। তাই মন আমার এ আনন্দবার্তা পেয়ে যতো হাল্কাই হয়ে উঠুক, শরীর হয়তো তেমন হাল্কা হয়ে উঠতে পারছে না। আর শরীর যদি এমনি ভারি হয়ে থাকে আর কিছুদিন, তাহলে এর ভার কোনো রেলগাড়িতেই বইতে সমর্থ হবে না। আমার বর্তমান অভিভাবক জ্বর, তারই আদেশের প্রতীক্ষা করছি।

বসন্তের হাওয়া জরা ও জ্বর সইতে পারে না। তাই আশায় বসে আছি, কখন আসবে দখিন হাওয়া—আসবে আমার রোগশয্যায় ফুলের আমন্ত্রণলিপি।

আপনাদের আনন্দ-মহফিলে আমার বাঁশি যদি নাই বাজে, তাহলেও আপনাদের খুশির 'জাম' অপূর্ণ থাকবে না। ঢাকার অতোগুলি কবি-কিশোরের কচি-কণ্ঠের সুরে সুরে আপনাদের সুরলোক মস্ত হয়ে উঠবে। এ আমি অত্যুক্তি করছিনে। ... আপনাদের উৎসব-দিনের 'মুতরিব' হবার গৌরব আমায় দিতে চান ; কিন্তু যে গান আমি গাঁথব, তার সুর যে আপনাদের মনের বেণুকুঞ্জে। কোন্ আনন্দ-মানিক আপনাদের উৎসবের মালার মধ্যমণি, কোন্ বেদনা-সুন্দর এ দেবতা, কোন্ প্রকাশোন্মুখ অন্তরে এর পূজা-বেদি—এর আভাস না পেলে আমি কি করে আগমনী গান রচনা করি? যদি আমাকেই গাইতে হয় এ আনন্দ-জলসার আগমনী, তাহলে আপনাদের উৎসবের অন্তরের কথা—যাকে কেন্দ্র করে সুর-লক্ষ্মীর নৃত্য চলবে—শিগগির জানাবেন।

আর আমার বাণী? তার প্রকাশ কি শোভন হবে আপনাদের নৌরোজের মজলিশে? আমার সরস্বতী অশ্রুমতী, —বেদনা-শতদলে তার চরণ। যুগযুগান্তরের অশ্রুর অঞ্জলি এসে পড়ছে তাঁর পায়ে। এ ক্রন্দসীর গান শুধু একটানা ক্রন্দন। আনন্দ-উৎসবের নৌরাতির দীপশিখা নিভে যায় এর হতাশ্বাসে। তবু হয়তো সে দুঃস্বপ্ন দেখার মতো

সুন্দরের নেশায় আনন্দ-গান গেয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। চোখের জলে ধোওয়া সে সুর। বেদনায় রাঙা সে হাসি। আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না। আমার সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্বশী নয়, মর্ত্যের শকুন্তলা—বিরহ সার্থক হোক, সুন্দর হোক পূর্ণ হোক ! ইতি—

প্রীতিসিক্ত
নজরুল ইসলাম

চৌত্রিশ

[ব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর
১১-৩-২৭

স্নেহভাজনেষু—

ব্রজ ! আগামী পরশু রবিবার রাত্তিরে আমার খোকার মুখে ভাত দেওয়া উপলক্ষে বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ করছি। কোলকাতার ও স্থানীয় অনেক বন্ধু আসবেন। তুমি সেদিন অবশ্য এস। না এলে দুঃখিত হব। হয় সকালের চট্টগ্রাম মেলে কিম্বা দুপুর ১টা ৩৪ মিনিটের সময় Calcutta মুর্শিদাবাদ প্যাসেঞ্জারে আসবে। এই দুটি ছাড়া আর ট্রেন নেই। এলে অন্যান্য কথা হবে।

তোমার প্রেরিত টাকা চব্বিশটা পেয়েছি। 'ফণিমনসা'র প্রুফ পেলাম আজ। স্নেহাশিস নাও। ইতি—

শুভার্থী
নজরুল

পঁয়ত্রিশ

[ব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত]

কৃষ্ণনগর
২০-৪-২৭

স্নেহের বর্মণ,

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। প্রায় প্রত্যহ slow fever আসিতেছে। গোপালের টাকা পাঠাইবার কথা ছিল। আজো টাকা পাঠাইল না। বাড়িতে একটা পয়সাও নাই।

তুমি পত্রপাঠমাত্রই অন্তত কুড়িটি টাকা T.M.O. করে পাঠাও। নইলে বড় মুশকিলে পড়ব। বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সা নাই। টাকা না পাঠালে বড় বিপদে পড়ব। বহু দেনা করেছি, আর টাকা ধার পাওয়া যাবে না এখানে !

তোমার
কাজীদা

ছত্রিশ

[মন্মথ রায়কে লিখিত]

—নওরোজ—
সচিত্র মাসিক পত্র

কার্যালয়
৪০ বি মেছুয়াবাজার স্ট্রিট
কলিকাতা ৪-৭-২৭

জয়যুক্তেষু,

আপনার স্নিগ্ধ চিঠি না-চাওয়ার পথ দিয়ে এসে আমায় যতো না বিস্মিত করেছে, তার চেয়ে আনন্দ দিয়েছে ঢের বেশি।

আমি এতটা আশা করতে পারিনি যে, আমার প্রশংসা আপনার ললাটের প্রদীপ্ত প্রতিভাশিখাকে উজ্জ্বলতর করবে—বা সোজা কথায়, আমার প্রশংসায় আপনার মতো অসীম শক্তিশালী দুরন্ত সাহসী লেখকের কিছু 'এসে যায়'।

আমার মনের চেয়ে চোখের স্মরণশক্তি একটু বেশি। দেখলে তাকে হয়তো গ্রহান্তরেও চিনতে পারি—কিন্তু শুনলে তাকে পথান্তরেও চিনতে বেগ পেতে হয়। কাজেই নন্দ-চৌধুরী-লেনের দেখা আপনাকে কাব্যের নন্দন-কাননের রাজপথে দেখেও চিনতে আমার এতোটুকু দেরি হয়নি। নন্দ-চৌধুরী-লেনের সেই সুশ্রী ছিপছিপে তরুণের চোখে অপ্রকাশ প্রতিভার যে আয়োজন দেখেছিলাম তার পরিপূর্ণ বিকাশের সমারোহ আজ আমাকে শুধু বিস্মিত করেনি—পূজারী করে তুলেছে। এক-বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দিঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দুচোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায়—এ বললে আপনি কি মনে করবেন জানিনে, তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়ে ভালো করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।

নন্দ-চৌধুরী-লেনের আপনার 'লোমহর্ষণ' নাটকটা শুনেছিলাম কি না মনে নেই, যখন মনে নেই—তখন ওটাতে হয়তো 'লোমহর্ষণ'ই হয়েছিল, 'প্রাণহর্ষণ' হয়নি ; হলে নিশ্চয় মনে থাকতো। তার জন্যে দুঃখ করিনে, কারণ আপনাকে তো মনে আছে। শুধু সুশ্রী আপনাকে দেখেছিলাম সেদিন, আজ সুন্দর তোমায় দেখছি।

পবিত্রের মারফত আপনার প্রথম লেখা পড়ি—'মুক্তির ডাক'। পড়ে আমার কেমন লাগে পবিত্র লিখতে বলেছিল। ইচ্ছে করেই লিখিনি। সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি-

–কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মতো আলো ও অভিমান আমার নেই। আজো আপনার শক্তিকে অন্তর দিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি মাত্র, তাকে প্রশংসা করিনি। আপনাকে প্রশংসা করার শক্তি আমার নেই।

আপনার 'মুক্তির ডাক'–এর পর আমি 'আজগর মণি' ও 'কাজল লেখা' পড়ি। পড়ে মুগ্ধ হই, কিন্তু মুগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত থাকিনি, যাকে পেয়েছি তাকেই পড়িয়েছি। কিছুদিন আগে নোয়াখালি যাই, সেখান থেকে লক্ষ্মীপুরে গিয়ে সুধাংশু বলে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। বোধ হয় আপনিও চেনেন তাকে। তাকে ধন্যবাদ, সে–ই আমায় তিনখানা 'বাসন্তিকা' দেখায়। তাতেই আপনার অমর সৃষ্টি, 'সেমিরিমিস', 'ইলা' ও 'স্মৃতি ছায়া' কি 'ছাপ' পড়ি। 'সেমিরিমিস' পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা বলে উঠতে পারছিনে। যতোবার পড়ি, ততোবারই নূতন মনে হয়। আজ ইউরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হয়ে উঠতো। এ ঈর্ষার এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও—দুঃখিত যতোই হই।

'ইলা'ও আমার বুকে কম দোলা দেয়নি—কিন্তু 'সেমিরিমিস'–এ আমি যেন তলিয়ে গেছি। এতো বড় সৃষ্টি ! —দুঃসাহসের দিকে থেকে বলছিনে—এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়েই বলছি—আমায় আর কারুর কোনো লেখা এতো বিচলিত করেনি।

আপনার লেখার একটা ফিরিস্তি দেখেছি 'বাসন্তিকা'য় আপনার শেষ চিঠিতে, কিন্তু তার সবগুলি পড়ে উঠবার সুযোগ–সুবিধে পাইনি বলে নিজেকে দুর্ভাগ্য মনে করছি।

আমার ভয় হয়, উকিল–মন্মথ 'সেমিরিমিসে'র মন্মথকে ভস্ম না করে ফেলে ! 'ল' আর অঙ্কাতঙ্ক আমার ছেলেবেলা থেকে।

আমি ইঙ্গিত দিতে কি পারব আপনার মতো শিল্পীকে আপনার সৃষ্টি বিষয়ে? আমার মনে হয়, 'তাজমহল' সৃষ্টির কল্পনাকে কেন্দ্র করে লেখা আপনার হাত দিয়ে যা বেরুবে, তা সত্যিকার তাজমহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে—'সেমিরিমিসে'র স্রষ্টাকে এ লিখতে এতোটুকু কুণ্ঠা আমার নেই। —আপনার মত জানলে খুশি হব।

'নওরোজ' বেরিয়েছে—ওতে আমার এক মিতে লেখককে দেখবেন, তবে তিনি 'নজিরুল' নজরুল নন–আকার ইকারের দন্তধারণ করে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করেছেন। তাঁর ভালো লেখা পড়ে, তাঁর প্রাপ্য নজরুলকে দেবেন না যেন।

সত্যই অনেক বকলাম—আপনার অনুরোধই রক্ষা করা গেল। তবে বকাটা বড্ডো তাড়াতাড়ি হলো—তাই এ বকাটা বোকার মতোই মনে হবে।

P.S. আপনার নৃপেনদার সহযোগে আমিও অনুরোধ জানাচ্ছি নওরোজের হাটে সওদা করতে আসার জন্য। দেরি করলে চলবে না। কখন লেখা পাঠাচ্ছেন জানাবেন।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি—

নবনাটিকা–দর্শনাকাঙ্ক্ষী
নজরুল ইসলাম

সাঁইত্রিশ

[এই পত্রখানির শেষে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লেখা আছে—'শ্রীমান মহ্‌ফুজুর রহমান খান কল্যাণীয়েষু, College Muslim Hostel, Karatia. P.O Dist. Mymensingh.']

কৃষ্ণনগর
১২-১১-২৭

স্নেহভাজনেষু—

কাল তোমার চিঠি পেয়েছি এবং আজই তার উত্তর দিচ্ছি দেখে তোমার চেয়ে অনেক বেশি আশ্চর্য হচ্ছি আমি নিজে। তুমি তো জান, ঘাড়ে নেহাৎ খেয়াল না চড়লে আমি কারুর চিঠির উত্তর দিইনে। আজ আমার চিঠি লেখার ভূতে পেয়েছে। এইমাত্র দু'দুটো বড় চিঠি লিখে তোমারটাতে হাত দিয়েছি। তুমি হয়তো আশান্বিত হয়ে উঠছো এ শুনে যে এইবার বুঝি আমার কপাল ফিরেছে। কপালে আমার চুন হয়তো পড়েছে, —কিন্তু ও-চুনকামে তার কালি আজো ঢাকা পড়ে নি।

চিঠি যে লিখতুম না কোনোদিন—একথা বললে তোমরা 'বাঁধনহারা'র খোঁটা দেবে। সত্যিই চিঠি এককালে বড্ডো বেশি লিখেছি বলেই আজ একেবারে লিখিনে। এককালে ধূমকেতুর মতো ঘুরে বেড়িয়েছি বলেই আজ ধ্যানশান্ত হবার সাধনা করছি—একান্ত নিরালায় সরে গিয়ে।

আমার চিঠি—লেখা কলমটায় জং ধরে গেছিল, তোমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব নতুন নিব লাগিয়ে দিয়েছেন তাতে। কিন্তু নিব লাগালে হবে কি—অনভ্যাসের দরুন এখন যা পত্র লিখছি—তা হয়ে উঠছে ছত্র। প্রিন্সিপাল সাহেবের পত্রোত্তরে যা লিখেছি 'সওগাতে' দেখবে তা কী রকম কিম্ভুতকিমাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেহারা দেখে আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেছি, তোমার তো কথাই নাই। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি পুরু। ওঁর চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে অনেক অবান্তর কথা লিখেছি তবে তা সজ্ঞানেই লিখেছি। যেখানে যাকে যা বলবার ছিল, তা বলে নিয়েছি এই সুযোগে।

ইবরাহিম খান সাহেব ও আকরম হোসেন সাহেবকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবে। তাঁরা আমায় স্মরণ করেন, এ আমার সৌভাগ্যকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে—যখন আমার বিস্মরণের রাতি ঘনিয়ে এসেছে।

তুমি যখন করটিয়া গেছ, তখন তোমার আদর্শ মহত্তর হয়ে দেখা দেবে—এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। আমি না দেখলেও জানি করটিয়া শুধু একটা সাধারণ বিদ্যাপীঠ নয়—এ একটা অভিনব জ্ঞান-কেন্দ্র। অতীতের আল-আজহার, বোগদাদের স্বপ্ন দেখেছে করটিয়া।

'নওরোজ' বন্ধ হবে কি না জানি না, তবে আজো আশ্বিন-সংখ্যা বেরোয়নি। আমি ওর লেখক ছিলুম মাত্র, ওর সাথে অন্য সম্বন্ধ ছিল না। কাজেই ওর ভিতরের কথা জানি না। ওর সম্পর্কে থাকা আমার আর নিরাপদ নয় ভেবেই ওর থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন

করেছি। অগ্রহায়ণ থেকে 'সওগাতে'ই লিখব। প্রিন্সিপাল সাহেবের চিঠি পড়ে 'নওরোজ' ছাড়ার কথা সত্য নয়।

সর্বসাধারণের কাছে আমার বিদ্যাবুদ্ধির বা শক্তির পরীক্ষা দিবার উৎসাহ কমে গেছে—তাই আজ আর বেরোইনে বড়, ঘর থেকে। অধিক মেলামেশার সুবিধে নিয়ে মানুষ অনেক মিথ্যা কথার সৃষ্টি করে। ভয় আমি ওকে করিনে, কিন্তু নিন্দুকের এই কদর্যতা নিয়ে আলোচনা করবার প্রবৃত্তি নেই আমার। আমার এ অহঙ্কার নেই যে, আমি ছাড়া দেশ উদ্ধার হবে না। কোলাহল অনেক করেছি, এইবার গানে গানে প্রাণের আলাপ।

আমি তোমাদের—তরুণদের হাত তৈরি করবার ভার নিতে গিয়ে ভুল করেছিলাম-–ও কাজ কর্মীর। ও-ভারও যে নিতে পারিনে, তা নয়। কিন্তু মন তৈরির ভার নেবে কে তাহলে? দুই-ই সম্ভব হতো আমায় দিয়ে, যদি আমায় অতিসাধারণ জীবনযাপনের জন্য এতো ভাবতে না হত। আমি অর্থ-উপার্জন ছাড়া বোধ হয় জগতের সবকিছু করতে পারি। ঐ জিনিসটের মালিক হতে হলে যতোটা নিচে নামতে হয়, ততটা নামবার দুঃসাহস আমার নেই।

এক-এক সময় নিবিড় বেদনার সঙ্গে অনুভব করি যে, কতো বিরাট সম্ভাবনার আশা আমার অভাবের আওতায় খর্ব হয়ে গেল। দুঃখ হয়, এদেশে কেন জন্মালাম—এই নিন্দুকের হিংসুকের দেশে। তোমরা—তরুণরা যখন আমায় তোমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন কর-–তখন বড় করে অনুভব করি আমার অসহায় পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থার কথা।

মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে? পিঁজরায় পুরে খুঁচিয়ে মেরেছে ওরা। তবু এই মানুষ—এই পশুর জন্যই আমি গান গাই। তারই জন্য আছি আজো বেঁচে। এদেরে আর গালি দেবার অবসর দেব না, এদের মঙ্গলের জন্যই এদের ছেড়ে যাব দূরে। এদের নাগালের বাইরে। মনে হয়, এরা এখন আমায় ভুললেই বেঁচে যাই।—

আমরা ভালো আছি। খোকার ডাক-নাম 'বুলবুল'। পোশাকি নাম—'অরিন্দম খালেদ'। ও এখন চৌদ্দ মাসের হল।

তুমি ও অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ আমার আন্তরিক শুভাশিস গ্রহণ কর। —যাওয়া আমার আর ঘটে উঠবে না—আমি আমার নৌকার মুখ ফিরিয়েছি ভাঁটির পানে। তারি ভাটিয়ালি গান হয়তো শুনতে পাবে এখন। ইতি—

শুভার্থী
নজরুল ইসলাম

আটত্রিশ

[১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। কবি নজরুল ইসলাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ; সেই উপলক্ষেই 'চল্

চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি রচনা করেন। সে-সময়ে তিনি কিছুকাল ঢাকা অবস্থান করেছিলেন। ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সাহিত্য সমাজের তৎকালীন সম্পাদক অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে এই পত্রখানি লেখেন।]

পদ্মা
২৪-২-২৮ সন্ধ্যা
(Vulture স্টিমার)

প্রিয় মোতাহার,

আমার কেবলি মনে পড়ছে (বোধ হয় ব্রাউনিং-এর) একটি লাইন,—'So very mad, so very bad, so very sad it was, yet it was sweet!'*

আর মনে হচ্ছে, ছোট্ট দুটি কথা—'সুন্দর' ও 'বেদনা'। এই দুটি কথাতেই আমি সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারি। ...

'সুন্দর' ও 'বেদনা', এ দুটি পাতার মাঝখানে একটি ফুল—বিকশিত বিশ্ব। একটি মক্ষী-রাণী, তাকে ঘিরেই বিশ্বের মধুচক্র।

বাগানের মালি রাতদিন লাঠি নিয়ে বাগান আগলে আছে? বেচারা মানুষ তাকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। মৌমাছি তার মাথার ওপর দিয়ে গজল-গান গেয়ে বাগানে ঢোকে, সুন্দরের মধুতে ডুবে যায়, অস্ফুট কুঁড়ির কানে বিকাশের বেদনা জাগায় প্রস্ফুটিত যে—তাকে ঝরে পড়ার গান শোনায়; তার এতটুকু বাধে না, দেহেও না, মনেও না। বেচারা মালী—যেন অঙ্কশাস্ত্রী মশাই! হাঁ করে তাকিয়ে দেখে, আর মৌ-মক্ষীর চরিত্রের এবং 'আরো কতো কি'-র সমালোচনা জুড়ে দেয়। মৌ-মক্ষী কিছু শোনে না, সে কেবলি গান করে—সুন্দরের স্তব সে গান। তাকে মারো, সে সুন্দরের স্তব করতে করতেই মরবে।

কোন দ্বিধা নেই, ভয় নেই। তাকে আবার বাঁচিয়ে ছেড়ে দাও, সে আবার সুন্দরের স্তব করবে, আবার বাগানে ঢুকে ফুলের পরাগে অন্ধ হয়ে ভগ্নপক্ষ হয়ে মরবে।

সুষমা-লক্ষ্মীর বাগান আগলে বসে আছে নীতিবিদ বুড়ো সামাজিক হিতকামীর দল,—স্টার্ন, রিজার্ভ, রিজিড, ডিউটিফুল! কতো বড় বড় বিশেষণ তাদের সামনে ও পেছনে! তারা সর্বদা এই 'পোজ' নিয়ে বসে আছে যে, তারা যদি না থাকত, তাহলে একদিনে এই জগতটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত, একটা ভীষণ ওলটপালট হয়ে যেতো।— বেচারা! দেখলে দয়া হয়।

এদের মাঝেই—হয়তো কোটির মাঝে একটি—আসে সুন্দরের ধেয়ানী, কবি। সে রিজার্ভ নয়, ডিউটিফুল নয়, সে কেবলি ভুল করে, সে কেবলি fall on the thorns of

---

* স্মৃতি থেকে লেখা বলে উদ্বৃতি সঠিক ছিল না। হবে—
How sad and bad, and mad it was.!
But then, how it was sweet!

life, he weeps!* সে সমস্ত শাসন সমস্ত বিধিনিষেধের উর্ধ্বে উঠে সুন্দরের স্তব গান করে skylark-এর মতো। সে কেবলি বলে, 'সুন্দর—বিউটিফুল !' মিল্টনের স্বর্গের পাখির মতো তার পা নেই, সে ধূলার পৃথিবী স্পর্শও করে না। ...

কবি এবং মৌ-মক্ষী। বিশ্বের মধু আহরণ করে মধুচক্র রচনা করে গেল এরাই।

কোকিল, পাপিয়া, বৌ-কথা-কও, নাইটিঙ্গেল, বুলবুল—ডিউটিফুল বলে এদের কেউ বদনাম দিতে পারেনি। কোকিল শিশুকে তার রেখে যায় কাকের বাসায়, পাপিয়া তার শিশুর ভার দেয় ছাতার পাখিকে, বৌ-কথা-কও শৈশব কাটায় তিতির পাখির পক্ষপুটে ! তবু আনন্দের গান গেয়ে গেলো এরাই। এরা ছন্নছাড়া, কেবলি ঘুরে বেড়ায়, শ্রী নাই, সামঞ্জস্য নাই, ব্যালেন্স-জ্ঞান নাই ; কোথায় যায় কোথায় থাকে—ভ্যাগাবন্ড এক নম্বর ! ইয়ার ছোকরার দল ! তবু এরাই তো স্বর্গের ইঙ্গিত এনে দিল, সুন্দরের বৈতালিক, বেদনার ঋত্বিক—এই এরাই। শুধু এরাই ! কবি আর বুলবুল !

কবি আর বুলবুল পাপ করে, তারা পাপের অস্তিত্বই মানে না বলে। ভুল করে—ভুলের কাঁটায় ফুল ফোটাতে পারে বলে।

আমার কেবলি সেই হতভাগিনীর কথা মনে পড়ছে—যার উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে 'ডিউটিফুল', আর পায়ের তলায় প্রস্ফুটিত শতদলের মতো 'বিউটিফুল'। পায়ের তলার পদ্ম—তার মৃণাল কাঁটায় ভরা, দুদিনে তার দল ঝরে যায়, পাপড়ি শুকিয়ে পড়ে তবু সে সুন্দর ! দেবতা গ্রেট হতে পারে—কিন্তু সুন্দর নয়। তার আর-সব আছে, চোখে জল নেই।

তুমি মনে করতে পার মোতাহার—আমারি চিরজনমের কবি-প্রিয়া আমারই বুকে শুয়ে কাঁদছে তার স্বর্গের দেবতার জন্য ! মনে কর—সে বলছে আমায়—মাটির ফুল, আর তার দেবতাকে—আকাশের চাঁদ ! আচ্ছা এমনি করে তোমায় কেউ বললে তুমি কী করতে, বল তো !

আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি এক সঙ্গে কবি এবং নজরুল। ঐ কথা শুনে কবি খুশি হয়ে উঠল—বললে—'এই বেদনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, 'তোমায়' এর উর্ধ্বে, তোমার দেবতারও উর্ধ্বে নিয়ে যাব আমি—আমি তোমায় সৃষ্টি করব।'

কিন্তু নজরুল কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। মনে হল সারা বিশ্বের অশ্রুর উৎসমুখ যেন তার ঐ দুটো চোখ। নজরুলের চোখে জল ! খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে, না ? এই চোখের দু ফোঁটা জলের জন্য কত চাতকিই না বুক ফেটে মরে গেল ! চোখের সামনে।

তুমি ভাবছ—আমি কী হেঁয়ালি ! কী সব বকছি—যার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু খুঁজে পাবে না। সত্যিই পাবে না। বুকের গোলক ধাঁধায় কখনো ঢুকেছ কি বন্ধু ? ওর পথ নেই, সমাধান নেই, মাথামুণ্ডু মানে—কিচ্ছু না !

শেলীর Ode to the West Wind-এর একটি পংক্তি I fall upon the thorns of life—I Bleed-এর অনুসরণ। —সম্পাদক

ওর মাঝে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে শিশুর মতো কাঁদা ছাড়া আর কোনো কিছু করবার নেই। তুমি হয়তো পরজন্ম মানো না, তুমি সত্যান্বেষী গণিতজ্ঞ। কিন্তু আমি মানি— আমি কবি।

আমি বিশ্বাস করি যে, যে আমায় এমন করে চোখের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে—সে আমার আজকের নয়, সে আমার জন্ম-জন্মান্তরের, লোক-লোকান্তরের দুখ জাগানিয়া। তার সাথে নব নব লোকে এই চোখের জলে দেখা এবং ছাড়াছাড়ি।

তুমি হয়তো মনে করছ—বেচারা শেলি, বেচারা কিটস্, বেচারা নজরুল ! কেঁদেই মরল।

রবীন্দ্রনাথ আমায় প্রায়ই বলতেন, 'দেখ উন্মাদ, তোর জীবনে শেলির মতো, কিট্স্-এর মতো খুব বড় একটা tragedy আছে, তুই প্রস্তুত হ !' জীবনে সেই ট্রাজেডি দেখবার জন্য আমি কতদিন অকারণে অন্যের জীবনকে অশ্রুর বরষায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছি, কিন্তু আমারই জীবন রয়ে গেছিল বিশুষ্ক মরুভূমির তপ্ত-মেঘের ঊর্ধ্বে শূন্যের মতো। কেবল হাসি কেবল গান! কেবল বিদ্রোহ! —যে বিপুল সমুদ্রের ওপরে এত তরঙ্গোচ্ছ্বাস, এত ফেনপুঞ্জ, তার নিস্তরঙ্গ নিথর অন্ধকার তলার কথা কেউ ভাবে না। তাতে কত বড় বড় জাহাজ-ডুবি হল, সেইটেরই হিসেব রাখলে শুধু, —আর সে যে কত যুগ ধরে আপনার অতল তলায় বসে কেবলই শুক্তির পর শুক্তির বুকে মুক্তা-মালা রচনা করে গেল এবং আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে রইল তার সেই মুক্তামালা, —এ খবর কেউ রাখলে না।

ফরহাদ, মজনুঁ, চন্দ্রপীড়, শাজাহান—এরা যেন এক-একটা দৈত্য-শিশু। কিন্তু স্বর্গকে আজো ম্লান করে রেখেছে এরাই। —ফরহাদ পাগলটা শিরি'র কথায় একটা গোটা পাহাড়কেই কেটে ফেললে। পাহাড়ের সব পাথর শিরি হয়ে উঠল। প্রেমিকের ছোঁয়ায় পাহাড় হয়ে উঠল ফুলের স্তবক। পাষাণের স্তব-গান উঠল ঊর্ধ্বে। কোথায় স্বর্গ ! কোন তলায় রইল পড়ে !

লায়লি—সাধারণ মেয়ে, মজনু তাকে এমন করে সৃষ্টি করে গেল, যেমন করে— দেবতা তো দূরের কথা, ভগবানও সৃষ্টি করতে পারে না !

শাজাহান—আরেক ফরহাদ ! মোমতাজকে শিরির মতো অমর করে গেল তাজমহলের মহাকাব্য রচনা করে। তাজমহল—যেন নির্বাক ভাস্করের পাষাণ স্তব ! মর্মরের মহাকাব্য !

এইখানেই মানুষ স্রষ্টাকে হার মানিয়েছে।

আমি চাচ্ছিলাম এই দুঃখ, এই বেদনা। কত দেশ-দেশান্তরে, গিরি-নদী-বন-পর্বত-মরুভূমি ঘুরেছি আমার এই অশ্রুর দোসরকে খুঁজতে। কোথাও 'দেখা পেয়েছি'— এই আনন্দের বাণী উচ্চারিত হয়নি আমার মুখ দিয়ে।

তাই তো এবারকার তীর্থযাত্রাকে আমি বারেবারে নমস্কার করেছি। এতোদিনে আমি যেন আপনাকে খুঁজে পেলাম। এবারে আমি পেয়েছি—প্রাণের দোসর বন্ধু তোমায় এবং চোখের জলের প্রিয়াকে।

আর আজ লিখতে পারলাম না, বন্ধু! বালিশ চেপে কি বুকের যন্ত্রণার উপশম হয়?

তোমার
নজরুল

ঊনচল্লিশ

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।]

কৃষ্ণনগর
২৫-২-২৮
বিকেল

বন্ধু!

আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। বড্ডো বুকে ব্যথা। ভয় নেই, সেরে যাবে এ ব্যথা। তবে ক্ষত-মুখ সারবে কী না ভবিতব্যই জানে। ক্ষত-মুখের রক্ত মুখ দিয়ে উঠবে কী না জানি না। কিন্তু আমার সুরে, আমার গানে, আমার কাব্যে সে রক্তের যে বন্যা ছুটবে তা কোনোদিনই শুকোবে না।

আমার জীবনে সবচেয়ে বড় অভাব ছিল sadness-এর। কিছুতেইও sad হতে পারছিলাম না। তাই ডুবছিলাম না। কেবল ভেসে বেড়াচ্ছিলাম কিন্তু আজ ডুবেছি, বন্ধু! একেবারে নাগালের অতলতায়।

ভাসে যারা, তাদের কূল মেলা বিচিত্র নয়। কিন্তু যে ডোবে, তার আর উঠবার কোনো ভরসা রইল না। প্রতাপ-শৈবলিনী ভেসেছিল এক সাথে, তাদের কূলও মিলল।

তোমাকে দুদিনেই বুকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছি—তোমার গণিতের পাষাণ-টবে ফুলের চারা দেখতে পেয়েছি বলে। অদ্ভুত লোক তুমি কিন্তু! নিজেকে কেবলি অসুন্দরের আড়াল দিয়ে রাখছ! তোমাকে আমার নখ-দর্পণে দেখতে পাচ্ছি।—নিঃস্বার্থ, কোমল, অভিমানী, প্রেমিক—কিন্তু সবকে গোপন করে চলতে চাও যেন। তোমার তৃষ্ণা আছে, কিন্তু নেলসনের* মতো তোমার তৃষ্ণার বারি অনায়াসে আরেক জনের মুখে তুলে দিতে পার।

তুমি দেবতা! তোমাকে যদি কেউ ভুল করে, তবে তার মতো ভাগ্যহীন আর কেউ নেই।...

তোমায় আমি বুঝি। কিন্তু কোনো নারী—সুন্দরের উপাসিকা নারী—কোনো অঙ্কশাস্ত্রীর কবলে পড়েছে, এ আমি সইতে পারিনে। নারী হবে সুন্দরের অঙ্কলক্ষী, সে অঙ্কশাস্ত্রের ভাঁড়ার রক্ষী হবে কেন? আমি কবি, হিসেব যেখানে—সেখানে আমি খড়গহস্ত। তুমি ভাবতে পার যে, সুন্দরই যার ধ্যান, সেই নারী রাস্তায় বসে দিনের পর দিন পাথর ভাঙবে, আর তারই পাশে সামনে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে

---

* মূল চিঠিতে 'নেলসন' ছিল। আবদুল কাদির সম্পাদনা করে 'সিডনি' করেন।

কর্তব্যপরায়ণ স্টার্ন একটা লোক? এবং ঐ পাথর-ভাঙিয়ে লোকটা মনে করবে—সে একটা খুব বড় কাজ করছে! আর যে-কেউ তাকে দেবতা বলুক,—আমি তাকে বলি প্রাণহীন যক্ষ। অকারণে ভূতের মতো রত্ন-মানিক আগলে বসে আছে। সে রত্ন সেও গলায় নিতে পারে না—অন্যকেও নিতে দেবে না।

হায় রে মূঢ় নারী! তাকে চিরকাল আগলে রইল বলেই যক্ষ হয়ে গেল দেবতা! অঙ্কের পাষাণ-টবে ঘিরে রেখে তিলোত্তমাকে তিলে তিলে মারাই যদি বড় দেবত্ব হয়, তবে মাথায় থাক আমার সে দেবত্ব! আমি ভালোবাসলে তাকে আমার বাঁধন হতে মুক্তি দিই। আমি কবি, আমি জানি কী করে সুন্দরের বুকে ফুল ফোটাতে হয়।

যে যক্ষ রাজকুমারীকে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে পাষাণপুরীতে সোনার খাটে শুইয়ে রাখলে, তার অতি স্নেহকে কি দেবত্ব বলে ভুল করবে? হয়, তাকে মেরে ফেল, কিংবা ছেড়ে দিয়ে বাঁচতে দাও। রূপার কাঠির যাদুতে ঘুমিয়ে রইল বলেই রাজকুমারী হয়তো যক্ষকে অভিশাপ দিলে না—হয়তো বা দেবতাই মনে করলে! কিন্তু যেদিন না-চাওয়ার পথ দিয়ে এল না-দেখা রূপকুমার, তখন কোথায় রইল 'যক্ষ'—কোথায় রইল পাষাণপুরী! আমার মনে হয় কি জান? ঐ দেবতার মোহ যেদিন তেপান্তরের রূপকুমারীর ঘুচবে, সেদিন সে বেঁচে যাবে—বেঁচে যাবে!

সে শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই আমি মালা গাঁথব, গান রচনা করব। আমি এত বড় ধৈর্যহারা বোকা blunt নই যে, যাকে পেলাম—তাকে আমার এই জন্মেই পেতেই হবে। তাকে মড়া-আগলা করে আগলাব, এ-প্রবৃত্তি আমার—কবির—হবে না ; এ তুমি নিশ্চিত জেনো। যাক, বহু জন্ম হারিয়েছি তাকে পাবার জন্য আরো বহু জন্ম অপেক্ষা করতে পারব। তাই তো, যেই শুনলাম, আমার জন্য আর একজনের মুখ ম্লান হয়ে গেছে, অমনি চলে এলাম চিরদিনের মতো।

বোধ হয় তোমার মনে আছে বন্ধু, তোমাকে শেষ অনুরোধ করে এসেছিলাম যে, তুমি কারুর অবিচারের বিচার করো না। কারুর ভুলের প্রতিশোধ ভুল দিয়ে করো না। কে তোমায় অপমান করতে পারে, যদি নিজেকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে পার!

যার কল্যাণ কামনা কর, সে যদি কোনোদিন তোমায় দূর্ভাগ্যবশত বিষদৃষ্টিতেই দেখে—তাকেই বরণ করে নিও। তাকে ত্যাগ করো না। এ তোমার শুধু বন্ধুর অনুরোধই নয়, আরো কিছু।

খবর দিও—সব খবর। বুকের ব্যথা হয়তো তাতে কমবে। এখন কী ইচ্ছে করছে জান? চুপ করে শুয়ে থাকতে, সমস্ত লোকের সংস্রব ত্যাগ করে পদ্মার ধারে একটা একা কুটিরে। হাসি-গান আহার-নিদ্রা সব বিস্বাদ ঠেকছে।

তোমার ছেলেমেয়েদের চুমু দিও—তোমার বৌকে সালাম।

সেরে উঠলে জানাব। তোমার চিঠি চাই। এ চিঠি শুধু তোমার এবং আর একজনের। একে secret মনে করো। আর একজনকে দিও এই চিঠিটা দুদিনের জন্য।

কতকগুলো ঝরা মুকুল দিলাম, নাও।

তোমার
নজরুল

চল্লিশ

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।]

কৃষ্ণনগর
১-৩-২৮
বিকেল

প্রিয় মোতাহার !

তোমায় এবার থেকে মোতিহার বলে ডাকব। কাল সকাল সাড়ে দশটায় তোমার এবং তোমার বোনের চিঠি পেয়েছি। কালই উত্তর দিতাম, কিন্তু পরশু রাত্তির থেকে জ্বরটা ও গলার ব্যথাটা বড্ডো বেড়ে ওঠায় কিছুতেই বসতে পারলাম না। তোমাদের চিঠি পাওয়ার পর থেকে জ্বর আরো বেড়ে ওঠে। সমস্ত দিন-রাত্তির ছিল—আজ ছেড়েছে সকালে। জ্বর ছেড়েছে, কিন্তু গলার ব্যথা সারেনি। কথা বলতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আজ উপোস করছি। আল্লা মিয়া রোজা না-রাখার শোধ তুলে নিলেন দেখছি—আচ্ছা করেই।

সকালে তোমার বোনকে শেষ চিঠি লিখলাম। শেষ চিঠি মানে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে চিঠি দিয়ে আর অপমানিত করব না তাঁকে—এবং আমাকেও।

বড্ডো 'শক' পেয়েছি কাল ওঁর চিঠি পড়ে। শরীর মন দুই অসুখ বলে হয়তো এতটা লাগল—হবেও বা ! কেমন লাগল—জানো? বাজপাখির ভয়ে বেচারি কোকিল রাজকুমারীর ফুলবাগানে লুকোতে গিয়ে বুকে সহসা ব্যাধের তীর বিঁধে যেমন ঘাড়মুড় দুমড়ে পড়ে, তেমনি।

কাল থেকে কোথায় পালাই কোথায় পালাই করছিল মনটা। দৈব মুখ তুলে চেয়েছে। একটু আগে দিলীপের তার পেলাম, —আমি ফিরেছি কী না জানতে চেয়েছ। এক্ষণি তার করলাম—ফিরেছি। কাল দুপুরে কলকাতা যাচ্ছি। এখন সেখানে দু-দশদিন থাকব। এতএব তোমরা কেউ পত্র দিলে সেখানেই দিও।

আমার কলকাতার ঠিকানা—১৫ জেলিয়াটোলা স্ট্রিট, কলিকাতা।

ওখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার (musician) থাকেন, যাকে 'বাঁধন-হারা' dedicate করেছি।

এর মধ্যে তোমাদের চিঠি এসে পড়লে কলকাতায় redirected হয়ে যাবে—ব্যবস্থা করে গেলাম।

তোমার অভিমান-তপ্ত চিঠি আমার যে কী ভালো লাগছে—তা আর কী বলব ! কতো বারই না পড়লাম—যেন প্রিয়ার চিঠি ! ভাগ্যিস তুমি মেয়ে হয়ে জন্মাওনি—নইলে এবার তোমায়ই হয়তো ভালোবেসে ফেলতাম ঢাকা গিয়ে। এমন দর্পণের মতো স্বচ্ছ, শহদের মতো মিষ্টি মন কোথায় পেলে বল তো নীরস গণিতবিদ।

কাল তোমার চিঠিটা যদি এসে না পড়ত—তোমার বোনের চিঠির সাথে, তাহলে কি যে হত আমার—তা আমি ভাবতেও পারিনে।

সে যাক ! আজ যে তোমার চিঠি পাবই—মনে করেছিলাম। কেন চিঠি এল না, বল তো? আমি রবিবারে তোমায় চিঠি পোস্ট করেছি এখানে। সে চিঠি অন্তত মঙ্গলবার

সকালে পাওয়া উচিত ছিল তোমার। দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে Late-fee দিয়ে পোস্ট করতে দিয়েছিলাম। নিজে যেতে পারিনি পোস্ট করতে—কিন্তু যাকে দিয়েছি সে তো ভুল করবে না।

কাল তোমার চিঠি পাবই আশা করছি। বোধ হয় নিরাশ হব না। আর, যদি হই-ই, কী আর করব।

তুমি ছাড়া ঢাকার আর কারুর চিঠি পেতে ভয় করবে আমার—যদি ঐ রকম চিঠি হয়। তবে, ঐ এক চিঠি পেয়েই যতদূর বুঝেছি—আমায় তিনি দ্বিতীয় চিঠি দিয়ে দয়া করবেন না।

তোমার চাওয়া গানটা এবং তোমার লেখা (অগ্রদূত) চিঠিটা পাঠালাম। কপি করবার মতো হাতে জোর নেই, ভাই! কী যে দুর্বল হয়ে গেছি, তা ভাবতে পার না। গলার ভিতর ঘা-ই হল না কি, solid কিছু খেতে পারছিনে। এর জন্যেও অন্তত কলকাতা যাওয়ার দরকার আমার। অগ্রদূতের চিঠিটা তোমার দেখা হলে পর আবার আমায় পাঠিয়ে দিও কলকাতায়। ওটার উপর তোমার কোনো দাবি নেই।

বুদ্ধদেব বসুকে একটা কবিতা পাঠালাম। গজল-গানের স্বরলিপিও পাঠাচ্ছি আজকালের মধ্যে—দেখা হলে বলো।

আবুল হুসেন খুব রেগেছেন, নয়? ওঁর কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ো। আমি যে কেমন করে ফিরে এসেছি, আমিই জানিনে।

আবুল হুসেন, মিঃ বোরা, কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতিকে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করতে বলো।

বুদ্ধদেব খুব রেগে চিঠি দিয়েছে—কেন অমন করে না বলে চলে এলাম। কেন যে এলাম, তা কি আমিই জানি। ...

তুমি নিশ্চয় যাও তোমার বোনের ওখানে। ওঁর দিন কেমন কাটছে। আমার খুব হয়তো বদনাম করছেন—খুব ক্ষুব্ধ হয়তো আমার উপর—না? কী সব আলাপ হল তোমাদের মধ্যে আমায় নিয়ে? কত কথাই না জানতে ইচ্ছা করে, বন্ধু! জানাবে কি?

তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই; সত্য যত বড় নিষ্ঠুর হোক—তাকে সইতে পারব—এ ভরসা আছে আমার।

আচ্ছা মোতিহার! তুমি কোনোদিন কাউকে ভালোবেসেছিলে? তখন তোমার কি মনে হত? খুব কি যন্ত্রণা হতো বুকে? সে ছাড়া জগতের আর সব-কিছুই কি বিস্বাদ ঠেকত তখন?

এত সুন্দর এত কোমল—একমুঠো ফুলের মতো তোমার মন—হয়তো আজো পিষ্ট হয়নি কোনো বেদরদির রাঙা চরণে। তোমার চিঠি পড়ে এক একবার হাসি পাচ্ছে, আবার খুশিও হয়ে উঠছি এই ভেবে যে, তুমি তো পুরুষ মানুষ—তোমারই যদি এই অবস্থা হয় আমায় দেখে বা ভালো লেগে—কোনো তরুণী যদি কোনোদিন ভালোবাসতো আমায়, তাহলে তার কি অবস্থা হত!

তুমি এক জায়গায় লিখেছ, 'মনে হয় যেন একটু দুঃখ পাচ্ছি—কিন্তু কি মধুর সে দুঃখ !' এ দুঃখ কি আমাকে হারিয়ে? আমায় বলতে তোমার সঙ্কোচ হবে না নিশ্চয়। সেতু-ই কি শেষে জলে পড়ে গেল?

আচ্ছা মোতিহার ! তুমি যে দেবতার পায়ে 'চুঙ্গল'* (অবশ্য তোমার এ কথাটার মানে জানি না) এবং মাথায় শিং দেখেছ—সে দেবতা কি আমি? আমার বন্ধুরা আমার গোঁ ও শরীর দেখে আমায় 'বাবা তারকনাথের ষাঁড়' বলে গালি দেন—শত্রুরাও অন্তত এই শরীরটার আর শিং দুটোর জন্যই ভয়ে জড়সড়—কিন্তু এরি মধ্যে তুমি এ-কথা জানলে কি করে—বলত ! এ জানার 'সোর্স' কি 'অন্য কেউ?' তুমি আমার শিং দেখেছ—তিনি তো আমার হয়তো দশটা মুণ্ডু বিশটা হাত দেখেছেন ! কোরানে আছে—শয়তানের চেয়ে সুন্দর কাউকে সৃষ্টি করেননি খোদা। আমরাও তো বিউটিফুলের উপাসক—জগতে সুন্দর ছাড়া পাপ-পুণ্য—মন্দ-ভালোর খবরই রাখিনে—কাজেই শিং যে দেখবে ফুলচন্দন দিতে এসে, তাতে আর বিচিত্র কি !

আচ্ছা, সত্যি করে লিখো তো, আমি যে তোমায় চিঠি দিয়েছি—এ খবর তুমি জেনেছিলে—না দেখেছিলে?

গত বছর এমনি দিনে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ঢাকায়। কিন্তু সেবার তো তুমি অনেকটা দূরে দূরেই ছিলে। এবার কি খুব একটা দুঃখের ভিতর দিয়েই আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেয়েছি? এ রহস্যের তো হদিস খুঁজে পাচ্ছিনে, বন্ধু ! তোমরা গণিতবিদ, ক্রিয়ার ব্রেণ তোমাদের, হয়তো এর Solution খুঁজে পাবে।

'Sympathetic vibration' music-এ আছে জানতাম—ওটা mathematics-এও আছে জেনে mathematics-এর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, telepathyটা কি Science-এর, না কাব্যের? এমনি দু-একটা জায়গায় এসে অঙ্কে-কবিতায়-বিজ্ঞানে-সুরে হৃদয়-বিনিময় হয়ে গেছে বোধ হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে এইবার আমার নতুন করে মনে হচ্ছে—স্রষ্টা গণিতবিদ, না কবি? লোকটা এত হিসেবি অথচ এত সুন্দর !

আমার বেদনার অনেকটা উপশম হয়েছে এই ভেবে যে, অন্তত একজনের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছে আমার পত্রের প্রতীক্ষায় থেকে—তা হোক না সে পুরুষ। আচ্ছা বন্ধু, এত শক্ত মনের পুরুষ, তার কান্না পায় আমার এতটুকু অবহেলায়,—আর একজন নারী—হোক না সে পাষাণ-প্রতিমা—তার কিচ্ছু হয় না? (আমার একজন বন্ধু আছেন প্রফেসার সাতকড়ি মিত্র। রংপুরে ইকনমিক্সের অধ্যাপক। তিনি বাড়ি এলে আমার কাছেই থাকতেন দিনরাত—তখন আমি কলকাতায় থাকতাম। তাই দেখে তাঁর স্ত্রী জানলায় দাঁড়িয়ে আমায় 'সতীন', 'সতীন' বলে গাল দিতেন। অনেক বন্ধুর স্ত্রীরই আমি 'সতীন'।) কিন্তু ভাবতে পারছিনে—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে বন্ধু একজন নারী—সেও এত নিষ্ঠুর হতে পারে?

---

* বাংলাদেশের কথ্য ভাষায় জন্তুর তীক্ষ্ণ নখরকে চোঙ্গল বলা হয়।

যাক, আজ ডাকের সময় যাচ্ছে। আবার লিখব। কলকাতাতে ঐ ঠিকানায় চিঠি দিও। তুমি আমার ভালোবাসা নাও।

খোকা-খুকিদের চুমু দিও। ইতি—

তোমার
নজরুল

একচল্লিশ

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।]

১৫, জেলিয়াটোলা স্ট্রিট, কলিকাতা
৮-৩-২৮
সন্ধ্যা।

প্রিয় মোতিহার !

পরশু বিকেলে এসেছি কলকাতা। ওপরের ঠিকানায় আছি। ওর আগেই আসবার কথা ছিল—অসুখ বেড়ে ওঠায় আসতে পারেনি।

দু-চারদিন এখানেই আছি। মনটা কেবলই পালাই পালাই করছে। কোথায় যাই ঠিক করতে পারছিনে। হঠাৎ কোনোদিন কোনো এক জায়গায় চলে যাব। অবশ্য দু-দশ দিনের জন্য।

যেখানেই যাই—আর কেউ না পাক, তুমি খবর পাবে।

বন্ধু ! তুমি আমার চোখের জলের 'মোতিহার', বাদল-রাতের বুকের বন্ধু। যেদিন এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর আর সবাই আমায় ভুলে যাবে, সেদিন অন্তত তোমার বুক ব্যথিয়ে উঠবে তোমার ঐ ছোট্ট ঘরটিতে শুয়ে—যে ঘরে তুমি আমায় প্রিয়ার মতো জড়িয়ে শুয়েছিলে। অন্তত এইটুকু সান্ত্বনাও নিয়ে যেতে পারব। এ কি কম সৌভাগ্য আমার? সেদিন তোমার শয়নসাথী প্রিয়ার চেয়েও হয়তো বেশি করে মনে পড়বে এই দূরের বন্ধুকে। কেন এ-কথা বলছি শুনবে ?

বন্ধু আমি পেয়েছি—যার সংখ্যা আমি নিজেই করতে পারব না। এরা সবাই আমার হাসির বন্ধু, গানের বন্ধু। ফুলের সওদার খরিদদার এরা। এরা অনেকেই আমার আত্মীয় হয়ে উঠেছে, প্রিয় হয়ে ওঠেনি কেউ !

আমার চোখের জলের বাদলা রাতে এরা কেউ এসে হাত ধরেনি। আমার চোখের জল ! কথাটা শুনলে এরা হেসে কুটপাট হবে !

আমার জীবনের সবচেয়ে গোপন সবচেয়ে করুণ পাতাটির লেখা তোমার কাছে রেখে গেলাম। আমার দিক দিয়ে এর একটা কী যেন প্রয়োজন ছিল ! ...

আচ্ছা, আমার রক্তে রক্তে শেলিকে কিটসকে এতো করে অনুভব করছি কেন? বলতে পার? কিট্‌স্‌-এর প্রিয়া ফ্যানিকে লেখা তাঁর কবিতা পড়ে মনে হচ্ছে, যেন এ কবিতা আমিই লিখে গেছি'। কিট্‌স্‌-এর 'সোর-থ্রোট' হয়েছিল—আর তাতেই মরল ও শেষে—অবশ্য তার সোর্স হার্ট কি না কে বলবে!—কণ্ঠপ্রদাহ রোগে আমিও ভুগছি ঢাকা থেকে এসে অবধি, রক্তও উঠছে মাঝে মাঝে—আর মনে হচ্ছে আমি যেন কিট্‌স্‌। সে কোন ফ্যানির নিষ্করুণ নির্মমতায় হয়তো বা আমারও বুকের চাপ-ধরা রক্ত তেমনি করে কোনদিন শেষ ঝলকে উঠে আমায় বিয়ের বরের মতো করে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে।

তারপর হয়তো বা বড় বড় সভা হবে। কত প্রশংসা কত কবিতা বেরুবে হয়তো আমার নামে! দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, বীর, বিদ্রোহী—বিশেষণের পর বিশেষণ! টেবিল ভেঙে ফেলবে থাপ্পড় মেরে—বক্তার পর বক্তা।

এই অসুন্দর শ্রদ্ধানিবেদনের শ্রাদ্ধ দিনে—বন্ধু! তুমি যেন যেয়ো না। যদি পার, চুপটি করে বসে আমার অলিখিত জীবনের কোনো একটি কথা স্মরণ করো। তোমার ঘরের আঙিনায় বা আশে-পাশে যদি একটি ঝরা, পায়ে-পেষা ফুল পাও, সেইটিকে বুকে চেপে বলো—'বন্ধু আমি তোমায় পেয়েছি।'

আকাশের সবচেয়ে দূরের যে তারাটির দীপ্তি চোখের জলকণার মতো ঝিলমিল করবে—মনে করো সেই তারাটি আমি। আমার নামে তার নামকরণ করো! কেমন?

মৃত্যুকে এত করে মনে করি কেন জান? ওকে আজ আমার সবচেয়ে সুন্দর মনে হচ্ছে বলে। মনে হচেছ, জীবনে যে আমায় ফিরিয়ে দিলে, মরণে সে আমায় বরণ করে নেবে।

সমস্ত বুকটা ব্যথায় দিনরাত টনটন করছে—মনে হচ্ছে, সমস্ত রক্ত যেন ঐখানে এসে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ওর যদি মুক্তি হয়, বেঁচে যাব। কিন্তু কী হবে, কে জানে?

হয়তো দিব্যি বেঁচে থাকব—কিন্তু ঐ বেঁচে থাকাটা অসুন্দর বলেই ওকে যেন দুহাত দিয়ে ঠেলছি। বেঁচে থাকলে হয়তো তাকে হারাব। তারই বুকে তিলে তিলে আমার মৃত্যু হবে।

কেবলই মনে হচ্ছে, কোনো নবলোকের আহ্বান আমি শুনতে পেয়েছি। পৃথিবীর সুধা বিস্বাদ ঠেকছে যেন।...

তোমার চিঠি পেয়ে অবধি, কেবলি ভাবছি আর ভাবছি। কত কথা—কতো কি, তার কি কূল-কিনারা আছে।

কত কথা জানতে ইচ্ছে করে! কিন্তু কি সে কত কথা, তা বলতে পারিনে। দুদিন আগে পারতাম। আজ আর পারব না। হৃদয়ের প্রকাশ যেখানে লজ্জার কথা—হয়তো বা অবমাননাকরও, সেখান পর্যন্ত গিয়ে পঁহুচবে আমার কাঙাল মনের এই করুণ যাচ্না, এ ভাবতেও মনটা কেমন যেন মোচড় খেয়ে ওঠে।

আমার ব্যথার রক্তকে রঙিন খেলা বলে উপহাস যিনি করেন, তিনি হয়তো দেবতা—আমাদের ব্যথা-অশ্রুর বহু ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি 'মাটির নজরুল' হলেও সে-দেবতার কাছে অশ্রুর অঞ্জলি আর নিয়ে যাব না।

কবির কাব্যের প্রতি এত অশ্রদ্ধা যাঁর—তাঁকে শ্রদ্ধা আমি যতই করি না কেন—পুনরায় কাব্যের নৈবেদ্য দিয়ে তাঁকে 'খেলো' করবার দুর্মতি যেন আমার কোনোদিন না জাগে।

ফুল ধূলায় ঝরে পড়ে, পায়ে পিষ্টও হয়, তাই বলেই কি ফুল এত অনাদরের? ভুল করে সে ফুল যদি কারুর কবরীতেই খসে পড়ে, এবং তিনি সেটাকে উপদ্রব বলে মনে করেন, তাহলে ফুলের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে তখনি কারুর পায়ের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করা।

পদ্ম তার আনন্দকে শতদলে বিকশিত করে তোলে বলেই কি ওটা পদ্মের বাড়াবাড়ি? কবি তার আনন্দকে কথায়—ছন্দে সুরে পরিপূর্ণ পদ্মের মতো করে ফুটিয়ে রাঙিয়ে তোলে বলেই কি তার নাম হবে 'খেলো'? অকারণ উচ্ছ্বাস? সুন্দরের অবহেলা আমি সইতে পারিনে বন্ধু, তাই এত জ্বালা।

তুমি আমার 'শেষ চিঠি' দেখেছ, লিখেছ। 'শেষ চিঠি' লিখে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়েছ। তোমার এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব?

জল খুব তরল, সর্বদা টলটলায়মান—কিন্তু যে দেশের ঋতুলক্ষ্মী অতিরিক্ত Cold–
–সে দেশের জলও জমে বরফ হয়ে যায়—শুনেছ? অতিরিক্ত শৈত্যে জল জমে পাথর হয়, ফুল যায় ঝরে, পাতা যায় মরে, হৃদয় যায় শুকিয়ে। ...

ভিক্ষা যদি কেউ তোমার কাছে চাইতেই আসে অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়, তাহলে তাকে ভিক্ষা না-ই দাও, কুকুর লেলিয়ে দিও না যেন। ...

আঘাত আর অপমান, এ দুটোর প্রভেদ বুঝবার মতো মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়তো আছে আমার। আঘাত করবার একটা সীমা আছে, যেটাকে অতিক্রম করলে—আঘাত অসুন্দর হয়ে ওঠে—আর তখনই তার নাম হয় অবমাননা। —গুণীও বীণাকে আঘাত করেই বাজান, তাঁর অঙ্গুলি আঘাতে বীণার কান্না হয়ে ওঠে সুর। সেই বীণাকেই হয়তো আর একজন আঘাত করতে যেয়ে ফেলে ভেঙে।

মন্থনের একটা স্টেজ আসে—যাতে করে সুধা ওঠে। সেইখানেই থামতে হয়। তারপরেও মন্থন চালালে ওঠে বিষ।

যে দেবতাকে পূজা করব—তিনি পাষাণ হন তা সওয়া যায়, কিন্তু তিনি যেখানে আমার পূজার অর্ঘ্য উপদ্রব বলে পায়ে ঠেলেন, সেখানে আমার সান্ত্বনা কোথায় বলতে পারো ... ?

তুমি অনেক কথাই লিখেছ তাঁর হয়ে। তোমায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু একটা কথা তোমায় মনে রাখতে বলি, বন্ধু! আমার বেদনায় সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর সোজা কথাকে রঙিন করে বলে আমায় খুশি করতে চেয়ো না যেন। এতে আমি হয়তো একটু ক্ষুব্ধই হব।

আমার আহত অভিমানের দুঃখে তুমি ব্যথা পেয়ে কী করবে, বন্ধু? সত্যিই আমি হয়তো অতিরিক্ত অভিমানী। কিন্তু তার তো ওষুধ নেই। বীণার তারের মতো নার্ভগুলো সুরে বাঁধা বলেই হয়তো একটু আঘাতে এমন ঝনঝন করে ওঠে। —ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ আমি। যে স্নেহে যে প্রেমে বুক ভরে ওঠে কানায় কানায়—তা কখনো

কোথাও পাইনি। শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা—শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ও নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? তাই হয়তো অল্পেই অভিমান হয়। বুকের রক্ত চোখের জল হয়ে দেখা দেবার আগেই তাকে গলার কাছে প্রাণপণ বলে আটকিয়েছি। এক গুণ দুঃখ হলে দশ গুণ হেসে তার শোধ নিয়েছি। সমাজ রাষ্ট্র মানুষ—সকলের ওপর বিদ্রোহ করেই তো জীবন কাটল !

এবার চিঠির উত্তর দিতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। না জানি কত উদ্বিগ্ন হয়েছ ! কী করি বন্ধু, শরীরটা এত বেশি বেয়াড়া আর হয়নি কখখনো। ওষুধ খেতে প্রবৃত্তি হয় না। কেন যেন 'মরিয়া হইয়া' উঠছি ক্রমেই। বুকের ভিতর কী যেন অভিমান অসহায় বেদনায় ফেনায়িত হয়ে উঠছে। রোজ তাই কেবলি গান গাচ্ছি। ডাকেরও অভাব নেই। রোজ অন্তত দশ জায়গা হতে ডাক আসে। কেবলি মনে হচ্ছে, আমার কথার পালা শেষ হয়েছে, এবার শুধু সুরে সুরে গানে গানে প্রাণের আলাপন। ...

কাল একটি মহিলা বলছিলেন, 'এবার আপনায় বড্ড নতুন নতুন দেখাচ্ছে। যেন পাথর হয়ে গেছেন ! সে হাসি নেই। সে কথার খই ফুটছে কই মুখে ? বেশ ভাবুক ভাবুক দেখাচ্ছে কিন্তু।'

আচ্ছা ভাই মোতিহার, বলতে পারিস—তোর ফিজিক্স শাস্ত্রে আছে কি না জানিনে—আকাশের গ্রহতারার সাথে মানুষের কোনো relation আছে কি না। সত্যিই তারায় তারায় বিরহীরা তাদের প্রিয়ের আশায় অপেক্ষা করে?

আমার সবচেয়ে অবাক করে নিশীথ রাতের তারা। তার শব্দহীন উদয়াস্ত ছেলেবেলা থেকে দেখি আর ভাবি। তুমি হয়তো অবাক হবে, আমি আকাশের প্রায় সব তারাগুলিকে চিনি। তাদের সত্যিকার নাম জানিনে, কিন্তু ওদের প্রত্যেকের নামকরণ করেছি আমার ইচ্ছা মতো। সে কত রকম মিষ্টি মিষ্টি নাম, শুনলে তুমি হাসবে। কোন তারা কোন ঋতুতে কোন দিকে উদয় হয়, সব বলে দিতে পারি। জেলের ভিতর যখন সলিটারি সেলে বন্ধ ছিলাম তখন গরমে ঘুম হত না ; সারারাত জেগে কেবল তারার উদয়াস্ত দেখতাম—তাদের গতিপথে আমার চোখের জল বুলিয়ে দিয়ে বলতাম—'বন্ধু, ওগো আমার নাম-না-জানা বন্ধু ! আমার এই চোখের জলে পিচ্ছিল পথটি ধরে তুমি চলে যাও অস্তপারের পানে, আমি শুধু চুপটি করে দেখি ! হাতে থাকত হাতকড়া—দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা, চোখের জলের রেখা আঁকা থাকত বুকে মুখে—ক্ষীণ ঝর্ণাধারার চলে যাওয়ার রেখা যেমন করে লেখা থাকে।

আজো লিখছি—বন্ধুর ছাদে বসে। সব্বাই ঘুমিয়ে—তুমি ঘুমুচ্ছ প্রিয়ার বাহু-বন্ধনে। আরো কেউ হয়তো ঘুমোচ্ছে—একা—শূন্য ঘরে—কে যেন সে আমার দূরের বন্ধু—তার সুন্দর মুখে নিবু নিবু প্রদীপের ম্লান রেখা পড়ে তাকে আরো সুন্দর আরো করুণ করে তুলেছে—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে তার হৃদয়ের ওঠাপড়া যেন আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি—তার বাম পাশের বাতায়ন দিয়ে একটি তারা হয়তো চেয়ে আছে—গভীর রাতে মুয়াজ্জিনের আজানে আর কোকিলের ঘুম-জড়ানো সুরে মিলে তার স্তব করছে। —'ওগো সুন্দর ! জাগো ! জাগো ! জাগো ! ...'

আচ্ছা বন্ধু, ক ফোটা রক্ত দিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল হয়—তোমাদের বিজ্ঞানে বলতে পারে? এখন কেবলি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—যার উত্তর নেই মীমাংসা নেই সেই সব জিজ্ঞাসা।

যেদিন আমি ঐ দূর তারার দেশে চলে যাব—সেদিন তাকে বলো এই চিঠি দেখিয়ে—সে যেন দুটি ফোঁটা অশ্রু তর্পণ দেয় শুধু আমার নামে! হয়তো আমি সে দিন খুশিতে উল্কা-ফুল হয়ে তার নোটন-খোঁপায় ঝরে পড়ব।

তাকে বলো বন্ধু তার কাছে আমার আর চাওয়ার কিছু নেই। আমি পেয়েছি—তাকে পেয়েছি—আমার বুকের রক্তে, চোখের জলে। বড্ড ঝড় উঠেছিল মনে তাই দুটো ঝাপটা লেগেছে তার চোখে মুখে। আহা! সুন্দর সে, সে সইতে পারবে কেন এ নিষ্ঠুরতা? সে লতার আগায় ফুল, সে কি ঝড়ের দোলা সইতে পারে? দখিনের গজল-গাওয়া মলয়-হাওয়া পশ্চিমের প্রভঞ্জনে পরিণত হবে—সে কি তা জানত? ফুল-বনে কি ঝড় উঠতে আছে?

বল বন্ধু, আমার সকল হৃদয়-মন তারি স্তবগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমার চোখে-মুখে তারই জ্যোতি—সুন্দরের জ্যোতি—ফুটে উঠেছে। পবিত্র শান্ত মাধুরীতে আমার বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছে—দোল পূর্ণিমার রাতে বুড়িগঙ্গায় যেমন করে জোয়ার এসেছিল তেমন করে। আমি তার উদ্দেশে আমার শান্ত স্নিগ্ধ অন্তরের পরিপূর্ণ চিত্তের একটি সশ্রদ্ধ নমস্কার রেখে গেলাম। আমি যেন শুনতে পাই, সে আমায় সর্বান্তকরণে ক্ষমা করেছে। আমার সকল দীনতা সকল অত্যাচার ভুলে আমাকে আমারো ঊর্ধ্বে সে দেখতে পেয়েছে—যেন জানতে পাই। ভুলের কাঁটা ভুলে গিয়ে তার ঊর্ধ্বে ফুলের কথাই যেন সে মনে রাখে।

সত্যিই তো তার—আমার সুন্দরের—চরণ ছোঁয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমার যে দুহাত মাখা কালি। বলো, যে কালি তার রাঙা পায়ে লেগেছিল, চোখের জলে তা ধুয়ে দিয়েছি।

আর—অগ্রদূত! বন্ধু! তোমায়ও আমি নমস্কার—নমস্কার করি। তুমি আমার তারালোকের ছায়াপথ। তোমার বুকেই পা ফেলে আমি আমার সুন্দরের ধ্রুবলোকে ফিরে এসেছি! তুমি সত্যই সেতু, আমার স্বর্গে ওঠার সেতু।

ভয় নেই বন্ধু, তুমি কেন এ ভয় করেছ যে, আমি তার নারীত্বের অবমাননা করব। আমি মানুষের নিচে না উপরে, জানি না; কিন্তু তুমি ভুলে গেছ যে—আমি সুন্দরের ঋত্বিক। আমি দেবতার বর পেলাম না বলে অভিমান করে দুদিন কেঁদেছি বলেই কি তাঁর অবমাননা করব? মানুষ হলে হয়তো পারতাম। কিন্তু বলেছি তো বন্ধু, যে, কবি মানুষের—হয় বহু ঊর্ধ্বে অথবা বহু নিম্নে। হয়তো নিম্নেই। তাই সে ঊর্ধ্বে স্বর্গের পানে তাকিয়ে কেবলি সুন্দরের স্তবগান করে।

আমি হয়তো নিচেই পড়ে থাকব; কিন্তু যাকে সৃষ্টি করব—সে স্বর্গেরও ঊর্ধ্বে আমারও ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। তারপর আমার মুক্তি।

সে যদি আমার কোনো আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বলো—আমি তাকে প্রার্থনার অঞ্জলির মতো এই করপুটে ধরে তুলে ধরতে—নিবেদন করতেই চেয়েছি। —বুকে, মালা করে ধরতে চাইনি। দুর্বলতা এসেছিল, তাকে কাটিয়ে উঠেছি। সে আমার হাতের অঞ্জলি—button hole-এর ফুল-বিলাস নয়। ...

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে আবার লিখছি। কিন্তু আর লিখতে পারছিনে ভাই! চোখের জল কলমের কালি দুই শুকিয়ে গেল।

তোমরা কেমন আছো জানিয়ো। তার কিছু খবর দাও না কেন? না, সেটুকুও নিষেধ করেছে? ঠিক সময়মতো সে ওষুধ খায় তো?

কেবলি কিট্‌স্‌কে স্বপ্ন দেখছি—তার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যানি ব্রাউন। পাথরের মতো। ভালোবাসা নিও। ইতি—

তোমার
নজরুল

এই ঠিকানাতেই চিঠি দিও। এবার 'সওগাতে' কিছু লিখতে পারিনি—শরীর মনের অক্ষমতার জন্য। এ মাসে লিখব অবশ্য। ইতি—

নজরুল

বিয়াল্লিশ

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত।]

১৫, জেলিয়াটোলা স্ট্রিট
কলিকাতা
১০-৩-২৮, রাত্রি ২টা

প্রিয় মোতিহার!

কাল সকালে তোমার চিঠি পেয়েছি। সুন্দরের ছোঁয়া-লাগা চিঠি। তারই আনন্দে অভিভূত হয়ে কেটেছে আমার দুটো দিন। দুটি কথা তাতেই এতো মধু!

কাল ঘুমুতে পারিনি। আজো কিছুতেই ঘুম এল না। তাই তোমায় চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

কাল থেকে মনে হচ্ছে, আমার সব অসুখ সেরে গেছে। সত্যি ভাই, আজ অনেকটা ভালো আছি।

আজ 'দেবদাস' দেখতে গেছিলাম ছায়াচিত্রে—সেকথা পরে লিখছি। রোসো আগে দরকারি কথা কয়টা লিখে নিই।

কাল আমার চিঠি পোস্ট করার একটু পরেই তোমার চিঠি এসে পঁহুচল।

আমার চিঠি বোধ হয়, আজ সন্ধ্যায় পেয়েছ। না? আচ্ছা, তোমরা কলকাতার চিঠি কখন পাও, সকালে না সন্ধ্যায়? মনে করে লিখো কিন্তু।

তাহলে আমি চিঠি দিয়ে তার পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় বসে বসে ভাবব যে, এতক্ষণ তুমি আমার চিঠি পড়ছ।

আচ্ছা ভাই, আমার সব চিঠিই কি তোমার বোনকে দেখাও? বড্ডো জানতে ইচ্ছে করছে। চিঠিগুলো আবার ফিরিয়ে নাও তো?

উনি যদি দেখেন সব চিঠি, তা হলে একটু সাবধানে লিখব, বন্ধু। বাপরে! ওঁর একটা চিঠি পেয়েই তার তাল আজো সামলাতে পারছিনে। ওঁকে রাগাবার দুঃসাহস আর আমার নেই।

লিখি আর ভয়ে বুক দুরু দুরু করে কাঁপে, এই রে! বুঝি বা কোথায় কি বেফাঁস লিখে তাঁকে 'খেলো' করে ফেললাম। এই বুঝি 'কবির খেয়াল' হয়ে গেল লেখাটি! — এমনিতর ভয় সব।

আচ্ছা, তোমাদের গণিতজ্ঞদের মতো দুটি লাইনে দুহাজার কথার উত্তর লেখার কায়দাটা আমায় শিখিয়ে দেবে?

গণিতের প্রতি আমার ভয় কি কোনো দিনই যাবে না? গণিতজ্ঞ লোকেরা বড্ডো কঠোর নিষ্ঠুর হয়—এ অভিযোগের সদুত্তর তুমি ছাড়া বুঝি আরেকটা নেই জগতে। ওদের কেবল intellect, heart নেই।

আমাদের যেমন কেবল heart, intellect নেই। একেবারে যাকে বলে 'সিলি ফুল'।

কিন্তু, একটা সত্যি কথা বলব? হেসো না কিন্তু। আমার এতদিনে ভারি ইচ্ছে করছে অঙ্ক শিখতে। হয়তো চেষ্টা করলে বুঝতে পারি এখনো জিনিসটে! আমি আমার এক চেনা অঙ্কের অধ্যাপকের কাছে পরশু অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করলাম অঙ্ক নিয়ে। এম. এ. ক্লাসে কি অঙ্ক কষতে হয়—সব শুনলাম সুবোধ বালকের মতো রীতিমতো মন দিয়ে। শুনে তুমি অবাক হবে যে, আমার এতে উৎসাহ বাড়ল বই কমল না। কেন যেন এখন আর অত কঠিন বোধ হচ্ছে না ও জিনিসটে। আমি যদি বি.এ-টা পাস করে রাখতাম, তাহলে দেখিয়ে দিতাম যে, এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস কবিও হতে পারে ইচ্ছে করলে।

যদি ঢাকায় থাকতাম, তাহলে তোমার কাছে আবার একবার যাদব চক্রবর্তীর Algebra নিয়ে বসে যেতাম—একেবারে $(a+b)^2$ থেকে শুরু করে। সত্যি ভাই মোতিহার, আমায় অঙ্ক শেখাবে? তাহলে ঢাকায় যেতে রাজি আছি। এমন অঙ্ক শিখিয়ে দিতে পারে না কেউ, যাতে করে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম. এ.-কে হারিয়ে দিতে পারি?

এখন কেবলি মনে হচ্ছে, কী ছাই করলাম কবিতা লিখে! তার চেয়ে অঙ্কের প্রফেসর হলে ঢের বেশি লাভবান হতে পারতাম।

যাক। তোমার বোনকে বলো, এত দূরে থেকেও তাঁর ভয় আর আমার গেলো না। বেশি চা ও পান খেতে তিনি একদিন এমনি কথায় কথায় নিষেধ করেছিলেন, সেই

অবধি ঐ দুটো জিনিস মুখের কাছে তুলেই এতটুকু হয়ে যাই ভয়ে। হাত কাঁপতে থাকে। আমার স্কুলের অঙ্কের মাস্টার ভোলানাথ বাবুকে মনে পড়েও অত ভয় হয় না।

ওকে বলো, 'অবুঝের মতো অত্যাচার' করতে হয়তো এখন থেকে ভয়ই হবে।

অঙ্কের মহিমা আছে বলতে হবে।

কিন্তু মন কেন এমন করে অবুঝের মতো কেঁদে ওঠে? ওখানে যে আমি নাচার।

ওঁকে একটা অনুরোধ করবে বন্ধু আমার হয়ে? বলো—'যাকে ভাসিয়ে দিয়েছ স্রোতে, তাকে দড়ি বেঁধে ভাসিয়ো না! ওকে তরঙ্গের সাথে ভেসে যেতে দাও, পাহাড় কি চোরাবালি কি সমুদ্দুর এক জায়গায় গিয়ে সে ঠেকবেই।' যেই সে স্রোতে ভাসতে যাবে, অমনি দড়ি ধরে টানবে—এ হয়তো তাঁর খেলা, আমার কিন্তু এ যে মৃত্যু।

একটি ছোট্ট আদেশের বেড়া এমন অলঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে, তা কে জানত!

তোমার চিঠির কতকগুলো দরকারি কথার উত্তর দিতে হবে। কালকের চিঠিতে যা সব লিখেছি, তা তো তোমার চিঠির উত্তর নয়। তা হয়তো 'কবির খেয়াল'।

তবে ও রোগে তোমাকেও ধরেছে বলে তোমায় লিখতে ভয় নেই।

এই চিঠি পড়ে যদি কেউ রাগ করেন, তাহলে তাঁকে বলো—পাথরের রাগ করতে নেই। তাহলে পাথর নড়তে হয়?

তোমার বৌ বেচারির বয়স কত হলো! নিশ্চয়ই এখন ছেলেমানুষ। তার ওপর, তোমার মতো ছেলেমানুষ নিয়ে ঘর করা। ও ব্যাচারীরই বা দোষ কি? —দাঁড়াও বন্ধু, আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিই—তোমার বৌ-ও কি আমার চিঠি পড়েন। দোহাই ভাই, ও কর্মটি করো না। এ চিঠি কেবল তোমার জন্য। আরেকজনকে দেখাতে পার, যদি তাঁর আমার উপর শ্রদ্ধার হানি না হয় এ চিঠি পড়ে।

আমি হাত গুনতে পারি। আমি জানি, তুমি যেদিন শিশির ভাদুড়ীর 'ভ্রমর' দেখে এসেছিলে, সেদিন সারারাত বৌ-এর রসনা-সিক্ত মধু-বিষের আস্বাদ পেয়েছিলে। অন্তত তাঁর মাথার কাঁটাগুলোর চেয়ে বেশি বিঁধেছিল তাঁর কথাগুলো সেদিন তোমার বুকে। তারপর সেদিন চাঁদনি-রাতে কোনো অপরাধের জন্য সারারাত 'দেহি পদ-পল্লবমুদারম' গাইতে হয়েছিল শ্রীমতির পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে! তোমার বৌ-এর ভাগ্য ভালো ভাই, হিংসে হয় এক-একবার! দেখো, তোমার বৌ-ও এই চিঠি লেখার আর প্রিয় সম্ভাষণের ঘটা দেখে আমায় সতীন না ঠাওরান!

যাক উড়ের লড়াই-এর মতো দাম্পত্য কলহ বলতে বহ্বারম্ভে লঘু-ক্রিয়া। এতোদিনে তোমার চিরদিনের 'ওগো' সম্ভাষণের ফাটলে সিমেন্ট পড়েছে বোধ হয়। রোজকার মতো বাহুতে চুড়ির এবং বুকে নাকছাবির চাপের পুলক অনুভব করছ! আমি এইখানে থেকেই শান্তিমন্ত্র পাঠ করছি। তোমার শিগগির আর একটি খোকা হোক! বাঢ়ম্!

ভাগ্যিস এবার 'সওগাতে' কিচ্ছু লিখিনি, তাই 'কারুর' চোখে পড়ার সৌভাগ্য হয়ে গেছে আমার। সেই 'কারুর'কে বলো, লিখলে যে লেখা চোখে পড়ত—তাতে হয়তো চোখ করকর করত! চোখের জল চাই বলে কি 'চোখের বালি' হয়ে সেই জল দেখব?

এতদিন লিখেছি বলেই হয়তো চোখে পড়িনি, আজ না লিখে যদি চোখে পড়ে থাকি, তাহলে আমার না-লেখা অক্ষয় হোক ! ওর পরমায়ু বেড়ে যাক ! —আমি কিন্তু ফাল্গুনের 'সওগাত' আজো চোখে দেখিনি। কাজেই ওতে কি আছে না আছে— জানিনে। অবশ্য আমি ইচ্ছে করলে হয়তো কিছু না কিছু লেখা দিতে পারতাম। ইচ্ছে করেই দিইনি। কিছু ভালো লাগছে না ছাই। কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে— নিরুদ্দেশভাবে। অনেক দূর-দূরান্তরে।

আমার শাদা পাতার জয়জয়কার হোক। ঐ পাতাটাই আজ অন্তত ভুল করেও এক-জনকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

তোমার বোন ঢাকা থাকতে আমি ওখানকার কাজ নেবো না—একথাও শুনেছ?

যাক শুনেইছ যখন, তখন সব কথা খুলেই বলি। তার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই, তিনি আমার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কিভাবে কথা বলেন? তিনি কি তাঁর এবং আমার সব কথাই তোমাকে বলেছেন? না তুমি আন্দাজি আঁচ করে নিয়েছ সব? তুমি কিন্তু খলিফা ছেলে ! ভয়ানক দুষ্ট। কিউপিডের মতো।

তোমার কাছে অন্তত আমার দিকটা তো আর লুকোছাপা নেই। আমার জীবনে এত বড় পরিবর্তন এত বড় সৌভাগ্য আর আসেনি, বন্ধু। যে বেদনার সাথীকে কবিতায় কল্পনায় স্বপ্নে খুঁজে ফিরেছি—রূপে রূপে যার স্ফুলিঙ্গ দেখেছি, তাকে দেখেছি— পেয়েওছি, বুকের বেদনায় চোখের জলে। কয় মুহূর্তের দেখা, তারি মাঝে তাঁর কতো বিরক্তিভাজন হয়েছি, হয়তো বা কত অপরাধও করে ফেলেছি। পাওয়ার বেভুল আনন্দে যে আত্মবিস্মৃতি আমার ঘটেছে, তা তাঁর ঘটেনি। কাজেই আমি কী করেছি, না করেছি, কী লিখেছি, না লিখেছি, তা আমার মনেও নেই, কোনোদিন মনে পড়বেও না। কেবল মনে আছে তাঁকে—তাঁর প্রতিটি গতি-ভঙ্গি, হাসি কথা চলাফেরা সব। ঐ তিনদিনের দেখা তাঁকে—আজো তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে। তেমনি হাসি, তেমনি কথা—সব ! ফিরে ফিরে মনে আসছে ঐ তিনদিনের মানুষটি। একবার নয়, দুবার নয়, দিনে হাজার বার করে। আমার সকল চিন্তা কল্পনা হাসি গান ঘুম জাগরণ—সব কিছুতে দিবারাত্তির জড়িয়ে আছে ঐ কয়েক মুহূর্তের স্মৃতি। ঐ তিনটি দিন আমার কাছে অনন্ত কালের মতো অক্ষয় হয়ে রইল। তার আঘাত, বেদনা, অশ্রু আমার শাশ্বত লোকের শূন্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিয়েছে। এর বেশি পেতে গেলে যে আঘাত পাব, তা সইতে পারব না, বন্ধু ! যে পূজারী দেবতা প্রকাশের আরাধনা করে, তার মতো দুঃসাহসী বোধ হয় কেউ নেই। সুন্দর দেবতাও প্রথমে হয়তো দেখা দেন রুদ্ররূপে। সে আঘাত কি সকলে সইতে পারে?

দূর থেকে অঞ্জলি নিবেদন করব—সকলের আড়ালে সরে গিয়ে আমার হৃদয়রক্ত দিয়ে তাঁকে সৃষ্টি করব, রাঙিয়ে তুলব—শুধু এইটুকু অহঙ্কার থাকুক আমার। তাঁর পায়ের তলার পদ্মটিতেই আমার ধ্রুবকে পাই যেন, তার ঊর্ধ্বে তাকালে স্থির থাকতে পারব না।

আমার পূজার উপচারের আড়ালে লুকোতে পারি যেন নিজেকে—দেবতা যেন পূজাই দেখতে পায় এবার—পূজারীকে নয়। আশীর্বাদ করো—ধ্রুবলোক অক্ষয় হোক এবার।

যাবার দিনে পরিপূর্ণ চিত্তে যেন বলে যেতে পারি, আমি ধন্য হয়ে গেলাম—আমি ভালোবেসে মরলাম। তাঁকে বলো, আমার ধ্যান-লোকে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। আমার আর তাঁকে হারাবার ভয় নেই।

দশই তারিখের লেখা চিঠিটা পোস্ট করিনি ; রোজ মনে করেছি—হয়তো তোমার চিঠি চলে আসবে আজ। তারপরই এটা দেব।

আজ ১৮ই মার্চ। আমি চিঠি পোস্ট করেছি ১০ই তারিখে, অন্তত ১২ই তারিখে তা পেয়েছ। পাওনি কি?

আজো তার উত্তর দিলে না কেন? না, এরি মধ্যে পুরোনো হয়ে গেলাম, বন্ধু? যা হোক একটা লিখো—শান্তি পাব। সব কথার উত্তর না-ই দিলে, এমনি চিঠি দিও।

আমি এখন ভালো আছি। এ কয়দিন বিনা-কাজের ভিড়ে এক চিন্তা ছাড়া—লিখতে পারিনি কিছু।

এর মধ্যে একটা মজা হয়ে গেছে। তেমন কিছু নয়, তবু তোমায় লিখছি। দৈনিক 'বসুমতী'তে দিনকতক আগে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল যে, কোনো ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত—কোনো সুস্থকায় যুবকের কিছু রক্ত পেলে তিনি বাঁচতে পারেন। তিনি কলকাতাতেই থাকেন। আমি রাজি হয়েছি রক্ত দিতে। আজ ডাক্তার পরীক্ষা করবে আমায়। আমার দেহ থেকে রক্ত নিয়ে ওঁর দেহে দেবে। ভয়ের কিছু নেই এতে, তবে দু'চারদিন শুয়ে থাকতে হবে মাত্র। কী হয়, পরে জানাব—কাজেই দু'চারদিন চিঠি দিতে দেরি হলে কিছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি।

এটি আমার—তোমার বন্ধুর অনুরোধ, একথা কাউকে জানিয়ো না যেন। কাউকে মানে—তাঁকেও জানিয়ো না।

আজ আর সময় নেই। এখুনি বেরুব ডাক্তারের কাছে। আমার বুক-ভরা ভালোবাসা নাও। তোমার ছেলেমেয়েদের চুমু খেয়ো আমার হয়ে।

তাঁর খবর একটু দিস ভাই। এ কয়দিন তো শুয়েই থাকব, ওটুকু পেলেও বেঁচে যাব।

তোমার
নজরুল

তেতাল্লিশ

[মিস ফজিলতুন্নেসাকে লিখিত]

১১, ওয়েলেসলি স্ট্রিট
সওগাত অফিস
কলিকাতা
শনিবার, রাত্রি ১২টা

আজ ঈদ। ঈদ মোবারক।

অসহায় হইয়া আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। যদি বিরক্ত করিয়া থাকি, মার্জনা করিবেন। আজ ১৪ দিন হইল মোতাহার সাহেবের কোনো চিঠি পাই নাই।

তাহার শেষ চিঠি পাইয়াছি ১০ই মার্চ। তাহার পর আমি তাহাকে দুইখানা পত্র দিয়াছি ১০ই ও ১৮ই মার্চ। আজো কোনো উত্তর না পাইয়া ছটফট করিতেছি। জানি না তিনি ঢাকায় আছেন কি না, না অসুখ করিয়াছে—কত কি মনে হইতেছে। আপনার শারীরিক সংবাদটুকুও তাহার মারফতই পাইতাম। বড় উদ্বিগ্নে দিন কাটাইতেছি।

আপনি যদি দয়া করিয়া—জানা থাকিলে আজই দু লাইন লিখিয়া তাঁহার খবর জানান, তাহা হইলে সবিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।

তিনি আমার ঐ চিঠি দুইখানা পাইয়াছেন কি-না জানেন কি? তিনি কি আমার উপর রাগ করিয়াছেন? না অন্য কারণ? জানা না থাকিলে জানাইবার দরকার নাই।

আমি সওগাতের লেখা লইয়া বড় ব্যস্ত আছি। কলিকাতায় আরো দুই চারিদিন আছি। পত্র সওগাতের অফিসের ঠিকানাতেই দিবেন।

আপনার শরীর খুবই অসুস্থ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কেবলি মনে হয়, যেন আপনার শরীর ভালো নাই। দুদিনের পরিচয়ের এতো বড় আস্পর্ধাকে আপনি হয়তো ক্ষমা করিবেন না, তবু সত্য কথাই বলিলাম।

—আপনাকে দিয়া বাংলার অন্তত মুসলিম নারী-সমাজের বহু কল্যাণ সাধন হইবে—ইহা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। তাই আপনার অন্তত কুশল সংবাদটুকু মাঝে মাঝে জানিতে বড্ডো ইচ্ছা করে। যদি দয়া করিয়া দুটি কথায় শুধু কেমন আছেন লিখিয়া জানান—তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চির-ঋণী থাকিব। আমার ইহা বিনা অধিকারের দাবি।

আমি এখন বেশ ভালোই আছি। আর একটা কথা। আপনি বার্ষিক সওগাতের জন্য একটি গল্প দিয়াছেন 'শুধু দুদিনের দেখা' শীর্ষক। সওগাত সম্পাদক আমায় তাহা দেখিয়া দিতে দিয়াছেন। কিন্তু আপনার অনুমতি ব্যতীত তাহার একটি অক্ষর বদলাইবারও সাহস নাই আমার, আমি লেখাটি পড়িয়াছি। যদি ধৃষ্টতা মার্জনা করেন—তাহা হইলে আমি উহার এক-আধটু অদল-বদল করিয়া ঠিক গল্প করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি। সামান্য এক আধটু বাড়াইয়া দিলেই উহা একটা ভালো গল্প হইবে। অবশ্য এ স্পর্ধা আমার নাই যে আপনার লেখার তাহাতে কিছুমাত্র সৌন্দর্য বা গৌরব বাড়িবে। মনে হয় গল্পটা বড্ডো তাড়াতাড়ি লিখিয়াছেন। উহা যেন আপনার অযত্ন-লালিতা।

অবশ্য আপনার অসম্মতি থাকিলে যেমন আছে তেমনটা ছাপিবেন সম্পাদক সাহেব। আপনার অমত থাকিলে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, কিছু মাত্র দুঃখিত হইব না তাহাতে।

আর আমার লিখিবার কিছু নাই। আপনার খবরটুকু পাইলেই আমি নিশ্চিত হইতে পারিব।

হাঁ আর একটি কথা। আমার আজ পর্যন্ত লেখা সমস্ত কবিতা ও গানের সর্বাপেক্ষা ভালো যেগুলি সেগুলি চয়ন করিয়া একখানা বই ছাপাইতেছি 'সঞ্চিতা' নাম দিয়া। খুব সম্ভব আর এক মাসের মধ্যেই উহা বাহির হইয়া যাইবে।

আপনি বাংলার মুসলিম নারীদের রানী। আপনার অসামান্য প্রতিভার উদ্দেশে সামান্য কবির অপার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ 'সঞ্চিতা' আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে চাই। আশা করি এজন্য আপনার আর সম্মতিপত্র লইতে হইবে না। আমি ক্ষুদ্র

কবি, আমার জীবনের সঞ্চিত শ্রেষ্ঠ ফুলগুলি দিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা ব্যতীত আপনার প্রতিভার জন্য কি সম্মান করিব?

সুদূর ভক্ত কবির এই একটি নমস্কারকে প্রত্যাখান করিয়া পীড়া দিবেন না—এই আমার আকুল প্রার্থনা।

দুই একদিনের মধ্যেই আমার লেখা সব বইগুলি পাঠাইয়া দিব আপনায়। আপনার মতো বিদূষী মহিলার পড়ার তাহার উপযুক্ত নয়, তবু দিব। আপনার আঙিনায় season flower-এর গাছ দেখিয়াছিলাম যেন। তাহারও তো যত্ন নেন দেখিয়াছি। সুতরাং আমার লেখাও ফেলিবেন না, ভরসা করি।

একটু কষ্ট করিয়া আজই পত্র দিবেন। আপনার ভগ্নিদেরে ও ভাইকে স্নেহাশিস দিবেন।

ইতি—
নজরুল ইসলাম

চুয়াল্লিশ

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত। এই পত্রে উল্লেখিত 'দিলীপ' হচ্ছেন সুরশিল্পী দিলীপকুমার রায়। নজরুলের 'উমর ফারুক' ১৩৩৪ সনের দ্বিতীয় বার্ষিক 'সওগাতে' 'এ মোর অহঙ্কার' ১৩৩৪ চৈত্রের, 'রহস্যময়ী' ১৩৩৫ বৈশাখের এবং 'হিংসাতুর' ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের মাসিক 'সওগাতে' বেরিয়েছিল। 'রহস্যময়ী' কবির 'চক্রবাক' কাব্যে 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ থেকে সওগাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ সনের বৈশাখে ঢাকা থেকে মাসিক 'জাগরণ' বের হয়। 'জাগরণ'-এ নজরুলের 'পেয়ে কেন নাই পাই হৃদয়ে মম' গানটি বেরিয়েছিল।]

The Saogat
11. Wellesly Street
Calcutta
31-3-1928

প্রিয় মোতিহার !

একটু আগে তোমার চিঠি পেলাম। বড্ডো মন যেন কেমন করছে। ... সওগাতের (বার্ষিকের, মাসিকের) লেখা শেষ করেছি বিকেলে। আজ আমার মুক্তি, বাণীর মন্দির-দুয়ার থেকে অলক্ষ্মীর উন্মুক্ত প্রান্তরে। ... গাঁঠরি বাঁধাবাঁধি করে রাখলুম—নিশ্চিন্তে কোথাও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার জন্য। এখখুনি হুগলি যাব, একজন সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে সন্ধ্যায় গান। সেখানে দুদিন থেকে বোধ হয় কৃষ্ণনগরেই যাব। কলকাতায় কুড়ি-একুশ দিন কাটল, আর ভালো লাগে না এক জায়গা। ... তোমার চিঠি হয়তো কৃষ্ণনগর গিয়ে পড়ে আছে। তবে সে চিঠি যেমন redirect করে পাঠাবারও কারো তাগিদ নেই,

তেমনি তা খুলে পড়ে দেখবারও কেউ নেই। আমার চিঠি ওরা খোলে না। তাদের খবর জানতে চেয়েছ—তারা ভালোই আছে হয়তো, কেননা, ওরা ভালো থাকলে চিঠি দেয় না। অন্য কি খবর চাও—লিখো। পারি যদি উত্তর দেবো। ... তুমি ভাবতে পারো বন্ধু, একটি অন্ধকার ঘরে দুজন দুজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে কাঁদছে। ভাবছ কী অমানুষ আমি! নয়? তাই ভাব। ...

তোমার চিঠির জন্য কী করে যে কাটিয়েছি এ কয়দিন, তা যদি বুঝতে তাহলে তোমার চিঠি লিখবার অবসরের অভাব হতো না। আজ যদি তোমার চিঠি না আসত তাহলে তোমায় আর কখনো চিঠি দিতাম না। কি যে রাগ হচ্ছিল তোমার উপর সে কী বলব! এক একবার মনে হয়েছে, খুব করে গাল দিয়ে তোমায় শেষ চিঠি দিই, একেবারে 'সবিনয় নিবেদন' থেকে শুরু করে। কিন্তু তুমি কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় চিঠি দিলে কেন? আমি তো কোনো চিঠিতে লিখিনি বোধ হয় যে, সেখানে যাব এখন।

আমি আবার বৃহস্পতিবার কোলকাতা ফিরে আসব। সেদিন সন্ধ্যায় Broadcasting-এ আমার গান গাইতে হবে। তোমাদের ঢাকায় wireless সেট নেই কারুর? তাহলে শুনতে পেতে হয়তো। কী গ্র্যান্ড হতো বল তো তাহলে! আমি এখান থেকে গান করতাম—আর তোমরা ঢাকা থেকে শুনতে। এখন থেকে হপ্তায় অন্তত দুতিন দিন করে গাইতে হবে আমায় Broad casting-এ। আমি বৃহস্পতিবারে দুটো গান আর আমার নতুন কবিতা 'রহস্যময়ী' আবৃত্তি করব। 'রহস্যময়ী' চৈত্রের 'সওগাতে' বেরুবে। ওর 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' নামটা বদলে 'রহস্যময়ী' করেছি। দেখো এক কাজ করা যায়। Broadcasting Company আমায় একটা মেশিন প্রেজেন্ট করবে—সেইটে তোমায় প্রেজেন্ট করবো আমি। ওরা ওটা দিলেই তোমায় পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু ঠিক করে নিতে পারবে তো? তোমরা বৈজ্ঞানিক, গণিতজ্ঞ, হয়তো পারবে।

লিখছি, আর কেন যেন মন কেঁদে কেঁদে উঠছে। তোমার বোনের অসুখ, অথচ তুমি জানাওনি এর আগে? তুমি না জানালেও রোজ দেখেছি তারে ঘুমের আড়ালে—স্থির, শান্ত, উদাস—রোগ-পাণ্ডুর সন্ধ্যা-তারাটির মতো। কেবলি মনে হয়েছে কতো যেন অসুখ করেছে তার। তবু শফিক এসেছে শুনে অনেকটা আশ্বস্ত হওয়া গেলো। শফিক তার বাঁশিতে, গানে তাঁকে অনেকটা ভালো রাখতে পারবে। শফিক কি দুএক দিনের মধ্যেই চলে যাবে আবার? আচ্ছা ভাই মোতিহার, তোমার কথা তো তোমার বোন শোনেন; তাঁকে বুঝিয়ে তাঁর বাড়ি পাঠিয়ে দাও না। মা-বাপের কোলে থাকলে হয়তো অনেকটা ভালো থাকবে। আমার কেবলই ভয় করে কেন? কী যেন ভয়। তা ঠিক বলতে পারছিনে! শফিককে এখন যেতে মানা করো। কি হবে দুটো মাস কামাই করলে? শফিক থাকলে সে ভালো হয়ে যাবে, অন্তত ওষুধটা খাবে হয়তো সময় মতো।

যাক, তোমার চেয়ে বা আর-কারুর চেয়ে তো তাঁর শুভার্থী কেউ নেই। কিন্তু তবু কেন শান্তি পাই না? দিলীপের গান শোনার পর কি আর আমার গান ভালো লাগবে? এমনিই তো আমার গান ভালো লাগেনি! আফতাবউদ্দিনের বাঁশি শুনলে কেমন? অদ্ভুত লোকটা, না?

তোমার আমন্ত্রণ হয়তো নিলাম। আমার আবার কাজ কি? লিখি, গান করি, আড্ডা দিই, আর ঘুরে বেড়াই—এই বই তো না! তবে শফিককে গান শেখাতে পারবো কি না জানিনে। শুনেছি, শফিক খুব ভালো গান জানে। অন্তত ওর বাঁশি শোনবার জন্য যাব। হাঁ, আর একটা খবর দিই তোমায়। আগামী ১৪ই এপ্রিল আমি গ্রামোফোনে গান ও আবৃত্তি দিচ্ছি। তা বেরুবে হয়তো জুলাই-এ।

বার্ষিক 'সওগাতে' দুটো কবিতা দিলাম—'উমর ফারুক' আর 'হিংসাতুর'। চৈত্রের সওগাতে 'রহস্যময়ী' (কবিতা), 'মৃত্যুক্ষুধা'র continuation, আরেকটা কবিতা ও একটা গজল-গান যাচ্ছে। চৈত্রের 'সওগাত' বেরুবার দেরি আছে। আগে বার্ষিকীটা বেরুবে—আর এক সপ্তাহের মধ্যেই। ... আরো অনেকগুলো কবিতা লিখেছি। ইচ্ছা করে সবগুলো পাঠিয়ে দিই, কিন্তু পাঠাব না—ভয় নেই। যে কাগজে বেরোয়, তা-ই পাঠাব এখন থেকে। 'জাগরণ'-এর জন্য লেখা চাওয়ার অর্থ বুঝলাম না। 'জাগরণ' বলে কাগজ বেরুচ্ছে নাকি, না বেরুবে? কার কাগজ? চিঠি লিখবার আগের একটা ছোট্ট কবিতা লিখছিলাম—সেইটেই দিচ্ছি এই সাথে। দরকার হলে কাজে লাগাতে পার। ... তোমার 'চোখের জ্বালা' হলো কেন আবার? চোখের বালির জন্য?

'দুদিনের দেখা' গল্পটার এমন কিছু বেশি পরিবর্তন করিনি। মাঝে মাঝে দুচারটে লাইন সংযোগ বা বিয়োগ করেছি মাত্র। তাতে তাঁকে ছাড়িয়ে আমি উঠিনি, —তুমি তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলো। ওটা ছাপা হয়ে গেছে। বলো যদি, পাঠিয়ে দিতে পারি ঐ ফর্মাটা। আচ্ছা, ব্যবস্থা করছি ওটা পাঠাবার। ... আজ আমার বইগুলো পাঠাব তাঁকে। সব বই ছাপা নেই। অনেকগুলো out of print হয়ে গেছে। তোমাকেও পাঠাব দুদিন পরে। আজ আর সময় নেই বলে এ-কথা বলছি। অভিমান করো না লক্ষ্মীটি!

এপ্রিলের শেষাশেষি বা ছুটিতে তোমার বোন কোথায় থাকবেন? ঢাকায় না অন্য কোথাও, অবশ্য জানিও। ভুলো না যেন। ছানু কখন ফিরবে? তাড়াতাড়ি উত্তরটা দিও, লক্ষ্মীটি! ভালোবাসা নাও।

শরিফের বিয়ের কী হল? নূরুন্নবী চৌধুরী এসেছিলেন কি?

... রক্তদান করিনি। ডাক্তার-শালা বলে, হার্ট দুর্বল। শালার মাথা! মনে হচ্ছিল, একটা ঘুষি দিয়ে দেখিয়ে দিই কেমন হার্ট দুর্বল। ভিতরের কথা তা নয়। ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক 'মুসলমানের' রক্ত নিতে রাজি হলেন না! হায় রে মানুষ, হায় তার ধর্ম! কিন্তু কোনো হিন্দু যুবক আজো রক্ত দিলে না। লোকটা মরছে—তবুও নেবে না 'নেড়ে'র রক্ত।

দেরি হয়ে গেল—তবু ঈদের কোলাকুলি নাও ... হ্যাঁ, আমি ঢাকা যেতে রাজি আছি তোমার লিখিত শর্তমতো। তবে আমারও একটা শর্ত আছে। সে হচ্ছে, আমি যদি কোনোদিন হঠাৎ চলে আসতে চাই কোনো কারণে,—বা অকারণে, তা হলে আটকে রাখতে পারবে না। এই একটি শর্ত শুধু।

তোমার,
নজরুল

পঁয়তাল্লিশ

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত। ১৩৩৪ আষাঢ় অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর যুগ্ম সম্পাদনায় ঢাকা থেকে মাসিক 'প্রগতি' বের হয়। ১৩৩৪ চৈত্রের 'প্রগতি'তে নজরুলের 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরান-পিয়া' গজল এবং ১৩৩৫ বৈশাখের 'প্রগতি'তে 'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' কবিতা ও 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে' গজল-গান স্বরলিপি-সমেত প্রকাশিত হয়। এ পত্রে উল্লেখিত 'দিলীপ', 'সাহানা', 'কে মল্লিক' হচ্ছেন যথাক্রমে শ্রীদিলীপ কুমার রায়, সাহানা দেবী ও মোহাম্মদ কাসেম মল্লিক।]

১১ ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিট
সওগাত অফিস
কলিকাতা
বৃহস্পতিবার

প্রিয় মোতিহার !

তোমার চিঠি রবিবার সকালে পেয়েছি কৃষ্ণনগরে—কলকাতা এসেছি তিন-চারদিন হল। এখন আবার দিলীপ ফিরে এসেছে—পরশু সকালে। এখন দিন-রাত গান আর গান। দুটো নতুন গান লিখেছি। গিয়ে শোনাব। কিন্তু পনরই তারিখ তো ! যেতে পারছিনে, ভাই। বোধ হয় এপ্রিলের শেষ হপ্তায় যেতে পারব। এখন এতো ব্যস্ত যে, নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই।

ওদিকে বুদ্ধদেবের দলও তাড়া দিচ্ছে যাবার জন্য এবং তাদের ওখানে ওঠার জন্য। একটা ঝগড়া বাধবে দেখেছি। অবশ্য তোমারই জয় হবে—এটাও স্থির নিশ্চয়।

চৈত্রের 'প্রগতি'তে দুটো গজল বেরুবে আমার স্বরলিপি-সমেত। বেরুলে দেখো।

বার্ষিক 'সওগাত' বেরুলো। তোমার বোনকে পাঠালাম একখানা। তোমার খানা এঁরা পাঠাচ্ছেন বলে আর আমি পাঠালাম না। আমার দ্বিতীয় কবিতাটা যায়নি, আর জায়গা ছিল না বলে। সেটা বোধ হয় চৈত্রের 'সওগাতে' যাবে। চৈত্রের 'সওগাত' আর এক সপ্তাহের মধ্যে বেরুবে বলছেন। 'রহস্যময়ী' চৈত্রের সওগাতে যাবে না, বোধ হয় বৈশাখে যাবে।

কতকগুলো লেখা জমেছিল, পাঠিয়ে দিলাম তোমার বোনকে। ভয়ে কিন্তু বুক দুরু দুরু করছে। না জানি কী শাস্তি ভোগ করতে হবে আবার। যাক, তেমন দেখি যদি, তাহলে আর পদ্মা পারই হবো না। যদি খুব রাগেন, আমায় জানিও।

দিলীপ আবার আমায় কৃষ্ণনগর ধরে নিয়ে যাচ্ছে পরশু। কৃষ্ণনগরই ওর আসল বাড়ি। সেখানে তিন-চারদিন হবে হয়তো। তারপর কলকাতা ফিরে আসব। কৃষ্ণনগরের বাসা এবার তুলছি। কলকাতায় বাসা দেখছি—ওদের জন্য। ওরাও নাকি নিশ্চিন্ত হয় তাহলে এবং আমিও হই।

আমার গ্রামোফোনে গান ১৪ই এবং ১৫ই এপ্রিল। চারখানা গান এবং দুটা আবৃত্তি দেবো। দিলীপ, সাহানা, কে মল্লিক প্রভৃতি আরো পাঁচ-সাতজন গাইয়ে আমার গান দেবেন এই সাথে।

রেডিওতে সেদিন আবৃত্তি করিনি ; কেন যেন ভালো লাগল না। তুমি ঠিক ধরেছ, তেওড়া তালে 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে' গানটা গীত হবার আগেই আমার গান হয়েছিল। আবৃত্তি আমিই ইচ্ছা করে করিনি। রেডিওতে গান দেবার আর সময় হবে না এক সপ্তাহের মধ্যে।

আজ খুব তাড়াতাড়ি লিখছি চিঠিটা—বড্ড সময়ের অভাব। যারা সব গ্রামোফোনে আমার গান দেবেন—তাঁদের সুর শিক্ষা দিতে হচ্ছে।

... হ্যাঁ, 'রহস্যময়ী' কবিতাটা তুমি কোথায় পেলে সেদিন? যাক, যে রূপেই পাও, কেমন লেগেছে ওটা তোমার? এখানে সাহিত্যিক আসরে পড়েছিলাম ওটা, সকলেই ভয়ানক প্রশংসা করেছেন। বড় রথীরা বলেছেন, ঐটেই আমার লেখা শ্রেষ্ঠ love poem, গিয়েই একদিন আবৃত্তি করে শোনাব।

শফিক কি চলে গেছে? কোন দিন গেল? এখন তা হলে ওঁকে দেখাশোনা করছে কে? অবশ্য তুমি থাকতে ওঁর চিন্তা নেই। তবু রাত্রে তো ওঁকে হয়তো একা থাকতে হয়। যাক, সীমার অতিরিক্ত হয়তো চিন্তা ও প্রশ্ন করছি। ওঁর শরীর এখন কেমন? ওঁকে নিয়ে একি পাগলের মতো দুশ্চিন্তা আমার। ...

দিলীপ তোমাদের Burdwan House-এ দুদিন গেছিল বলল। তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে খুব—বলল। তোমার এবং তোমার বোনের খুব প্রশংসা করল। আমায় যেতে বলেছে—তাও জানাতে ভোলেনি। ওঁর বাবা-মা কবে আসছেন? একটা কথা, কিছু মনে করো না, তুমি হঠাৎ আমাদের ভাই-বোন পাতিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ কেন বলো তো। যদি ব্যবধানের নদী সৃষ্টি হয়েই যাবে আমাদের মধ্যে, আমি এপারেই থাকবো, কাজ নেই আমার ওপারে গিয়ে মুখোশ পরে। আমি তোমাদের মতো হতে পারিনে, তা আর কী করবে বল। তাঁর ইঙ্গিতে যদি ও-কথা লিখে থাক, তা হলে তাঁকে বলো, আমাকে ভয় করার তাঁর কিছুই নেই। আমি তাঁর বিনানুমতিতে গিয়ে বিরক্ত করবো না—বা তাঁর শান্তির ব্যাঘাত করবো না। বন্ধু, তুমি, অনুগ্রহ করতে গিয়ে আর আমায় দুঃখ দিও না। তুমি মনে করছ হয়তো, কতো অসহায় আমি আজ! তাই বুঝি ঐ মতলব ঠাউরিয়েছ, না? যাক, ওখানে গিয়ে এ নিয়ে দস্তুরমতো ঝগড়া করব তোমার সাথে। —হাঁ, কি নাটক লিখব বলত! ওদের ideal কি, তা তো জানা নেই। নাটকটা ওখানে গিয়েই লিখে দেবো দুদিনে।

আমার ভালোবাসা নাও। খুব অনন্দে আছো, না? এখন নিজের বাড়িই শ্বশুর বাড়ি হয়ে গেছে বুঝি? তাড়াতাড়ি চিঠি দিও। সতীন ভাবীকে সালাম। ছেলেমেয়দের চুমু।

তোমার,
—নজরুল

ছেচল্লিশ

[অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত। এ পত্রে উল্লেখিত 'নলিনীদা' হচ্ছেন কণ্ঠশিল্পী নলিনীকান্ত সরকার। নজরুলের 'নারী' কবিতাটি 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছের অন্তর্গত। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫, ১লা পৌষ ১৩৩২ তারিখে 'সাম্যবাদী' সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।]

১৫ জেলিয়াটোলা স্ট্রিট,
কলিকাতা
সকাল

প্রিয় মোতিহার !

নতুন বছরের নতুন ভালোবাসা নাও। তোমায় চিঠি দিয়েছি বোধ হয় হপ্তা খানিকেরও আগে। পেয়ে উত্তর দিয়েছ কি না জানিনে। মিস ফজিলতুন্নেসাকে আমার দুখানা বই ছাড়া আর সব বই (১৬ খানা) পাঠিয়েছি কাল তা তিনি পেয়েছেন বোধ হয়। তিনি তো দেবেন না, তুমিই প্রাপ্তি-সংবাদটা দিও।

দিলীপ ও নলিনীদা কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন, আমি যেতে পারিনি। গ্রামোফোনে যাঁরা আমার গান দেবেন তাঁদের গান শেখানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এখন তা শেষ হয়েছে। আমি গ্রামোফোনে গান দেব পরশু শুক্রবার বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। চারটা গান এবং 'নারী' আবৃত্তি দেবো আমি নিজে। কেমন উৎরাবে জানিনে। আগামি শনিবার রাত্রি ৮-টা কি ৯টায় গান ও আবৃত্তি করব রেডিওতে। শুনবার চেষ্টা করো ওখান থেকে—এবং কেমন হয় জানিও। এর পরেই কলকাতার প্রোগ্রাম আমার শেষ হবে। আপাতত family কলকাতায় আনা হবে না হয়তো। সুবিধে মতো বাড়ি পাচ্ছিনে। তারপর ঢাকা যাত্রার আয়োজন।

বোধ হয় দিন দশেকের মধ্যেই সেখানে গিয়ে পৌঁছব। যাবার আগে তার করব। কিন্তু তার আগে তোমার চিঠি পাই যেন। পার তো আজই চিঠি দিও জেলিয়াটোলা স্ট্রিটে এবং জানিও আমার এখন যাওয়া ভালো হবে কি না। নানান দিক থেকে এ প্রশ্ন করছি।

আমার বইগুলো ওকে পাঠাতে এত লজ্জা করছিল, সে আর কী বলব। আমি একটুও অত্যুক্তি বা বিনয় করছিনে, ভাই ! ও লেখাগুলোয় আমার অপরিণত মন ও বয়সের এত সুস্পষ্ট ছাপ আছে যে, তা পড়তে এখন আমারই লজ্জা করে। আমার ওপর তোমাদের ধারণা হয়তো শিথিল হয়ে যাবে এসব পাগলের প্রলাপ পড়ে। বইগুলো পাঠানোর পর থেকে আমার আর অসোয়াস্তির অন্ত নেই। পোকা-খেকো ফুল দিয়ে কি দেবতার অর্ঘ্য দেওয়া যায় ? বার্ষিক 'সওগাত' পেয়েছ কি ? দুদিনের দেখায় আমার গোদা হাতের ছাপ লেগে অসুন্দর হয়ে ওঠেনি তো ? উনি কী বললেন ?

ওঁর শরীর কেমন ? শফিক কখন গেল ? ওর বাবা মা কখন আসবেন ? সব লিখো।

আমার কোনো কিছু ভালো লাগে না আর ! এতো আড্ডা গান—কিছুতেই মনকে ডুবাতে পারছিনে। এর কোথায় শেষ—কে জানে ? কেবলি বিস্বাদ ঠেকছে—আলো বাতাস, হাসি—গান ! সব, কী যে হবে কী যে করব—আমি জানিনে।

কী করছ এখন? কেমন করে তোমাদের দিন যাচ্ছে—জানতে এতো ইচ্ছা করে—লোভ হয়।—যাক—চিঠি দিও। ইতি—

তোমার,
নজরুল

সাতচল্লিশ

[আবদুল কাদিরকে লিখিত]

৮/১, পান বাগান লেন
ইন্টালী, কলিকাতা
২-১-২৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমায় চিঠি লিখেছি দেখে তোমার চেয়ে বিস্মিত আমিই বেশি হচ্ছি। চিঠি না লেখাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে, কাজেই ওটাকে যখন দায়ে পড়ে হস্তস্থ করতে হয়, তখন হাতের চেয়ে মনটা যে বেশি বিব্রত হয়ে পড়ে।

আমি চিঠি-পত্তর দিইনে বলে তোমাদের অভিমান যদি কখনো হয় তা হলে অন্তত এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা লাভ করো যে, আমার চিঠি পায় বলে কেউ আমার সুনাম ঘোষণা করেনি কোনোদিন! রবিবাবু চিঠি পেয়েই তার উত্তর দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করেন, তিনি মস্ত বড় কবি। আমি চিঠি পেয়ে তার উত্তর না দিয়েই আমার অভদ্রতার প্রিন্সিপল রক্ষা করি। আমি মুসাফির কবি। ভদ্রতা, সৌজন্য, স্নেহ, প্রীতির খাতির কোনোদিনই করিনি। এই যা সান্ত্বনা। রবিবাবুকে চিঠি দিয়ে লোকে ভাবে, উত্তর এল বলে। আমাকে চিঠি দিয়ে কারুর অশোয়াস্তির আশঙ্কা নেই; সে দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকে, তার চিঠির উত্তর কোনোদিনই পাবে না। ব্যবসাদারির কথাটা আগে বলে নিই, তারপর কবির অকাজের কথা হবে।

এতদিন আমার পাবলিশাররাই আমায় ঠকিয়ে এসেছে। আমার বোধোদয় হয়েছে। তাই মনে করেছি—এবার তার শোধ নেব। এবার থেকে বইগুলো নিজেই প্রকাশ করব। 'চক্রবাক' নাম দিয়ে আমার একখানা কবিতার বই ছাপাতে দিয়েছি। তারির বিজ্ঞাপন পাঠালাম পাঁচখানা তোমার কাছে। তুমি (১) 'জাগরণে' (২) 'সঞ্চয়ে' (৩) 'আল্ ফারুকে' (৪) 'আমানে' ও (৫) 'আজাদে' গিয়ে দিয়ে এসো। যেন তাঁরা তাঁদের কাগজে প্রকাশ করেন। আমি আমার সাধ্যমত তাঁদের কবিতা দিয়ে সাহায্য করব—যদি তাঁরা সাহায্য করেন। ঐ কাগজের সম্পাদকদের আলাদা আলাদা চিঠি দিতে পারলাম না সময়ের ও ধৈর্যের অভাবে। তোমার মারফতেই আমার অনুরোধ জানাচ্ছি সম্পাদক সাহেবানদের।

তুমি তো ফেল করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছ জসীমের সাথে, কাজেই এই হাঁটাহাঁটি করিয়ে তোমার পড়ার ক্ষতি করতে আমার এতোটুকু দ্বিধা নেই। আশা করি এবারও পাশ না করার জন্য তুমি চেষ্টার ত্রুটি করছ না।

ডিগ্রি যদি না–ই পাও, অন্তত তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। ডিগ্রিটা থাকে শেষের দিকে অর্থাৎ ওটা ন্যাজের সামিল। আর ও জিনিসটা অর্জন করার জন্য গর্ব আর যাঁরাই করুন আমি পাইনি বলে বিধাতাকে তার জন্য ধন্যবাদ দিই। ন্যাজ নিয়ে গর্ব করবার মতো বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়নি আমার। আমি মানুষের স্তরে উঠে গেছি ; আমি নির্লাঙ্গুল।

তোমার কাব্য–সাধনা তোমায় যে ডিগ্রি দান করেছে বা দেবে, তা হবে তোমার মাথার অলঙ্কার—শিরোপা। এটাই তোমার সত্যিকার গর্ব করবার জিনিস।

তুমি আর জসীম যেন একই নদীর জোয়ার–ভাঁটা একই স্রোতের রকমফের।

একটু উপদেশের ঢিল ছুঁড়ব ? তুমি আজকের মানুষকে খুশি করতে গিয়ে কালকের অনাগতদের অসম্মান অর্জন করো না যেন ! ঐ রোগে আমার যে সর্বনাশ করেছে, তার ক্ষতিপূরণ বুঝি সারা জীবনেও হবে না। বহুদিন আনন্দলোকের দ্বারে বসে কনসার্টই বাজিয়েছি হাতের বাঁশি ফেলে। তাতে বুকের ব্যথা বেড়েছে বৈ কমেনি। আজ সেই ব্যথার কথাই যখন সুরের সুতোয় গাঁথলাম, তখন ব্যথাও যেমন কমেছে, ক্ষতটাও তেমনি মালায় ঢাকা পড়েছে। আমার চোখের জলে সকলের চোখের জল এসে মিশেছে। আমার বেদনালোক তীর্থলোকে পরিণত হয়েছে। সরব হাততালির লোভের চেয়ে নীরব চোখের জলের অর্ঘ্য তোমার কাব্য হোক—এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই। তোমাদের দেখে কতো আশাই না পোষণ করি ! মনে হয়, আমার গান থামলেও গানের পাখির অভাব হবে না এই নতুন বুলবুলিস্তানে।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের সঙ্গে আলাপ হলো—অনেক কথা। তার মনটাই বড় রত্ন। আর্শির মতো স্বচ্ছ। আর আর খবর দিও। ইতি—

শুভার্থী,
নজরুল ইসলাম

P.S. কংগ্রেসে আসনি, ভালোই করেছ। কংগ্রেস চৌত্রিশ ঘোড়ার রাজাকে এনে পেয়েছে চৌত্রিশ ঘোড়ার ডিম ! দেখা যাক, স্বরাজের কেমন বাচ্চা বেরোয় !

আটচল্লিশ

[বেগম শামসুন নাহার মাহমুদকে লিখিত।]

81 Pan Bagan Lane
Calcutta
4-2-9

চিরআয়ুষ্মতীসু !

ভাই নাহার ! কাল ঠাকুরগাঁ (দিনাজপুর) থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। পেয়ে যেমন খুশি হলাম, তেমনি একটু অবাকও হলাম। খুশি হলাম তার কারণ, আমি

তোমায় চিঠি দিইনি এসে, দিয়েছি বাহারকে। অসম্ভাবিতের দেখা সকলের মনেই একটু দোলা দেয় বই-কি ! অবাক হলাম, আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের সমাজের কোন কোন বিবাহিতা মেয়ে একজন অনাত্মীয়কে (আমি রক্তের সম্পর্কের কথা বলছি ভাই, রেগো না যেন এ কথাটাতে) চিঠি লিখতে সাহস করে, তা সে যতো সহজ চিঠিই হোক। তাছাড়া, তুমি স্বভাবতই একটু অতিরিক্ত shy বা timid !

সত্যি বলতে কি, তোমার চিঠি পেয়ে বড্ড বেশি আনন্দিত হয়েছি।

সলিম কি ফিরেছে ? ওরা অর্থাৎ বাহার, সলিম কখন আসবে কলকাতায় ?

সাতই তারিখে চিঠি দিয়েছ এবং লিখেছ 'কালই কবিতাগুলো পাঠাব'। আজ চৌদ্দ তারিখ। আমার মনে হয় তোমার 'কাল' হয়তো কোন অনাগত দিনকে লক্ষ করে লিখিত হয়েছিল, যার কোন বাঁধা-ধরা তারিখ নেই !

আমি জানি তোমার শরীর কি রকম ভেঙে গেছে, এর ওপর যদি ওসব রাবিশের তোমাকেই নকল-নবিশ হতে হয় তা হলে আমার দুঃখের আর অবধি থাকবে না। একটু পড়তেই তোমার মাথা ধরে, আর লিখতে গেলে মাথা হাত-পা সবগুলো হয়তো conspiracy করে ধরবে। আমার অগতির গতি মেতু মিয়া তো আছেন। তাঁকে দিয়েই না হয় কপি করিয়ে পাঠিয়ে দাও। নইলে ফাল্গুনের কাগজে দেওয়া যাবে না।

কপি প্রেসে দিতে পারছি না লেখাগুলোর জন্যে। বাহারকে আর বলব না। আশা করি তোমায় এ-ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকব। তুমি একটু আদেশ দিয়ে মেতু মিয়া, হুক্কা মিয়া অ্যান্ড কোম্পানিকে দিয়ে এটা করিয়ে নিও।

দুপুরটা তোমার বাচ্চা-ই-সাক্কাওর জন্যে কেমন যেন উদাস ঠেকে। ঐ সময়টুকু এক মুহূর্তের জন্য সে আমায় সব ভুলিয়ে দিত। ওকে আদর জানিয়ো আমার।

নানী আম্মার কান্নার কানায় ভাটির জলের দাগ পড়েছে হয়তো এতোদিনে। ওঁকে বলো আবার জোয়ারের জন্য প্রতীক্ষা করতে। আমার সাম্পানের সব গান আজো লেখা হয়নি। আমার খেয়াপারের শেষ গান হয়তো তিনি শুনে যাবেন।

কলকাতার ঘেরা-টোপে খাঁচায় বন্দি হয়ে নব ফাল্গুনের উৎসব দেখতে পাচ্ছিনে চোখ দিয়ে, কিন্তু মন দিয়ে অনুভব করছি। নীল আকাশ তার মুখচোখ বোধ হয় একটু অতিরিক্ত ধোয়া-মোছা করছে, কেননা তার মুখে যখন তখন সাবানের ফেনা—সাদা মেঘ ফেঁপে উঠতে দেখছি। তার ফিরোজা উড়নি বনে বনে লুটিয়ে পড়ছে। মাধবি লতায় পুষ্পিত বেণী উড়ন্ত ভ্রমরের সারিতে আঁখি-পল্লব, পায়ের কাছে দিঘিভরা পদ্ম। সমস্ত মন খুশিতে বেদনায় টলমল করছে।

রোজায় বোধ হয় আর কোথাও যাচ্ছিনে। তবে বলতেও পারিনে ঠিক করে।

আম্মা কখন নোয়াখালি যাচ্ছেন হবু বউ দেখতে ? ভালো দিনখন দেখে পাঠিও। মহী খুব গলা সাধছে, না ? অর্থাৎ আমি চলে এলেও আমার ভূত এখনও চড়াও করে আছে ?

আমার বন্ধু সিন্ধু, কর্ণফুলীর খবর তো তুমি দিতে পারবে না, তবে 'গুবাক তরুর সারি'র খবর নিশ্চয় দিতে পারবে। ওরা যেন কত শুকিয়ে গেছে, ওদের আঁখি-পল্লবে

হয়তো আজকাল একটু অতিরিক্ত শিশির ঝরে, বাতাসে হয়তো একটু বেশি করে শ্বাস ফেলে। মনের চক্ষে ওদের আমি দেখি আর কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠি। তোমাদের পাড়ার ফাল্গুনী কোকিলরা হয়তো ভোরে তেমনি কোলাহল করে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এতোদিনে হয়তো আমের শাখাগুলি মুকুলে মুকুলে নুয়ে পড়েছে, গন্ধে তোমাদের আঙিনা ভারাতুর হয়ে উঠেছে। আমি যেন এখান থেকে তার মদগন্ধ পাচ্ছি।

আমার বুক-ভরা স্নেহাশিস নাও। নানীআম্মা, আম্মা প্রভৃতিকে সালাম ; অন্য সকলকে ভালোবাসা, শুভাশিস দিও। ইতি—

তোমার—
'নুরুদা'

ঊনপঞ্চাশ

[২৩শে আগস্ট ১৯২৯ সালে 'নবশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি]

শ্রদ্ধাস্পদ,
শ্রীযুক্ত 'নবশক্তি' সম্পাদক মহাশয়,
সবিনয় নিবেদন,

আপনার সাপ্তাহিকের 'মেঘদূত' বিভাগের আমি নিয়মিত পাঠক। মেঘদূতের বার্তা যিনি প্রেরণ করেন, তিনি বিরহী কি-না জানিনা। তবে তিনি যে একজন সত্যিকারের রসিক সুজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু কথা রসিক নন, গীত রসিক। গীত রসিক বলছি— আমিও একজন প্রায় বেতারবাহী সঙ্গীত শ্রোতা বলে। ...আমার নিজের দিক থেকে কিন্তু গোটাকতক কথা বলার আছে এ নিয়ে। তার কারণে আমার গান প্রত্যহই কোন না কোন আর্টিস্ট রেডিওতে গেয়ে থাকেন। আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত তা শুনেও ফেলি। এক উমাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং ক্বচিৎ দু-একজন গাইয়ে ছাড়া অধিকাংশ ভদ্রলোক বা মহিলাই আমার গান ও সুরকে অসহায় ভেবে (বা একা পেয়ে) তার পিণ্ডি এমন করে চটকান যে, মনে হয় ওর গয়ালাভ ওখানেই হয়ে গেল। সে একটা রীতিমতো সুরাসুরে যুদ্ধ।

একদিন শুনলাম কোনো একজন আমার ঠুংরী চালের দুর্গা সুরের 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল' গানটিকে ধ্রুপদের ইমন সুরে গাইছেন এবং তা শুনে আমার গানের আঁখিজল আমার চোখে দেখা দিল। অবশ্য অনুরাগে নয়, রাগে এবং দুঃখে। ভাগ্যিস গান এবং গাইয়ে দুই-ই ছিল নাগালের বাইরে, নইলে সেদিন ভালো করেই সুরাসুরের যুদ্ধ বেধে যেত। আর একদিন একজন রেডিও স্টার (মহিলা) আমার 'আমারে চোখ

ইশারায়' গানটার ন্যাজামুড়ো হাত পা নিয়ে এমন করে তাল গোল পাকিয়ে দিলেন যা দেখে মনে হল বুঝি বা গানটার ওপরে একটা মটোর লরি চলে গেছে। ...

এ রকম প্রায় প্রত্যহই হয়। বেতারের গাইয়ে গুণীজন যাঁরা আমার গান দয়া করে গেয়ে থাকেন, তাঁরা আর একটু দয়া করে গানগুলোর মোটামুটি সুর ও গানের কথা জানবার কষ্ট স্বীকার করেন না। ... আর একটা কথা, বেতারবার্তার বাঙালি কর্তা মহাশয় প্রায় ভুলে যান গীত রচয়িতার নাম ঘোষণা করতে। তাতে করে অনেক অনুকারকের প্রাপ্য প্রশংসা হয়ত আমাদের ওপর এসে পড়ে। গজল-ঠুংরীর নিত্যনব অনুকারক ও অনুকারিকার গানকে শ্রোতারা আমাদের গান মনে করে প্রায়ই অভিযোগ করেন। গালই খেতে হয় বেশির ভাগ। গালই হোক আর প্রশংসাই হোক, যার যেটা প্রাপ্য তার থেকে তাকে বঞ্চিত করা মস্ত বড় অন্যায়। তার চেয়েও বড় অন্যায় সেই গালি বা প্রশংসা যখন কোন নির্দোষ বেচারার কাঁধে এসে পড়ে। আমাদের গান গীত হবার বদলে কিছুই পাইনে, কাজেই বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে এটুকু সৌজন্য হয়তো প্রত্যাশা করতেই পারি যে, তিনি অন্তত গানটা যার রচনা তার নামটা উল্লেখ করেন। এতে হয়তো তাদের ব্যবসার কিছু ক্ষতি হবে না। আমাদের যা ক্ষতি হচ্ছিল তা তো হচ্ছেই।

বিনীত,
নজরুল ইসলাম

পঞ্চাশ

৩৯, সীতানাথ রোড
৪.৫.৩২

প্রিয় হামিদ সাব,

আপনার পত্র পেয়েছি। ভয়ানক দুর্দিনে পড়েছি। প্রাপ্য টাকা পাচ্ছি না পাবলিশারের কাছে থেকে।

'আম পারা'র বাংলা পদ্য অনুবাদ করা আছে—কোনো মুসলমান পাবলিশার জোগাড় করে দিতে পারেন? তাহলে অন্তত আপনার টাকাটা দিতে পারি।

মখদুমী লাইব্রেরীতে চেষ্টা করলে হয় না? আমার জানা নাই ওদের সাথে।

হপ্তা খানিকের মধ্যে দিয়ে দেবো। অবশ্য দেরির জন্য ওকে সুদ দিব।

ভাবী সাহেবাকে দেখতে যাবে মেয়েরা দু-এক দিনের মধ্যে।

এখানে সব ভালো। ইতি—

সখ্যধন্য,
নজরুল

একান্ন

[কবি অসুস্থ হবার আগে ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে থাকার সময় বাড়িওয়ালাকে চিঠি লেখেন। এই চিঠি থেকে বোঝা যাবে অসুস্থ হবার আগে কবির আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল। চিঠিটা 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার প্যাডে লেখা।]

The Navajug
(The United voice of Progressive Bengal)
Founded by Hon'ble Mr. A.K. Fazlul Haq
Chief Editor
Kazi Nazrl Islam

123 Lower Circular Road
Calcutta
26.2.42.

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

সবিনয় নিবেদন আমি আপনার ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রিটস্থ বাড়ির ভাড়াটিয়া। এ বাড়ির আমি মাসিক ষাট টাকা (৬০) ভাড়া দিই। বর্তমান দুরবস্থায় যুদ্ধের জন্য সকলেরই আয় কমে গিয়েছে। কাজেই সকল বাড়ির ভাড়া কমিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই বাড়ির ভাড়া কমাইয়া বাধিত করিবেন। এই দুর্দিনে এতটাকা ভাড়া দিয়া থাকিতে পারিব না। আমার শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত,
কাজী নজরুল ইসলাম

বায়ান্ন

[চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমান ব্যক্তি কার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তীকে মধুপুর থেকে লেখা চিঠি।]

বাহান্ন বিঘা
শ্রী গৌরাঙ্গ ধাম
মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা)
১৪.৮.৪২

প্রিয় কার্তিক বাবু।

বোধ হয় শুনেছেন আমি মধুপুরে change-এ এসেছি। খবরের কাগজে দেখলাম শৈলদেবীর হিন্দিগান (চৌরঙ্গির) বেরিয়েছে। আমাকে একখানা রেকর্ড দেবেন (complimenatry) এই ছেলেটির কাছে। এর নাম শ্রীমান বিজয় সেনগুপ্ত। এ আমার বাড়িতেই থাকে। ও কলকাতা যাচ্ছে। তাই এ চিঠি লিখলাম।

আপনার সময় কেমন কাটছে? আমি এখনো আরোগ্য লাভ করিনি। কঠিন অসুখ (low blood pressure) দু-তিন মাসের মধ্যেই আমি আরোগ্য লাভ করব। আমার ভালবাসা ও নমস্কার গ্রহণ করুন। প্রিয় বিভূতি বাবুকেও জানাবেন। ইতি—

সখ্যধন্য,
কাজী নজরুল।

তেপ্পান্ন

মধুপুর
১২.৯.৪২

কল্যাণীয়াসু,

স্নেহের বুড়ু,

তোর চিঠি পেয়েছি। ৩/৪ মাস লাগবে না ভালো হতে, অক্টোবরের ১৫ তারিখেই কলকাতা যাব সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়ে। শুধু আমি নয় তোর মাসিমাও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়ে। আমার 'বন্ধু' (ভগবান) বলেছেন এটা শেষ পরীক্ষা। 'বন্ধু' বলেছেন 'শরতের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবে'। আমাদের দেহ যাঁর সেই 'বন্ধু'ই আমায় আরোগ্য করবেন, আমার দেহ তাঁর হয়ে যাবে। চিঠিপত্র বন্ধ হবে না, তবে ট্রেন আসানসোল পর্যন্ত আসছে তারপর শুধু মিলিটারি ট্রেন আসে। সে ট্রেনে সোলজার ছাড়া অন্য কাউকে আসতে বা যেতে দেয় না। কাজেই আমার ১৫ই অক্টোবরের আগে যেতে পারব না। হয়তো ১৫ই অক্টোবর বা তার ২/১ দিন আগে থেকে ট্রেন চলবে। খোকা কলকাতা থেকে আসানসোল পর্যন্ত ট্রেনে এসে, সাইকেলে মধুপুরে এসেছে। সানি, নিনি সাইকেল পেয়ে আনন্দে মাতোহারা হয়ে উঠেছে। অর্দ্ধেক দিন শুধু সাইকেল চড়ে ঘুড়ে বেড়ায়। তোর রুমাল পেয়েছি চমৎকার হয়েছে। এখানে সকলেই ভালো আছে। তুই আমার আনন্দিত সুভাশীষ গ্রহণ কর। টিপু ইত্যাদি সকলকে আশীষ জানাবি। ইতি—

নিত্যশুভার্থী,
মেসোমশাই

চুয়ান্ন

[আজিজুল হাকিমকে লিখিত]

১১, ওয়েলস্‌লি স্ট্রিট
কলিকাতা
৫/১০/২৯

কল্যাণীয়েষু—

এইমাত্র তোমার চিঠি ও কবিতা পেলাম। কবিতাটি 'সওগাতে' দিলাম।

আমি চিঠির উত্তর দিইনে কারোর, এ বদনামটা কায়েম হয়ে গেছে। সময়ের অভাব বলেই দিতে পারিনে। পলটিকস, কাব্য, গান, আড্ডা ইত্যাদির চাপে আমার ভদ্রতার ভাদ্র-বধূ বহুদিন হল ঘোমটা টেনে ঘরের কোণ নিয়েছে।

তোমার কবিতা মাঝে মাঝে দেখছি 'মোহাম্মদী'তে। দুএকটা খুবই ভালো লেগেছে। ছন্দ ও ভাষা দুই ঘোড়াকেই তুমি বেশ আয়ত্ত করেছ। ভাবের নীহারিকা লোক তোমার উজ্জ্বল গ্রহ হয়ে দেখা দেয়নি বলে অধৈর্য হয়ো না ও দানা বাঁধতে একটু সময় লাগবে হয়তো।

তোমার সামনে আজো বিপুল ভবিষ্যত পড়ে রয়েছে, অসীম শূন্য তোমার চারপাশে, তোমার স্বপন–লোকের নীহারিকা–পুঞ্জ আজো বাষ্পাতুর। ওই ভালো, আমি হয়ে–ওঠার চেয়ে সম্ভাবনাকে বেশি ভালোবাসি।

আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মতো, হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিস্ময় থাকবে না বেশিদিন। ধূমকেতু যেমন সহসা আসে, তেমনি সহসা চলে যায়। তোমরা আমাদের আকাশের অনাগত জ্যোতিষ্ক, গ্রহপুঞ্জ ; তোমরা যেদিন রূপ ধরে উঠবে, সেদিন তোমাদের আড়াল করে থাকার কোনো প্রয়োজন হবে না এ ধূমকেতুর। আমার সমস্ত লেখায় কামনায় শুধু এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—তোমরা এসো অনাগত কবির দল, আমি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমরা ভোরের পাখি, তাদের গান শুনিও।

জসীম, কাদির প্রভৃতিকে আমি ভালোবাসি আমারও চেয়ে। আজ হতে তুমি তাদেরই একজন হলে যাদের আমি ভালোবাসি। সব সময় খবর যদি নাই নিতে পারি, মনে রাখব। আমার আন্তরিক শুভাশিস ও স্নেহ গ্রহণ করো ! ইতি—

শুভার্থী
নজরুল ইসলাম

পঞ্চান্ন

[মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহারকে লিখিত।]

২০–১২–৩০

চির–স্নেহাস্পদেষু !

প্রিয় বাহার ! তোমার কাছে 'সাত ভাই চম্পা'র যে কবিতাগুলি ছিল—শ্রীমান কাদিরকে তা দিও। জেলে গেলে দেখা করো সেখানে গিয়ে। নাহার কোথায় ? তার খোকা কেমন আছে ? ইতি—

শুভার্থী,
নজরুল ইসলাম

ছাপ্পান্ন

[১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক জনাব এম. সেরাজুল হককে লিখিত।]

কলিকাতা
৩০শে আশ্বিন, ১৩৩৯

জনাব সম্পাদক সাহেব,

আপনারা আমাকে অনাগতের আগমনী গাইতে আমন্ত্রণ করেছেন ; আমি অযোগ্য, তবুও আহ্বান করেছেন। সেজন্য মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্ব জুড়ে আজ মহাজাগরণ। শিক্ষা ধর্মের নব নব স্ফুরণ। অভ্যুত্থানের বজ্রবিষাণ দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত। বিশ্বব্যাপী মহাজাগরণের এই প্রদীপ্ত প্রভাতে বাঙলার মুসলিম তরুণেরা কি মোহ-নিদ্রায় মোহাচ্ছন্ন হয়েই থাকবে? ধর্ম অধর্মের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহাসংঘর্ষের এই মহাসন্ধিক্ষণে তৌহিদের শান্তি-সাম্য-ঐক্য-মন্ত্রে সে কি ক্লান্ত-ভ্রান্ত মানবচিত্তের অবসন্নতা বিদূরিত করবে না? জাতি ও কওমকে ধর্মপথে— সেরাতুল মুস্তাকিমে—পরিচালিত, সঙ্ঘবদ্ধ করতে প্রয়াস পাবে না? তরুণ বন্ধুরা কি মহা-কোরানের মহাবাণী 'কুম্ বে-ইজ-নিল্লাহ'—ওঠো-জাগো, এ বাণী ভুলে গিয়েছে? আমি তো দিব্য-চোখে দেখতে পাচ্ছি ঐ স্বর্গের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমাদের কীর্তিমান পূর্বপুরুষগণ আকুল প্রাণে আমাদের কর্মের দিকে চেয়ে রয়েছেন। তরুণদের মন-মন্দিরে তৌহিদের রুদ্রানল প্রজ্জ্বলিত হউক। বাবর, হুমায়ুন, শাহজাহান, সালাউদ্দিন, খালিদ, তারিক, মূসা, হাঞ্জেলা, ওকবার সাধনা তাদের কর্মে রূপলাভ করুক। শিক্ষা, কুশিক্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরবশ্যতার প্রাচীন প্রাচীর চূর্ণ করে বাঙলার মুসলিম তরুণেরা জ্ঞান, চরিত্র, নীতি, সখ্য ও মনুষ্যত্বের পথে কাতার বন্দী হউক—এই আশা অন্তরে পোষণ করেই আপনাদের নির্ধারিত দিনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি। আপনাদের চেষ্টায় যুবকেরা নবজিন্দেগির পথে অগ্রসর হোক—সকলের সাধনার জয়যাত্রা সাফল্য লাভ করুক, এই কামনা।

—নজরুল ইসলাম

সাতান্ন

[এম. সেরাজুল হককে লিখিত।]

কলিকাতা
২ নভেম্বর, ১৯৩২

জনাব সম্পাদক সাহেব,

তসলিম ! আপনাদের নেতা আসাদ-উদ্দৌলা শিরাজীর মারফত আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ পেলাম। যে সময় সারা বাংলাদেশ আমার বিরুদ্ধে, সেই সময় এই বিদ্রোহীকে আপনারা তরুণদের পথ প্রদর্শনের জন্য ডেকেছেন। ধন্য আপনাদের সাহস !

'ধূমকেতু'র সারথী-রূপে নয়—যুদ্ধের ময়দান হতেই তারুণ্যের নিশান-বর্দার আমি। তাই ছুটে এসেছি দেশবাসীর পাশে। আজাদি অনাগত—তারই আগমনী গাওয়া ও তা হাসিল করাই বিপ্লবীর প্রাণের লক্ষ। আপনারা লক্ষপথ ধরে যাত্রা করুন। কোনো বিঘ্নই সে পথে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। দেশ গোলামির জিঞ্জির হতে মুক্ত হোক ! মুক্ত-প্রাণে মুক্ত-বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারব, সেই দিন হবে আমার অভিযানের শেষ। আপনারা জন কয়েক তরুণ আমার সহযাত্রী হচ্ছেন, এজন্য আমি একান্ত আশান্বিত। আজ যদিও চারিদিকে বিপ্লব বিভীষিকা—অনাদর অকৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে—তবু পিছ-পা হবার কিছু নেই। প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ত্যাগ ও সাধনার মূল্য একদিন সমাজ দেবেই। গায়ক আব্বাসউদ্দিনও আপনাদের আমন্ত্রণ কবুল করেছেন। ইনশাল্লাহ ৫ই নভেম্বর ভোরের ট্রেনে সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনে পৌঁছব।

—নজরুল ইসলাম

আটান্ন

[নারায়ণগঞ্জ সংগীত সংসদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিকে লিখিত।]

৩৯, সতীনাথ রোড
কলিকাতা
২৩-৮-৩৩

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমান আজিজুল হাকিমের মারফত আপনাদের প্রস্তাবমতো নিম্নলিখিত শর্তে আমরা ছয়জন আর্টিস্ট নারায়ণগঞ্জ যাইতে রাজি হইয়াছি।

প্রথম শর্ত : আপনি আমাদিগকে ১২০০ টাকা (বারশত টাকা) দিবেন। ঐ টাকায় আমরা নারায়ণগঞ্জে আগামি ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর দুই রাত্রি গান করিব।

দ্বিতীয় শর্ত : আপনারা আগামি ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্ধেক টাকা অর্থাৎ ৬০০ (ছয়শত টাকা) অগ্রিম পাঠাইয়া দিবেন এবং বাকি ছয় শত টাকা (৬০০) প্রথম রাত্রি অর্থাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর গান হইয়া যাওয়ার পরেই পরিশোধ করিবেন। ঐ বাকি টাকা পাইলে তবে দ্বিতীয় রাত্রি আমরা গান করিবার জন্য বাধ্য থাকিব।

তৃতীয় শর্ত : আপনি আমাদের যাওয়া-আসার সেকেন্ড ক্লাস ভাড়া দিবেন। পথে ও নারায়ণগঞ্জে খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত খরচ আপনাকে বহন করিতে হইবে।

চতুর্থ শর্ত : নিম্নলিখিত ছয়জন আর্টিস্টের মধ্যে যদি কেহ অসুস্থ হইয়া যাইতে অসমর্থ হন, আমরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য আর্টিস্ট লইয়া যাইব—অবশ্য আপনাদের মত লইয়া।

পঞ্চম শর্ত : আপনি যদি কোনো কারণে, আমাদের সহিত চুক্তি করিয়া সে চুক্তি ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আমরা চুক্তি ভঙ্গ করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব। ইহাই হইল মোটামুটি শর্ত। আপনার অন্য কোনো কিছু জানাইবার থাকিলে পত্র দিয়া জানাইবেন। আপনার সুবিধামতো অন্য তারিখেও—অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে—আমাদের যাইতে আপত্তি নাই।

আমরা নিম্নলিখিত ছয় জন আর্টিস্ট যাইব :

১। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ; ২। ধীরেন্দ্রনাথ দাস ; ৩। নলিনীকান্ত সরকার ; ৪। আব্বাসউদ্দিন আহমদ ; ৫। রামবিহারী শীল (সঙ্গতিয়া) ; ৬। কাজী নজরুল ইসলাম।

আপনার পত্র ও সম্মতি পাইলে আপনার লিখিতমতো চুক্তিপত্র সহি করিয়া পাঠাইয়া দিব। ইতি—

বিনীত—
নজরুল ইসলাম

ঊনষাট

৯, সতীনাথ রোড
১৬.৮.৩৫

শ্রীচরণকমলেষু,

মা ! তোমার চিঠি পেয়েছি পরশু। ছোট মাসিমার স্বর্গারোহণের দিন ছিল সেদিন। তোমার মন ছিল দুঃখের বর্ষা-সিক্ত ! তাই বুঝি চিঠিতে অত কথার ফুল ফুটেছিল। প্রাচ্যের ঋষিরা মৃত্যুকে কখনো জীবনের শেষ বলে মানেননি, বড় করে দেখেননি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আত্মীয়েরা পরমাত্মীয় হন, প্রিয়জন প্রিয়তর হন। জীবনে যে থাকে চোখের সামনে, মরণে সেই-ই পায় অন্তরের অন্তরতম লোকে অক্ষয় আসন, মৃত্যু জীবনের পরম পরিণতির একটা ধাপ মাত্র। মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে আমরা অগ্রসর হই অমৃতলোকের পানে, ভগবানের সান্নিধ্যে। তবু মৃতজনের জন্য আমরা কাঁদি আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ বলে। ছোট মাসিমার মৃত্যু যদি কয়েক বছর আগে হতো খুব কাঁদতাম। এখন কাঁদি না। এখন আমার জীবনের যেন এই জীবনেই নবজন্মের সূচনা অনুভব করছি। মায়াময় সৃষ্টির বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। তাই কান্না পেলে হাসি। তোমাদের—বিশেষ করে তোমার স্নেহামৃত আমার এই ভাবী পরিণতির যে সহায়তা করেছে—তা হয়তো তুমিও জানো না। পূর্বজন্মে কি ছিলাম জানি না। এই জন্মে কোন কূলে কেন জন্মেছি জানি না। জানি আমার অনাগত জন্মকে। তাকেই আমি শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি। সেই অনাগত জন্মে জগজ্জননীর চরণে—আমার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের তপস্যার সিদ্ধির দিনে তোমাকে আরো বেশি করে স্মরণ করি। সেই অনাগত জন্মকে। তাকেই আমি শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি। সেই অনাগত জন্মে জগজ্জননীর চরণে—আমার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের তপস্যার সিদ্ধির দিনে তোমাকে আরো বেশি করে স্মরণ করব—আমার প্রথম গুরু বলে—আদি মাতৃমূর্তি বলে। রাঙাদা আমার উপর এতটা নির্ভর করেন—এ আমার সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি জানি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আমি এখন রাঙাদা কেন—কারুরই কোনো পার্থিব উপকার করতে পারিনে। যা করে ওঁর জেঠিমা ও তোমাদের মেয়ে দুলি। স্নেহ-মায়ার দিক দিয়ে আমি প্রায় নির্লিপ্ত। সংসারের যেটুকু কাজ মহামায়া করিয়ে নিচ্ছেন, তা সে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা আর আমার পাপের ভোগ ও প্রায়শ্চিত্ত।

আমার বিচিত্র জীবনে সহস্রবার পড়েছি আবার উঠেছি। সেই ওঠা-পড়ার দ্বন্দ্বে যখন ক্ষতবিক্ষত, তখন তুমি এসেছিলে আদিজননীর প্রতিভূ হয়ে। দ্বন্দ্বের আজও অবসান হয় নাই, কবে হবে মা-ই জানেন। কিন্তু এ মনে আর ভাবনা নাই মা। আমার পাপ-পুণ্য সকল কিছু নিবেদন করেছি মা অম্বিকার শ্রীচরণে। এখন 'যথা নিযুক্তোস্মি ওয়া করোমি' অবস্থা। তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো, তোমাদের বহু ক্ষতি করলাম, আবার দেখা হলো—এসব তাঁরই লীলা। তোমাদের বহুজন্মের শত্রু—এখানে বহু ক্ষতি করে গেলাম। কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তোমরা সয়েছ আমার জন্য—সব স্মরণ করি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে। শুধু এই প্রার্থনা করি যেন আর কখনো তোমাদের কোনো ক্ষতি না করি, ব্যথা না দিই। আমার যারা ক্ষতি করেছে, নিন্দা করেছে বা আজো করে—তাদের কারুর উপরই আমার কোনো অনুযোগ অভিযোগ নেই আজ। আমার আনন্দ আমি সর্বান্তঃকরণে সকলকে ক্ষমা করতে পেরেছি। যে নিন্দা করে তাকেও ভালোবাসতে পেরেছি।

শ্রীমান—জীবন মহাপুরুষ কর্মযোগের জন্য জন্মেছে—এই আমার গুরুদেবের উক্তি। ওর যদি সংসারে আসক্তি জন্মে তবেই ও সংসারবাসী হবে। ওকে অনন্তকে মার চরণে নিবেদন করে দিয়েছিলাম। মা-ই রক্ষা করছেন—ও হাত দিয়ে মায়ের পূজা পাঠিয়ে দিও ভালো হলে। বৌদিকে প্রণাম দিও, আজ সকলে শ্রীমানকে দেখতে গেছিলেন, আমি শুধু করেছি ভগবানের চরণে। ভগবান দেখার পূর্ণ অধিকার আমায় না দিলেও নীরবে দূরে প্রার্থনা করার অধিকার কেড়ে নেননি। শ্রীমানকে এখন বাড়ি নিয়ে এসো এই কামনা করি। শ্রীমান অনন্ত এখন ভালোর দিকে। মাতৃভক্তের সন্তান। ওর ভয় নেই। তোমার শরীর কেমন তা এখন থেকেই বুঝতে পারছি। অন্যান্য খবর আর সকলের চিঠিতেই জানবে। প্রার্থনা করো যেন শীঘ্র সংসারের সকল ঋণমুক্ত হই। আমার কোটি প্রণাম নাও। মানসবাবুকে প্রীতি ও জীবনকে স্নেহাশিস দিও।

প্রণত,
নূরু

ষাট

[কবি এই পত্রখানি তাঁর চাচা কাজী কায়েম হোসেন সাহেবকে ইংরেজিতে লিখেছিলেন।]

39 Sitanath Road,
Calcutta
27.8.35

My Dear uncle,

Taslim. It is after a 'Yuga' that I venture to write to you. I have heard from my brother of your kindness and help to them. Unfortunate as I am, I have not been able to help them in any way except that I have given them innumerable troubles. I have

acquired every thing except wealth. So I am helpless to help even my ownself. I have sacrificed every thing for my country or else I could be a rich man easily. From our childhood we have been taken care of by your kind family. In every drop of my blood flows your heavenly kindness and grace. It is only for these sympathy to the poor and oppressed that Allah has given you wealth, fame and peace. I do not know when Allah will take me to my native village to kiss the dust of your sacred feet. Wherever I live I remember you with deepest regards.

My elder brother is suffering from some sort of disease which you are the best judge of. Would you be kind enough to take charge of him earnestly as one of your patients? Please send me the bill for medicine etc. direct or through my brother to me and I shall promptly pay the amount to you, poor though I am. Hope you will do the needful about him. Moreover, I heard from my two brothers that some of my village brethren or rather relatives are against them and giving them much trouble. I with my brother seek shelter under you. You will kindly look after them and take necessary steps so that they may not be tortured by anybody. I appeal to you not only as Magistrate and President of Union Board but as our ever kind patron and 'Ashraya Data'. With lakh salam.

Affectionately yours
Nazrul Islam

একষট্টি

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দেন ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪২ ; ১/৯/৩৫-তারিখে]

NAGARIK
Illustrated Bengali weekly

1/c Manmatha Bhattacharya St,
Calcutta,
28-8-1935

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

গুরুদেব ! বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি। আমার ওপর হয়তো প্রসন্ন কাব্যলক্ষ্মী হিজ্ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের ভয়ে আমায় ত্যাগ করেছেন বহুদিন। কাজেই সাহিত্যের

আসর থেকে আমি প্রায় স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়েছি। আপনার তপস্যায় আমি কখনো উৎপাত করেছি বলে মনে পড়ে না, তাই অবকাশ সত্ত্বেও আমি আপনার দূরে দূরেই থেকেছি। তবু জানি, আমার শ্রদ্ধার শতদল আপনার চরণস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক ও কবি-বন্ধু 'নাগরিক' পরিচালনা করছেন। গতবার পূজায় আপনার কিরণ স্পর্শে 'নাগরিক' আলোকিত হয়ে উঠেছিল, এবারও আমরা সেই সাহসে আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি। আপনার যে কোনো লেখা পেলেই ধন্য হব। ভাদ্রের শেষেই পূজা-সংখ্যা 'নাগরিক' প্রকাশিত হবে, তার আগেই আপনার লেখনী-প্রসাদ আমরা পাব, আশা করি।

আপনার স্বাস্থ্যের কথা আর জিজ্ঞাসা করলাম না। ইতি—

প্রণত
নজরুল ইসলাম

বাষট্টি

[মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকাকে লিখিত।]

৩৯ সতীনাথ রোড
কলিকাতা
৩-৯-৩৫

কল্যাণীয়াসু !

যে কোনোদিন সন্ধ্যা সাতটার পর আসতে পারেন। আমি সাধারণত সন্ধ্যার পর বাড়িতেই থাকি। আসার দিন খবর দিয়ে এলে ভালো হয়। ইতি—

শুভার্থী—
নজরুল ইসলাম

তেষট্টি

[কবি জসীমউদদীনকে লিখিত।]

Hinoo House
P.O. Hinoo
Ranchi
13-1-36

সোদর-প্রতিমেষু,

স্নেহের জসীম ! আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ নাও। আমি পরশু (বুধবার) সকালে মোটরে করে কলকাতা যাচ্ছি—সাথে ছেলেমেয়েরাও যাবে। বৃহস্পতিবার সকালে বা বিকালে তোমার সাথে গিয়ে দেখা করব। সেইবার গ্রামোফোন রিহার্স্যাল রুমে তোমাকে বলেছিলাম যে, আমি মক্তবের জন্য একখানা বই (মক্তব-সাহিত্য) পেশ করেছি

approval-এর জন্য। তুমি ও বন্ধু মনসুর সাহেব selection committee-র মেম্বার। কাজেই আমি নিশ্চিত থাকতে পারি যে, আমার বই তোমরা পাশ করবেই এই ভরসায়। তুমি আমার অনুজাধিক স্নেহভাজন, আশা করি, এর ব্যতিক্রম কোনোদিন দেখনি এবং দেখবেও না। খোদা তোমার দিন দিন উন্নতি করুন, এ আমি সর্বদা প্রার্থনা করি। তোমার যশ খ্যাতি যে আমার পক্ষে কত বেশি গৌরবের তা বোধ হয় তুমি নিজেও জান না। আমি সাহিত্যলোক হতে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছি—কাজেই আমাদের সমাজের সমস্ত সুনাম যশ গৌরব নির্ভর করছে তোমার কৃতিত্বের উপর। তুমি তাতে নিরাশ করবে না এ বিশ্বাসও যথেষ্ট আছে আমার। — যাক যদি আমার বইটা পাস না হয়, তা হলে অত্যন্ত কষ্ট পাব অন্তরে—তুমি আমায় সে দুঃখ দিতে পারবে না। তোমার বৌদি ও ছেলে-মেয়েরা এখন একা বা অভিভাবকবিহীন, নইলে দুচারদিন আগেই কলকাতা যেতাম শুধু তোমাদের ধরার জন্য। তোমার উপর এতো বেশি স্নেহের দাবি আছে বলেই তোমায় এই অনুরোধ করছি। এ বইটা যদি পাস না হয়, তাহলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও মর্মাহত হব। তা ছাড়া বইটা পড়ে দেখো গতানুগতিক পন্থাকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে অভিনবত্ব দেবার চেষ্টা করেছি। ওটা সত্যিই আমার লেখা বা সম্পাদনাও আমার—আমি মিথ্যে বলছি নে—বিশ্বাস করো। ওর কবিতাগুলো ও কয়েকটা গদ্য লেখা পড়লেই বুঝতে পারবে। এর বেশি তোমায় লেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। বৃহস্পতিবার কি গ্রামোফোন রিহার্স্যাল রুমে আসবে, না আমি যাব তোমার কাছে? আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—

নিত্য শুভার্থী,
কবিদা

চৌষট্টি

[গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ তারিখের দৈনিক 'পাকিস্তান' পত্রিকায় জনাব ফয়জুর রহমান আহমদ এই পত্রখানি তার ফটোস্টেট কপিসহ প্রকাশ করেন। 'নজরুলের চিঠিপত্র সংরক্ষণ' প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, বগুড়ার রওশন বুক স্টলের মালিক জনাব রোস্তম আলি সাহেবের কাছে তিনি এর সন্ধান পান। পত্রখানি 'অতুলচন্দ্র দত্ত, রায় অ্যান্ড রায় চৌধুরী, বুক সেলার অ্যান্ড পাবলিশার, কলিকাতা'—নামে ও ঠিকানায় লেখা হয়েছিল।]

Gramophone Club
106, Upper Circular Road
17.1.36

প্রিয় অতুলবাবু,

আজ সীতানাথ রোডেই একখানা বাড়ি পেলাম। ওইটেই হবার পনের আনা সম্ভাবনা। ভাড়া ৫৫ কি ৬০। সন্ধ্যায় ঠিক হবে। সেই সময় এক মাসের ভাড়াও অগ্রিম দিতে হবে। আপনাকে কাল একশ টাকা হাওলাতের কথা বলেছিলাম। অনুগ্রহ করে

চণ্ডীর হাতে একশ টাকা দেবেন—আমি ফেব্রুয়ারি মাসেই দিয়ে দেব—কোনো চিন্তা করবেন না। যদি বলেন, একখানা back-date-এর cheque পাঠিয়ে দেব। মডেল স্কুলের হেড মাস্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কি?—কখন যেতে হবে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে?

আমার শাশুড়ির অসুখ সারেনি। আজ আবার সানির (বড় ছেলের) জ্বর। ১০৩ ডিগ্রি উঠেছে। হাতে টাকা ফুরিয়ে গেছে—আপনি টাকা না দিলে বাড়ি-ভাড়া দিতে পারবো না। আশা করি, এ উপকারটুকু করবেন বন্ধুর দুঃসময়ে। ইতি—

সখ্যধন্য
নজরুল ইসলাম

পঁয়ষট্টি

[নজরুল যখন মাথরুন স্কুলের ছাত্র, তখন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন সে স্কুলের হেড মাস্টার। নজরুল উত্তরকালে কবিখ্যাতি লাভের পর হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানির পক্ষ থেকে কবি কুমুদরঞ্জনকে এই পত্রটি লেখেন।]

37/1, Sitanath Road
Calcutta
6.4.36

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

বহুদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিনি—কলকাতা এলে খবর দেবেন যেন। আমি বর্তমানে H.M.V. Company-র Exclusive Composer। তাদেরই নির্দেশ মতো আপনার কাছে একটি নিবেদন জানাতে এই পত্র লিখছি। আপনার 'অধরে নেমেছে মৃত্যু-কালিমা' গানটির permission (রেকর্ড করার জন্য) চান কোম্পানি। এর আগে আপনার দুচারটি গান আছে রেকর্ডে। আপনি যদি উক্ত কোম্পানীকে চিঠি দেন, আপনার গানের Royalty (5% commission) পাবেন। আপনার অনুমতি পেলেই কোম্পানি আপনাকে Royalty দেওয়ার অঙ্গীকারপত্র পাঠিয়ে দেবে। আশা করি পত্রোত্তর পাব। নিবেদন ইতি—

প্রণত
নজরুল ইসলাম

P.S. আপনার ঐ গানের সঙ্গে আরও কোন গান গাইলে ভালো হয় তা যদি নির্দেশ করেন, বা লিখে পাঠান সেই গানটি, ভালো হয়।

—নজরুল

ছেষট্টি

[নজরুল ইসলামের এই 'আরজ' খানি জনাব ফয়জুর রহমান আহমদ গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ তারিখের দৈনিক 'পাকিস্তান' পত্রে প্রকাশ করেন। তিনি প্রসঙ্গত জানান যে, জনাব রোস্তম আলির সংগ্রহেই তিনি কবির এই 'আরজ' খানি পান।]

বাংলা মাদ্রাসা ও মক্তবের মৌলভি সাহেবানের খেদমতে আরজ :

আস্‌সালামো আলায়কুম ! কওমের খাদেম এই বান্দার নাম হয়তো আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। আমি আমার কবিতায়, ইসলামি গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় আশৈশব ইসলামের সেবা করিয়া আসিতেছি। আমারই বহু চেষ্টায় আজ ইসলামি গান রেকর্ড হইয়া ঘুমন্ত আত্মভোলা মুসলিম জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছি। আরবি-ফার্সি শব্দের প্রচলন বাংলা সাহিত্যে আজ বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে—তাহাও এই বান্দারই চেষ্টায়। আমি কওমের নিকট হইতে হাত পাতিয়া কখনো কিছু চাহি নাই ইহার বদলাতে। কোনো কিছু প্রতিদানের আশা না করিয়াই আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া আমার যথাসাধ্য কওমের ও ইসলাম ধর্মের খেদমত করিয়া আসিতেছি।

আজ আপনাদের দরওয়াজায় এই খেদমতগার এক সামান্য আর্জি লইয়া হাজির হইয়াছে। আমার ভরসা আছে, আপনাদের দারাজ দিল ও দস্ত আমাকে রিক্ত হস্তে ফিরাইবে না। আমি এতদিন পরিণত-বয়স্ক ও পরিণত-বুদ্ধি লোকের জন্যই কবিতা, গজল ইত্যাদি লিখিয়াছি। শিশুদের জন্য, বালক বালিকাদিগের জন্য কিছু লিখি নাই। আমার মনে হয়, ইহার জন্যই আমিও আশানুরূপ ফল পাই নাই।

জ্ঞানের প্রথম উন্মেষকালে যদি তাহারা ইসলাম ধর্মের, মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রথম সবক পায়, তাহা হইলেই আমাদের ভবিষ্যত জাতি-গঠনের ইমারতের ভিত্তি পাকা হয়। সেই জন্য আমি 'মক্তব-সাহিত্য' নাম দিয়া একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছি। —খোদার ফজলে আপনাদের দোওয়াতে উক্ত 'মক্তব সাহিত্য' টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক ও আপনাদের পরিচালিত মাদ্রাসা ও মক্তব্যের জন্য মনোনীত হইয়াছে। আপনারা যদি আমায় মদদ দেন এবং আমার এই ক্ষুদ্র কেতাবখানি আপনাদের মক্তব-মাদ্রাসার জন্য মনোনীত করিয়া এই খাদেমকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে ইনশাহআল্লাহ ভবিষ্যতে মক্তব-মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বাংলা পুস্তক রচনায় মন দিব ও এইরূপে কওমের সেবা করিতে থাকিব। আশা করি, আমার এই আর্জি আপনারা মঞ্জুর করিয়া আপনাদের কওমের একনিষ্ঠ খেদমতগারকে সরফরাজ করিবেন। আরজ ইতি।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪৩

খাদেম
নজরুল ইসলাম

সাতষট্টি

[১৩২৮–এর ৩রা আষাঢ় নজরুল ইসলামের সঙ্গে নার্গিস আসার খানম ওরফে সৈয়দা খাতুনের আকদ হয়। এই বিবাহ স্থায়ী হয়নি। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। নজরুল পরে ১৯২৪–এর ২৪শে এপ্রিল প্রমীলাকে বিয়ে করেন। নজরুল নার্গিসের বিবাহ বিচ্ছেদের পনরো বছর পর নার্গিস নজরুলকে একটি চিঠি দেন তার উত্তরে নজরুল নার্গিসকে এই চিঠি লেখেন।]

106 Upper Chitpur Road
'Gramophone Rehearsal Room'
Calcutta
1.7.37

কল্যাণীয়াসু !

তোমার পত্র পেয়েছি—সেদিন নববর্ষার নবঘন–সিক্ত প্রভাতে। মেঘ–মেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনর বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল—তা তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পার। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলো কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীবার্ণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমার কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে। যাক, তোমার অনুযোগের অভিযোগের উত্তর দিই।

তুমি বিশ্বাস কর, আমি যা লিখছি তা সত্য। লোকের মুখে শোনা কথা দিয়ে যদি আমার মূর্তির কল্পনা করে থাক, তা হলে আমায় ভুল বুঝবে—আর তা মিথ্যা।

তোমার উপর আমি কোনো 'জিঘাংসা' পোষণ করি না—এ আমি সকল অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা ! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি—তা দিয়ে তোমার কোনোদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমানিক না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না—আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণ–রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথমে দেখেছিলাম, সে রূপ আজো স্বর্গের পারিজাত–মন্দারের মতো চির–অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তুমি ভুলে যেও না, আমি কবি—আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর, কুৎসিত সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বরের কাপুরুষের আঘাতের মতো নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্যামী জানেন (তুমি কি জানো বা শুনেছো, জানি না) তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোনো অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবিও নেই।

আমি কখনো কোনো 'দূত' প্রেরণ করিনি তোমার কাছে। আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর 'সেতু' কোনো লোক তো নয়ই—স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কি না সন্দেহ। আমায় বিশ্বাস কর, আমি সেই 'ক্ষুদ্র'দের কথা বিশ্বাস করিনি। করলে

পত্রোত্তর দিতাম না। তোমার উপর আমার কোনো অশ্রদ্ধাও নেই, কোনো অধিকারও নেই—আবার বলছি। আমি যদিও গ্রামোফোনের ট্রেড মার্ক 'কুকুরে'র সেবা করছি, তবুও কোনো কুকুর লেলিয়ে দিই নাই। তোমাদেরই ঢাকার কুকুর একবার আমার কামড়েছিল আমার অসাবধানতায়, কিন্তু শক্তি থাকতেও আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি—তাদের প্রতি আঘাত করিনি।

সেই কুকুরদের ভয়ে ঢাকায় যেতে আমার সাহসের অভাবের উল্লেখ করেছ, এতে হাসি পেল। তুমি জান, ছেলেরা (যুবকেরা) আমায় কত ভালোবাসে। আমারই অনুরোধে আমার ভক্তরা ক্ষমা করেছিল। নইলে তাদের চিহ্নও থাকত না এ পৃথিবীতে। তুমি আমায় জানবার যথেষ্ট সুযোগ পাওনি, তাই এ কথা লিখেছ .. যাক তুমি রূপবতী, বিত্তশালিনী, গুণবতী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে—তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। আমি কোনো অধিকারে তোমায় বারণ করব—বা আদেশ দেব? নিষ্ঠুরা নিয়তি সমস্ত অধিকার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

তোমার আজকার রূপ কি, জানি না। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মতো আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণদেবীর মতোই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী-পীঠ। ... জীবনভরে সেইখানেই চলেছে আমার পূজা-আরতি। আজকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ, তাই তাকে পেতে চাইনে। জানিনে হয়তো সে রূপ দেখে বঞ্চিত হবো, অধিকতর বেদনা পাব,—তাই তাকে অস্বীকার করেই চলেছি।

দেখা? না-ই হলো এ ধূলির ধরায়! প্রেমের ফুল এ ধূলিতলে হয়ে যায় ম্লান, দগ্ধ হতশ্রী। তুমি যদি সত্যই আমায় ভালোবাসো, আমাকে চাও, ওখানে থেকেই আমাকে পাবে। লায়লী মজনুকে পায়নি, তবু তাদের মতো করে কেউ কারো প্রিয়তমকে পায়নি। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ অতি পুরাতন কথা হলেও পরম সত্য। আত্মা অবিনশ্বর আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। প্রেমের সেনার কাঠির স্পর্শ যদি পেয়ে থাকো তা হলে তোমার মতো ভাগ্যবতী কে আছে? তারি মায়া স্পর্শে তোমায় সকল কিছু আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। দুঃখ নিয়ে একই ঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেই সেই দুঃখের অবসান হয় না। মানুষ ইচ্ছে করলে সাধনা দিয়ে তপস্যা দিয়ে ভুলকে ফুল-রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কোনো ভুল করে থাকো জীবনে এই জীবনেই তার সংশোধন করে যেতে হবে; তবেই পাবে আনন্দ, মুক্তি; তবেই হবে সর্ব দুঃখের অবসান। নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা করো। স্বয়ং বিধাতা তোমার সহায় হবেন। আমি সংসার করছি, তবু চলে গেছি এই সংসারের বাধাতে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বলোকে—সেখানে গেলে পৃথিবীর সকল অসম্পূর্ণতা সকল অপরাধ ক্ষমা সুন্দর চোখে পরম মনোহর মূর্তিতে দেখা দেয়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনের বছর আগেকার কথা। তোমার জ্বর হয়েছিল, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দুটি কর তোমার শুভ্র সুন্দর ললাট স্পর্শ করতে পেরেছিল; তোমার সেই তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজো অনুভব করতে পারি। তুমি কি চেয়ে দেখেছিলে? আমার চোখে ছিল জল, হাতে সেবা করার আকুল স্পৃহা, অন্তরে

শ্রীবিধাতার চরণে তোমার অরোগ্য লাভের জন্য করুণ মিনতি। মনে হয় যেন কালকার কথা। মহাকাল সে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলে না। কী উদগ্র অতৃপ্তি ; কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল ! সারা দিনরাত আমার চোখে ঘুম ছিল না।

যাক—আজ চলেছি জীবনের অস্তমান দিনের শেষ রশ্মি ধরে ভাঁটার স্রোতে। তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর। আর তার চেষ্টা করো না। তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক। যেখানেই থাকি বিশ্বাস কর, আমার অক্ষয় আশীর্বাদী কবচ তোমার ঘিরে থাকবে। তুমি সুখী হও, শান্তি পাও—এই প্রার্থনা। আমার যতে মন্দ বলে বিশ্বাস করো, আমি ততো মন্দ নই—এই আমার শেষ কৈফিয়ৎ। ইতি—

নিত্য শুভার্থী
নজরুল ইসলাম

P.S. আমার 'চক্রবাক' নামক কবিতা-পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে। তোমার কোনো পুস্তকে আমার সম্বন্ধে কটূক্তি ছিলো। ইতি—

'Gentleman'

আটষট্টি

[কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখিত।]

৫৩-জি হরিঘোষ স্ট্রিট
কলিকাতা
২৮-১০-৩৭

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

প্রণাম শত কোটি অন্তে নিবেদন :

বহু পূর্বে আপনার এক আশীর্বাদী পত্র পেয়েছিলাম। আপনার 'অধরে নেমেছে মৃত্যুকালিমা' শীর্ষক গানটির কথাগুলি ও তার সাথে অন্য একটি গান (যা ওর জোড় হতে পারে) যদি অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন, তাহলে বিশেষ বাধিত হব। শ্রীমতী ইন্দুবালা ঐ গান দুটি গইতে চান। আপনার প্রেরিত গান দুটি পেলেই রেকর্ড করা হবে। গ্রামোফোন কোম্পানি আপনাকে প্রত্যেক রেকর্ডে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে রয়ালিটি দিতে চান—এক সঙ্গে টাকা নেওয়ার চেয়ে এতে বেশি লাভ হবে। গ্রামোফোন কোম্পানি আপনার গান পেলে ঐ শর্ত অনুসারে এগ্রিমেন্ট দেবে। যত শীঘ্র পারেন, গান দুটি পাঠিয়ে দেবেন।

বিজয়ার প্রণাম নেবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

নিবেদনমিতি
প্রণত নজরুল

ঊনসত্তর

[বরদাচরণ মজুমদারকে লিখিত।]

৫৩-জি হরিঘোষ স্ট্রিট
কলিকাতা
২২-৮-৩৮ (সকাল ৯টা)

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু,

পরম পূজ্যপাদ দাদা ! আপনার শ্রীকরকমল পরশপূত আশীর্বাদী লিপি পাইয়া আমি ও আপনার বৌমা অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতার্থ হইয়াছি। পরশু সন্ধ্যায় আপনার পত্র পাইয়া একটু পরেই প্রথমে বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে লিখিত মন্ত্র দিয়া ঔষধ খাওয়াই। আপনার পত্র পাওয়ার একটু পরেই নরেন ডাক্তার আসে, তাহাকে আপনার পত্র দেখাই। বিকালে আমাকে তাহার ডিসপেনসারিতে যাইতে বলায় সেখানে গিয়া তাহার সাথে দেখা করি। নরেন তখন বলে যে, সে রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না,—তবে ইহা 'পক্ষঘাত'-এর দিকে যাইতেছে। ...

কল্য হরিদাস গাঙ্গুলি আসে, সে একটা শিকড় লইয়া অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুলাইয়া হাতে সুতো দিয়া বাঁধিয়া দিতে বলে। সে আপনার ভক্ত বলিয়া আমি আপত্তি করি নাই ও তদনুসারে বাঁধিয়া দিই। তাহার কিছুক্ষণ পর হইতেই তাহার ব্যথা বাড়িতে থাকে দেখিয়া আমি তাহা আবার খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি। জানি না আপনার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়াছি কিনা। আপনি শিব, আপনার ঔষধের ওপর আর কিছু করা উচিত ছিল না। কিন্তু দুর্বল মানুষের এমনি মতিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ...

আপনার নির্দেশ মতো কার্য করিতে পারি নাই বলিয়া আপনার বৌমা আপনার শ্রীচরণারবিন্দে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে। দুই দিন হইতে এখন ঐভাবে প্রণাম করিতেছে। তবে উঠিতে পারে না বলিয়া ঠিক ঐভাবে পারিতেছে না। এ সম্বন্ধে আপনার আদেশ জানাইবেন।

আমার এবং আপনার বৌমার ইচ্ছা আর কাহারো ঔষধ না খাওয়ার। যদি তাহার জীবনের কোনো প্রয়োজন থাকে, আপনারই আশীর্বাদে সে বাঁচিয়া উঠিবে। স্বয়ং শিব যদি বাঁচাইতে না পারেন কেহ পারিবে না।

আপনার শ্রীচরণারবিন্দ দর্শনের আশায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি। কখন পর্যন্ত আসিতে পারিবেন জানাইবেন। আমাকে গিয়া লইয়া আসিবার জন্য আপনার বৌমা বলিতেছেন। আপনি ইচ্ছাময়, আপনার ইচ্ছায়ই পূর্ণ হউক। আপনি জন্মে জন্মে যাহা করিতেছেন আমার জন্য, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই। আপনি ও বৌদি আমার অনন্ত কোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। আবার হরগৌরী দেখার সৌভাগ্য কবে হইবে আপনিই জানেন। এই বন্ধন জর্জরিত দাসকে মুক্তি দিন। দাদা, আর পারি না, আর ভালো লাগে না। ...

নলিনীদার ছোট কন্যাটি মারা গিয়েছে, বোধ হয় শুনিয়াছেন। আপনি যখন প্রার্থনা করিতেছেন তখন আমার আর কোনো ভয় নাই। শীঘ্রই পত্রোত্তর দানে কৃতার্থ করিবেন। ইতি—

চির-প্রণত সেবক
নজরুল

সত্তর

[বরদাচরণ মজুমদারকে লিখিত।]

৪-৯-৩৮
দুপুর সাড়ে বারোটা

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু,

পরম পূজ্যপাদ দাদা, আজ এখন পর্যন্ত আপনার পত্র আসিল না। ... আপনার শরীরের কথা ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আছি, এ জন্যও প্রত্যহ আপনার পত্র পাইবার আকাঙ্ক্ষা করি। ...

গতকল্য বিকাল হইতে আপনার বৌমার অত্যন্ত অস্থিরতা ও আনচানানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে সর্বদা আমাকে বলিতেছে, গুরুদেবকে আনাও, ওঁকে আসতে বল, ওঁকে আমার হয়ে ডাক, আমার ডাকে তিনি আসছেন না। আমি কি বলিব, চুপ করিয়া থাকি। আপনার শরীরের এই অবস্থা না হইলে গিয়া আনিতে পারিতাম। পরম পূজনীয়া বৌদি ও ছেলেদের সহ আসিতে পারেন, তাহা হইলে ভালো হয়। ... আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া আপনাদের সকলকে লইয়া আসিতে পারি। আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আমার শাশুড়ি ঠাকুরানী বলিতেছেন, তিনি নাকি গত রাত্রে কি খারাপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন তাঁহার কন্যার যাহা হইবে তাহা জানিতে নাকি তাঁহার বাকি নাই, তাঁহার এখন একমাত্র প্রার্থনা যে, তাঁহার কন্যাকে শুধু একবার দেখা দিয়া যান—তাহা না হইলে তাঁহার কন্যা শান্তি পাইতেছে না। যে যাহা বলিতেছে আমি শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি মাত্র। আপনার যাহা শুভ বিবেচনা হয় করিবেন। আমি নিরাশ হই নাই, আমার শ্রীবরদাচরণ ভরসা। ...

রুগিনী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় মালিশ প্রায়ই হইতেছে না। অতি কষ্টে মাথা ধোওয়াইয়া দিতে হয়। একটু নাড়াচাড়া করিলেই রুগিনী অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে, মুখ নীল হইয়া যায়। ... অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় সে এখন খিটখিটে-স্বভাব শিশুর মতো কাঁদুনে হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কোনো কথার প্রতিবাদ করিলেই সে কাঁদিতে থাকে। তাহাকে দিনে একশো বার করিয়া বলিতে হইবে যে, গুরুদেব আজ আসিবেন। অন্য কোনো কথা বলিলেই কাঁদে। ...

আজ আবার আমার ছোট ছেলেটির (নিনির) জ্বর আসিয়াছে। আপনার বৌমার জন্য প্রার্থনা করিলে যদি আপনার শরীরের ক্ষতি না হয় তাহা হইলে প্রার্থনা করিবেন। আপনি তাহার জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কলিযুগে কেহ কখনো তাঁহার ভক্তের জন্য করেন নাই। ...

শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত
নজরুল

একাত্তর

[বরদাচরণ মজুমদারকে লিখিত।]

৪-৯-৩৮
বিকেল দুটো

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু,

দাদা ! আজ একখানা চিঠি কিছু আগেই দিয়াছি। চিঠি ডাকে পাঠানোর পরেই আমার শাশুড়ি কয়েকটি কথা বলিলেন। তাহা আপনাকে জানানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনায় আবার এই চিঠি দিতেছি।

গত বৎসর আশ্বিন কি কার্তিক মাসে শশী নামক একটি ঝি বাড়ির বাসনপত্র মাজিত ; বোধহয় মাসখানেক সে কাজ করিয়াছিল—সে এ পাড়াতেই কোথাও থাকিত—গত অগ্রহায়ণ কি পৌষমাসে বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে অপঘাতে সে মারা যায়।

আমার শাশুড়ি ৮/৯ দিন আগে সেই ঝিকে স্বপ্নে দেখেন—সে যেন রুগিনীর সম্মুখে চুল খুলিয়া নাচিতেছে। আমার শাশুড়ি সেই নৃত্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, সে তারকনাথের উপবাসী। আমার শাশুড়ি ঠিক মনে করিতে পারিতেছেন না সে 'তারকনাথের' উপবাসী বলিয়াছিল, না, ঐরূপ কোনো নাম বলিয়াছিল। তাহার স্পিরিট haunt করিতেছে কিনা জানিবার জন্য আপনাকে এ কথা জানাইলাম।

গত রাত্রে আমার শাশুড়ি আবার দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন, যেন তাঁহার কন্যার হঠাৎ দম বন্ধ হইয়া শেষ হইয়া গেল। আজ দিনে লক্ষ্য করিলাম রুগিনী ঘুমাইলে কিছুক্ষণের জন্য তাহার দম বন্ধ হইয়া থাকিতেছে এবং কেবল কণ্ঠের হাড়ের নিকট ধুকধুক করিতেছে। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়াই সে জাগিয়া উঠিয়া এদিকে-ওদিকে চাহিয়া কি যেন খুঁজিতেছে। ...

আমার শাশুড়ি বলিতেছেন, তিনি কেন যেন আপনার বৌমার মৃতা খুড়িমার (যিনি প্রায় ৬/৭ মাস ভুগিয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসে মারা গিয়াছেন) উপস্থিতি রুগিনীর কাছে অনুভব করিতেছেন।

আমি কয়েকদিন আগে শয্যায় একটু ধ্যান করিতেছিলাম, সেই সময় দেখিলাম এক ভীষণ রক্তচক্ষু প্রেত বা রাক্ষস মূর্তি আমার দক্ষিণ দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—অবশ্য তখন আমি 'নিচে নামার' চেষ্টা করিতেছিলাম।

এই সব দেখার মধ্যে কোনো গুহ্য কারণ থাকিতে পারে সন্দেহ হওয়ায় আপনাকে জানাইলাম। আপনি ভূতনাথ, সত্য সত্যই ভূতের উপদ্রব থাকিলে আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া এইসব কথা জানাইতে বাধ্য হইলাম। দয়া করিয়া দেখিবেন কোনো spirit এ বাড়িতে আছে কি না। ...

আপনার বৌমা বলিতেছে সে চোখে কম দেখিতেছে গতকল্য হইতে, কিন্তু দিনকতক আগেও eye-specialist চক্ষু পরীক্ষা করিয়া ভালো বলিয়া গিয়াছেন।

এইসব নানান উপসর্গ-বৃদ্ধির জন্য মনে হয়, আপনি যদি দয়া করিয়া কেবল একদিনের জন্য এখানে আসিতে পারেন, তাহা হইলে অত্যন্ত শুভদায়ক হইবে রুগিনীর পক্ষে। নিবেদন ইতি—

শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত সেবকাধম,
নজরুল

বাহাত্তর

[পুত্র কাজী অনিরুদ্ধকে লিখিত চিঠি।]

বাবা নিনামণি,

তোমারও চিঠি পেয়েছি—চমৎকার লেখা তোমার। তোমাকে এইবার মায়ের বাড়িতে চাকরি করে দেব। তোমার ফুল পেয়েছি। চমৎকার ফুল—সুন্দর গন্ধ। ভগবানকে দিয়েছি তোমার ফুল। তিনি তোমার ফুল পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। তোমাকে চুমু দিয়েছেন তিনি। কালি ফুরিয়ে গেল তাই পেন্সিলে লিখছি, তোমরা বীর ছেলে হয়ে উঠবে, দুষ্টুমি করো না, কেঁদো না, জল ঘেঁটোনা। আমি রোজ তোমাদের দেখে আসি, চুমু খাই, তোমরা যখন ঘুমোও। চণ্ডীর সঙ্গে খেলা করবে। ঘুমোলে আমায় দেখতে পাবে। তখন আমি কোলে নেব। আরো ফুল পাঠিয়ো, তোমাদের ভগবানকে দেবো। এতগুলো চুমু নাও। ইতি—

তোমার বাবা

তিয়াত্তর

[ইজাবউদ্দীন আহমদকে লিখিত।]

কলিকাতা
১২-৩-৪০

কল্যাণীয়েষু,

শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরির দ্বার-উদঘাটনে আমায় আমন্ত্রণ করেছ। এই জন্য যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদের সকলকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিরাজী সাহেব আমার পিতৃতুল্য ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে আজীবন

ভালোবেসেছেন, তা বোধ হয় তোমরা অনেকে জানো না। তাঁর ভালোবাসা ও প্রেম আমার ঊর্ধ্বলোকে যাত্রার পথে চিরদিন সহায়স্বরূপ ছিল—আজো আছে। আমার আর কোনো কর্মে স্পৃহা নেই, তবু তোমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম—পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যস্বরূপ। শিরাজী সাহেব সম্বন্ধে যা বলবার, সভাতেই বলব। ইতি—

নজরুল ইসলাম

চুয়াত্তর

[১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ইস্টারের ছুটিতে 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য-পরিষদে'র বার্ষিক উৎসবে সঙ্গীতবিভাগের অধিনায়কত্ব করার জন্য কাজী নজরুল ইসলামকে অনুরোধ করা হয়। তদুপলক্ষে কবি এই পত্রখানি লিখেছিলেন।]

আগামী ইস্টারের ছুটিতে 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদে'র বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাতে আমাকে সঙ্গীত-জলসার অধিনায়কত্ব করার জন্য যে আমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি সানন্দ সম্মতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, এই উৎসবে রসতৃষ্ণাতুর চিত্তের জন্য অমৃত ও আনন্দের 'দৌড়' চলিবে, নবযৌবনের উচ্ছল প্রাণতরঙ্গ প্রবাহিত হইবে।

কাজী নজরুল ইসলাম

পঁচাত্তর

[কবি নজরুল ইসলাম ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর, ১৩৪৭ সালের ৬ই পৌষ শনিবার কলকাতা মুসলিম ছাত্র-সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে এই বাণী প্রেরণ করেছিলেন।]

আমার আত্মার আত্মীয় প্রিয় মুসলিম ছাত্রবৃন্দ !

আপনাদের সাদর দাওয়াতের 'মুজদা' বহন করে এনেছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু আবুল মনসুর, মহীউদ্দিন ও নুরুল হুদা। আমি আপনাদের এ-দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া, ঢাকা থেকে ফিরে এসে শরীরও সুস্থ নয়। ইনশাআল্লাহ আগামিকাল আপনাদের প্রাণের নওরোজে শরিক হব।

আমার মন্ত্র—'ই'য়াকা না'বুদু ওয়া ই'য়াকা নাস্তাইন'। কেবল এক আল্লাহর আমি দাস, অন্য কারুর দাসত্ব স্বীকার করি না, একমাত্র তাঁরই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি। — আমি ফকির, আল্লাহর দরবারে আজ আমি পরম ভিক্ষু, যদি তাঁর কাছে রহমত ও শক্তি ভিক্ষা পাই—ইনশা-আল্লাহ, শুধু ভারত কেন—সারা দুনিয়ায় সত্যের ডঙ্কা বেজে

উঠবে—তৌহিদের—পরম অদ্বৈতবাদের অমৃতবন্যা বয়ে যাবে। এই অদ্বৈতবাদেই সারা বিশ্বের মানব এসে মিলিত হবে। আমায় আপনারা ভাববিলাসী স্বপ্নচারী কবি মনে করতে পারেন—কিন্তু যুগে যুগে এই স্বপ্নচারীরাই ঊর্ধ্বতম জগত থেকে, আল্লার আর্শ, কুর্শী, লওহ্, কলম থেকে—শক্তি, সাহস, বাণী, অমৃত, শান্তি আনয়ন করেছেন। এই সত্যদ্রস্টা স্বপ্নপথের পথিকরা দারিদ্র্য-দুঃখ-শোক-ব্যাধি-উৎপীড়ন-জর্জরিত মানবকে আনন্দের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে গেছেন—ইমাম হয়ে—অগ্রপথিক হয়ে। আপনাদের মধ্যে যে মহাশক্তি আজ প্রকাশের জন্য ব্যাকুল আবেগে সকল বন্ধ দুয়ার ভাঙতে চাচ্ছে, আমি নকিব হয়ে সেই শক্তিকেই আবাহন করেছি। ঐ শক্তিরই খাদেম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। কত হিটলার, কত কামাল আপনাদের মাঝে লুকিয়ে আছেন তা আপনারা জানেন না—কিন্তু আল্লাহ আমায় তাঁদের স্বরূপ দেখিয়েছেন। সর্বশক্তিদাতা আল্লাহর কাছে মুনাজাত করুন—যেন আমার প্রতীক্ষার অন্ধকার রাত্রি নবযুগের সুবহ্-সাদেকের অরুণালোকে আশু রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

এই প্রতীক্ষার শেষ মুহূর্ত আমরা কলরব করলেই শেষ হবে না। কৃষক বীজ বপন করে গাছ উদগত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে,—জমিতে লাঠি মেরে গাছ উদগত করার চেষ্টা করে না। তবে আপনাদের এই উৎসাহ ও আগ্রহ যদি ঈদ মোবারকের শুভ দিনের শেষ রাত্রির আনন্দ কলরব হয়—তবে তাকে আমি অভিনন্দিত করি—আমার সালাম জানাই।

আল্লাহ্ আপনাদের 'সেরাতুল মুস্তাকিম'—সুদৃঢ় সরল পথে পরিচালিত করুন যে অনাগত মোজাহেদিনের জন্য আল্লাহর ফিরদৌস-আলা আজো শূন্য রয়েছে—তার পবিত্র বক্ষ পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর আহ্বান নেমে আসুক আপনাদের অন্তরে—দেহে—আত্মায়। আল্লাহু আকবর !

আপনাদের ভাই—
নজরুল ইসলাম

ছিয়াত্তর

[বনগাঁ মহকুমার তৎকালীন মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মীজানুর রহমানকে লিখিত।]

১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রিট,
কলিকাতা
২৭.২.৪১

প্রিয় মিজান ভাই,

আপনার অপূর্ব পত্রখানা এর আগে পেয়েছি। পরেও পত্র পেয়েছি। উত্তর দিতে পারিনি বলে ক্ষুণ্ন হবেন না। পত্র না দিলেও মনের পত্রাবগুণ্ঠনে আপনি ফুলের মতো

ফুটে আছেন। আমার পরম প্রেমময় প্রিয়তম আল্লাহ্ জানেন, কেন মাঝে মাঝে আপনাকে মনে পড়ে কান্না পায়। এ ফকির এটুকু জানে যে, অনাগত বিপুল কর্মজগতে আপনার কাজ বিরাট। আপনার অগোচরে তাই আপনাকে তাঁর আপন প্রিয় সখা করে নিচ্ছেন। আল্লাহর প্রিয়তমদের মধ্যে একজন। তিনি নিত্য আল্লাহ্র রহমত পাচ্ছেন। আল্লাহকে প্রেমময় রূপে চিন্তা করে তাঁর সান্নিধ্য ও প্রেম লাভ করুন।

রবিবার 'জাগরণে'র লেখা দেব। আমার জন্য ভাববেন না। আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে আপনি সব হয়ে যাবে। আমার অন্তরের ভালোবাসা নিন। ইতি

সখ্যধন্য,
নজরুল

সাতাত্তর

[কবির বর্তমান রোগের প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দেয় ১০/৭/৪২ তারিখে। সে সময় কবি বাস করতেন কলকাতায় ১৫/৪ নং শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে। এই পত্রখানি ১০/৭/৪ তারিখেই জুলফিকার হায়দার সাহেবকে লিখিত। পত্রে উল্লেখিত 'অমলেন্দু' হচ্ছেন পরলোকগত অমলেন্দু দাশগুপ্ত ; তিনি সে-সময় দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন, কিন্তু তিনি তখন গ্রেফতার হননি,—কবি মানসিক অসুস্থতাবশত এরূপ কল্পনা করেছিলেন।]

৭.১০.৪২

প্রিয় হাইদর,

তুমি এখনই চলে এসো। অমলেন্দুকে আজ পুলিশে arrest করেছে। আমি কাল থেকে অসুস্থ। ইতি—

নজরুল

আটাত্তর

[কবি এই পত্রখানি আনুমানিক ১৫/৭/৪২ তারিখে পরলোকগত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীকে উদ্দেশ করে লেখেন। সে সময় ব্রজেনবাবু দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সাব এডিটর পদে কাজ করছিলেন। পত্রে উল্লেখিত 'মনসুর' হচ্ছেন আবুল মনসুর আহমদ, 'কালিপদ' হচ্ছেন পরলোকগত কালিপদ গুহরায়। সে সময় 'নবযুগ' পত্রিকার এসিস্ট্যান্ট এডিটর, 'হেম দত্ত' হচ্ছেন হেমেন্দ্রনাথ দত্ত—'নবযুগ' পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী। এই পত্রখানির ভাষা থেকে কবির তৎকালীন মানস-বিপর্যয়, স্মৃতিভ্রষ্টতা ও চিন্তার অসংলগ্নতা অনুমেয়।]

প্রিয় ব্রজেন,

কাল থেকে ... সে ... তুমি editorial লিখবে। 'আমি' অক্টোবরের মধ্যে ভালো হয়ে যাব। ফাল্গুন থেকে নব-বসন্তের মতো তেজ পাব। নৌজোয়ান হবে, আমার 'বন্ধু'র

দেহ হয়ে যাবে, 'বন্ধু' বলেছেন। বৌদি ভালো হয়ে যাবেন। বন্ধু বলেছেন। এঁরা এখন মাসে একশ টাকা করে পাবেন, বন্ধু বলেছেন। ... কদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে, ও কয়দিন বিশ্রাম করুক ফাল্গুন মাস থেকে তোমাদের মাইনে বেড়ে যাবে। ফাল্গুন মাস থেকে মনসুর আসবে—ওর মাইনে ৩০০ টাকা হয়ে যাবে। ও ফজলুল থেকে দু-মাস ধরে চিফ মিনিস্টারের পা ধরে কেঁদেছে। ও ফাল্গুন আমারও পা ধরে কাঁদবে। ও আমায় যে ভালোবেসেছিল, সে ভালোবাসা সে স্ত্রীকে বাসেনি, ছেলেমেয়েকেও বাসেনি। ইতি—

ইতি—
নজরুল

ঊনআশি

[পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৪২-এর ১০ই জুলাই নজরুল ইসলাম অসুস্থ হন। ঐ দিন তিনি সুফী জুলফিকার হায়দারকে একটি চিঠি লেখেন। এর সাত দিন পরে তিনি জুলফিকার হায়দারকে পুনরায় যে চিঠি লেখেন সেই পত্রটি কবির হস্তলিপি সহ সুফী জুলফিকার হায়দার রচিত 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থের (১ম সংস্করণ) ৬০/৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।]

প্রিয় হাইদর,

খোকাকে পাঠালাম। তুমি এখনই খোকার সাথে চলে এসো। Blood pressure-এ শয্যাগত। অতি কষ্টে চিঠি লিখছি। আমার বাড়িতে অসুখ, ঋণ, পাওনাদারের তাগাদা প্রভৃতি worries, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খাটুনি। তারপর নবযুগের worries ৩/৪ মাস পর্যন্ত। এই সব কারণে আমার nerves shattered হয়ে গেছে। ৭ মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারির মতো ৫/৬ ঘন্টা বসে থেকে ফিরে এসেছি। হিন্দু-মুসলিম Equity-র টাকা কারুর বাবার সম্পত্তি নয়, বাংলার বাঙালির টাকা। আমি ভালো চিকিৎসা করাতে পারছি না। এক মাত্র তুমিই আমার জন্য sincerely appeal করেছ সত্যকার বন্ধু হয়ে। আমার হয়তো এই শেষ পত্র তোমাকে। একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু? কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে অতি কষ্টে দু-একটা কথা বলতে পারি। বললে যন্ত্রণা সর্বশরীরে। হয়তো কবি ফেরদৌসির মতো ঐ টাকা আমার জানাজার নামাজের দিন পাব। কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ করেছি আমার আত্মীয় স্বজনকে। হয়তো ভালোই আছ।

তোমার,
নজরুল
১৭.৭.৪২

আশি

[১৯৪২-এর ১০ই জুলাই নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য মধুপুর পাঠানো হয়। সেখানে থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নজরুল এই চিঠি লেখেন। চিঠিটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ১৩ই এপ্রিল ১৯৯১ সংখ্যায় কবির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসহ মুদ্রিত হয়।]

মধুপুর
১৭.৭.৪২

শ্রীচরণেষু,

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুর এসে অনেক relief & relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়তা সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আসার ব্যবস্থা না করলে হয়তো কবি মধুসূদনের মতো হাসপাতালে আমার মৃত্যু হত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্য এখানে সাত হাজার টাকার ঋণ আছে। এর মধ্যে মাড়োয়ারি ও কাবুলিওয়ালাদের ঋণই বেশি। হক সাহেব যখন আমার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন যে, 'আমায় রক্ষা কর, মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছে না,' আমি তখন মুসলিম লীগের ছাত্র ও তরুণদলের লিডারদের ডেকে তাদের শান্ত করি। তারপর Assembly-র সমস্ত মুসলমান মেম্বারদের কাছে আমি আবেদন করি। তাঁরা আমার আবেদন শুনলেন। ৭৪ জন মেম্বার হক সাহেবকে সমর্থন করতে রাজি হলেন। নবযুগের সম্পাদনার ভার যখন নিই, তার কিছুদিন আগে ফিল্মের Music Direction-এর জন্য সাত হাজার টাকার কনট্রাক্ট পাই। হক সাহেব ও তাঁর অনেক হিন্দু-মুসলমান supporter আমায় বলেন যে, তাঁরা ও ঋণ শোধ করে দেবেন। আমি Film-এর contract cancell করে দিই। পরে যখন দু তিন মাস তাগাদা করে টাকা পেলাম না, তখন হক সাহেবকে বললাম, 'আপনি কোনো ব্যাংক থেকে অল্প সুদে আমার ঋণ করে দেন, আমার মাইনের অর্ধেক প্রতিমাসে কেটে রাখবেন। হক সাহেব খুশি হয়ে বললেন, 'পনের দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করব'। তারপর সাত মাস কেটে গেল, আজ নয় কাল করে তাঁর Supporter-রাও উদাসীন হয়ে রইলেন। আপনি জানেন Secretariate-এ আপনার সামনে হক সাহেব বলেন, 'কাজীর ঋণ শোধ করে দিতে হবে ; আপনিও আমাকে বললেন, 'ও হয়ে যাবে।' আমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করলাম। আপনি জানেন, হিন্দু মুসলমান unity-র জন্য আমি আজীবন কবিতায় গানে গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। সেসব সাহিত্যে স্থান পেয়েছে—সে গান বাংলার হাটে, ঘাটে, পল্লিতে, নগরে গীত হয়। আমি হিন্দু মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সংঘবদ্ধ করে রেখেছি, যদি হক মন্ত্রিত্ব ভেঙে যায়, তাহলে আবার coalition ministry-র জন্য।

হক সাহেব একদিন বললেন, 'কিসের টাকা? আমি চুপ করে চলে এলাম। তারপর আর তাঁর কাছে যাইনি। আপনি Secretariate–এ যখন বলেছিলেন, 'ও হয়ে যাবে,' তখন থেকে স্থির বিশ্বাসে বসে রইলাম, আমি নিশ্চয়ই টাকা পাবো। এই coalition ministry–র মধ্যে একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি—আর কাউকে নয়। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব—সেদিন বাঙালির আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে—আপনারাই হবেন এ দেশের সত্যিকার নায়ক। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি আমি Hindu-Muslim Equity Fund থেকে আমার ঋণ–মুক্তির টাকা পাবো। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশো টাকা পেয়েছি। আরো পাঁচশো টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন পাঠিয়ে দেবেন, বা যখন মধুপুরে আসবেন নিয়ে আসবেন। কোর্টের ডিক্রির টাকা দিতে হবে। তিন চারমাস দিতে পারিনি। তারা হয়তো body warrant বের করবে। আপনার মহত্ত্ব আপনার আমার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা ; শৌর্য, সাহস আমার অনুপরমাণুতে, অন্তরে–বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রণাম, পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন।

প্রণত,
কাজী নজরুল ইসলাম

একাশি

[মধুপুরে পৌঁছে নজরুল সুফী জুলফিকার হায়দারকে এই চিঠি লেখেন। এটি সুফী জুলফিকার হায়দার লিখিত 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়'–এর প্রথম সংস্করণের ৭৮ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।]

বাহান্ন বিঘা
মধুপুর
২২শে জুলাই ১৯৪২

অনুজপ্রতিমেষু,

স্নেহের হায়দার,

এখানে এসে দুদিন পর তোমাকে চিঠি লিখতে পারলাম। তোমাকে কি লিখব? তুমি আমার সহোদরের চেয়েও প্রিয়। তোমার কথা, তোমার ভালোবাসা আমার হৃদয়ে আত্মায় বিজড়িত, ইহা বাহিরের নহে।

নিত্য শুভার্থী,
নজরুল

বিরাশি

[মধুপুর থেকে কার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা। ইনি চলচ্চিত্র জগতের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি।]

'বাহান্ন বিঘা শ্রীগৌরাঙ্গধাম'
মধুপুর
(সাঁওতাল পরগণা)
১৪.৮.৪২

প্রিয় কার্তিকবাবু!

বোধ হয় শুনেছেন আমি মধুপুরে change-এ এসেছি। খবরের কাগজে দেখলাম শৈলদেবীর হিন্দি গান (চৌরঙ্গির) বেরিয়েছে। আমাকে একখানা রেকর্ড দেবেন (complimentary) এই ছেলেটির কাছে। এর নাম শ্রীমান বিজয় সেনগুপ্ত। এ আমার বাড়িতেই থাকে। ও কলকাতা যাচ্ছে। তাই এ চিঠি লিখলাম।

আপনার সময় কেমন কাটছে? আমি এখনো আরোগ্য লাভ করিনি। কঠিন অসুখ (low blood pressure)। দুতিন মাসের মধ্যেই আমি আরোগ্য লাভ করব। আমার আনন্দিত ভালোবাসা ও নমস্কার গ্রহণ করুন। প্রিয় বিভূতিবাবুকেও জানাবেন। ইতি—

সখ্যধন্য,
কাজী নজরুল

তিরাশি

[ডা. কাজী মোহাম্মদ আবদুল হামিদকে লিখিত।]

39 Sitanath Rd.
4-5-32

প্রিয় হামিদ সাব,

আপনার পত্র পেয়েছি। ভয়ানক দুর্দিনে পড়েছি। প্রাপ্য টাকা পাচ্ছি না পাবলিশারের কাছ থেকে।

'আমপারা'র বাংলা পদ্য অনুবাদ করা আছে—কোনো মুসলমান পাবলিশার জোগাড় করে দিতে পারেন? তাহলে অন্তত আপনার টাকাটা দিতে পারি।

মখদুমী লাইব্রেরীতে চেষ্টা করলে হয় না?

আমার জানা নাই ওদের সাথে।

হপ্তাখানিকের মধ্যে আমি দিয়ে দেব। অবশ্য, দেবির জন্য ওকে সুদ দিব।
ভাবী সাহেবাকে দেখতে যাবে মেয়েরা দুএকদিনের মধ্যে।
এখানে সব ভালো। ইতি।

সখ্যধন্য
নজরুল

চুরাশি

প্রিয় হামিদ সাহেব !

অসুখের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। কাল যাব দেখতে
আমি ভালো। তবে খুব দুর্বল।
টাকা আর দিন সাতেকের মধ্যেই পাব। আপনাকে বলতে হবে না।
আমি নিজেই লজ্জায় মরে আছি।
পেলেই দিয়ে আসব।

আপনার,
নজরুল

পঁচাশি

39 Sitanath Road
Calcutta
27.8.35

My dear uncle!

Taslim! It is after a 'Yuga' I venture to write to you. I have heard from my brother of your kindness and help to them in any way except that I have given them innumerable troubles. I have acquired everything except wealth. So I am helpless to help even my ownself. I have sacrificed every thing for my country or else I could be a rich man easily. From our childhood we have been taken care of by your kind family. In every drop of my blood flows your heavenly kindness and grace. It is only for these sympathy to the poor and oppressed that Allah has given you wealth, fame and peace. I do not know when Allah will take me to my native village to kiss the dust of your sacred feet. Wherever I

live I remember you with deepest regards. My elder brother is suffering from some sort of disease which you are the best judge of. Would you be kind enough to take charge of him earnestly as one of your patients? Please send me the bill for medicine etc. direct or through my brother to me and I shall promptly pay the amount to you, poor though I am. Moreover I heard from my two brothers that some of my village brethren or rather relatives are against them and giving them much trouble. I with my brother seek shelter under you. You will kindly look after them and take necessary steps so that they must not be tortured by anybody. I appeal to you not only as Magistrate and President of Union Board but as our very kind patron and "Ashraya Data" with lakh Salam.

Affectionately yours,
Nazrul Islam.

ছিয়াশি

এই পত্রটি 'নবশক্তি' পত্রিকায় মেঘদূত (বিজলী) বিভাগে ১৩৩৬ সালের ৭ই ভাদ্র (২৩শে আগস্ট ১৯২৯) তারিখে প্রকাশিত হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত 'নবশক্তি' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সাপ্তাহিকের 'মেঘদূত'-এর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। আপনার 'মেঘদূত'-এর বার্তা যিনি প্রেরণ করেন তিনি বিরহী কি না জানিনে, তবে তিনি যে একজন সত্যিকার 'রসিক সুজন' তাতে সন্দেহ নেই। শুধু কথা-রসিক নন, গীত-রসিক। গীত-রসিক বলছি আমিও একজন প্রায়-নিয়মিত, বেতারবাহী-সংগীতশ্রোতা বলে। ভদ্রলোকের কান আছে, প্রাণ আছে আর সবচেয়ে বড় কথা, লেখনিতে ভাষা আছে। তাঁর লেখা পড়ে বেশ বোঝা যায়, তিনি পুরানো নতুন জানা-অজানা সকল গীত-রচয়িতার গানের সঙ্গেই বেশ দস্তুর-মতো পরিচিত। শুধু বাণীর সঙ্গেই নয়, গানের সুরের সঙ্গেও পরিচিত। তিনি যে চিত্রকূটেই থাকুন, তাঁকে আমাদের গীত-রচয়িতাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার নিজের দিক থেকে কিন্তু গোটাকতক কথা বলবার আছে এ নিয়ে। তার কারণ, আমার গান প্রায় প্রত্যহই কোনো না কোনো আর্টিস্ট রেডিওতে গেয়ে থাকেন

এবং আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত তা শুনেও ফেলি। এক উমাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং ক্বচিৎ দু'একজন গাইয়ে ছাড়া অধিকাংশ ভদ্রলোক বা মহিলাই আমার গান ও সুরকে অসহায় ভেবে (বা একা পেয়ে) তার পিণ্ডি এমনি করেই চটকান, যে মনে হয়, ওর গয়ালাভ ঐখানেই হয়ে গেল। সে একটা রীতিমতো সুরাসুরের যুদ্ধ।

একদিন শুনলাম, কোনো এক ভদ্রলোক আমার ঠুংরি-চালের 'দুর্গা' সুরের 'নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখিজল' গানটিকে ধ্রুপদের ইমন কল্যাণ সুরে গাচ্ছেন এবং তা শুনে আমার গানের 'আঁখিজল' আমার চোখে এসে দেখা দিল। অবশ্য অনুরাগে নয়, রাগে এবং দুঃখে! ভাগ্যিস গান এবং গাইয়ে দুই-ই ছিল নাগালের বাইরে, নইলে সেদিন ভালো করেই সুরাসুরের যুদ্ধ বেধে যেত।

আর একদিন একজন 'রেডিও-স্টার' (মহিলা) আমার 'আমারে চোখ ইশারায়' গানটার ন্যাজামুড়ো হাত-পা নিয়ে এমন করে তাল পাকিয়ে দিলেন যে, তা দেখে মনে হল, বুঝি বা গানটার ওপরে একটা মোটর লরি চলে গেছে। মোটর এ্যাকসিডেন্ট না হলে ওরকম কন্ধ-কাটা নুলো খোঁড়া ক্ষতবিক্ষত অবস্থা কারুর হয় না।

এরকম প্রায় প্রত্যহই হয়, এবং হয়—বেতারের গাইয়ে-গুণীজন যাঁরা আমার গান দয়া করে গেয়ে থাকেন, তাঁরা আর একটু দয়া করে গানগুলোর মোটামুটি সুর ও গানের কথা জানবার কষ্ট স্বীকার করেন না।

আপনার 'মেঘদূতের' 'বিজলী' মহাশয় (বা মহাশয়া) অবশ্য তাঁদের ছেড়ে কথা কন না, মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধিয়েও দেন তাঁদের। কিন্তু হলে হবে কি, এতেও তো তাঁদের চোখ ফুটেছে বলে মনে হয় না।

আর একটি কথা, বেতার-বার্তার বাঙালি কর্তা মহাশয় প্রায় ভুলে যান গীত-রচয়িতার নাম ঘোষণা করতে। তাতে করে অনেক নবীন অনুকারকের প্রাপ্য প্রশংসা হয়তো আমাদের ওপরে এসে পড়ে। গজল ঠুংরির নিত্য নব অনুকারক ও কারিকার গানকে শ্রোতারা আমাদের গান মনে করে প্রায়ই অভিযোগ করেন। গালই খেতে হয় বেশির ভাগ। গালই হোক আর, প্রশংসাই হোক, যার যেটা প্রাপ্য তার থেকে তাকে বঞ্চিত করা মস্ত বড় অন্যায়। তার চেয়েও বড় অন্যায়—সেই গালি বা প্রশংসা যখন কোনো নির্দোষ বেচারার কাঁধে এসে পড়ে। আমাদের গান বেতারে গীত হওয়ার বদলে কিছুই পাইনে, কাজেই বেতার-কর্তৃপক্ষের কাছে এটুকু সৌজন্য হয়তো প্রত্যাশা করতে পারি যে, তিনি অন্তত গানটা যাঁর রচনা—তাঁর নামটা উল্লেখ করেন। এতে হয়তো তাঁদের ব্যবসার কিছু ক্ষতি হবে না। আমাদের ক্ষতি যা হবার, তা তো হচ্ছেই।

বিনীত—
নজরুল ইসলাম

মধুপুর
১২.৯.৪২

সাতাশি

কল্যাণীয়াসু,
স্নেহের বুড়ু,

তোর চিঠি পেয়েছি। ৩/৪ মাস লাগবে না ভালো হতে, অক্টোবরের ১৫ তারিখেই কলকাতা যাব সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়ে। শুধু আমি নয় তোর মাসিমাও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ হয়ে, আমার 'বন্ধু' (ভগবান) বলেছেন। এটা শেষ পরীক্ষা। 'বন্ধু' বলেছেন 'শরতের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে'। আমার দেহ যাঁর সেই 'বন্ধু'ই আমায় আরোগ্য করবেন, আমার দেহ তাঁর হয়ে যাবে। চিঠিপত্র বন্ধ হবে না, তবে ট্রেন আসানসোল পর্যন্ত আসছে তারপর শুধু মিলিটারি ট্রেন আসে। সে ট্রেনে সোলজার ছাড়া অন্য কাউকে আসতে বা যেতে দেয় না। কাজেই আমরা ১৫ই অক্টোবরের আগে যেতে পারব না। হয়তো ১৫ই অক্টোবর বা তার ২/১ দিন আগে থেকে ট্রেন চলবে। খোকা কলকাতা থেকে আসানসোল পর্যন্ত ট্রেনে এসে, সাইকেলে মধুপুরে এসেছে। সানি নিনি সাইকেল পেয়ে আনন্দে মাতোহারা হয়ে উঠেছে। অর্ধেক দিন শুধু সাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়ায়। তোর রুমাল পেয়েছি—চমৎকার হয়েছে। এখানে সকলেই ভাল আছে। তুই আমার আনন্দিত সুভাশীষ গ্রহণ কর। টিপু ইত্যাদি সকলকে আশীষ জানাবি। ইতি।

নিত্যশুভার্থী,
মেসোমশাই

অষ্টআশি

প্রিয় হামিদ সাহেব,

অসুখের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। কাল যাব দেখতে। আমি ভালো। তবে খুব দুর্বল।

টাকা আর দিন সাতেকের মধ্যেই পাব, আপনাকে বলতে হবে না। আমি নিজেই লজ্জায় মরে আছি। পেলেই দিয়ে আসব।

আপনার,
নজরুল

বিবিধ

কবিতা

অভিযান ১

নতুন পথের যাত্রা পথিক
চালাও অভিযান
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
'মানুষ মহীয়ান'।
চারদিকে আজ ভিরুর মেলা
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান!!

সমর–সাজের নাইরে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আসবে রণ–সজ্জা কবে
সেই আশায়ই রইলি সবে
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখি গান
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান।
আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রাপথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।

অভিযানের বীরসেনাদল
জ্বালাও মশাল, চল আগে চল

কুচকাওয়াজে বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
'জয় নব-উত্থান।'

নারায়ণগঞ্জ
২-৭-২৬

হাওয়ার দূতী

ও ভাই ভোরের হাওয়া!
দখিন পথে আসতে তোমার যায় যদি ফের পাওয়া
চপল আমার পলাতকা হরিণীটির চাওয়া,—

বোলো নরম সুরে,
আজো তারে ফিরছি খুঁজে পাহাড় মরু ঘুরে;
বনের মাঝে—মনের মাঝে অনেক—অনেক দূরে!

সে সরবৎ সাকি,
চিনির পানায় তোতা পাখি মিঠায় পিয়াস রাখি,—
অধর ভরা মিষ্টি চুমো আশেক পাবে না কি?

বোলো—ওগো ফুল।
রূপের গরব স্মরণপথে পাছে ঘটায় ভুল
যে, মালঞ্চ এক কাঁদচে তোমার বিরহী বুলবুল,

কয়ে রাখি তাই,
জাল দিয়ে কেউ চতুর পাখি ধরতে পারে নাই;
ধরতে আশেক রূপের সাথে মুখের মিঠাও চাই।

আর পড়িয়ে দিও মনে—
শরাব পিতে বসবে যবে আমার পিয়ার সনে—
ক্লান্ত তাহার কান্ত কথা কাঁদতেছে যে বনে।

বোলো যদি চেনো,—
তন্বী তনুর ঋজুতায় আর ডাগর চোখে হেন
চাঁদ-বদনে ভালোবাসার রঙ ফোটেনি কেন?

শুন ও সুন্দরী,
তোমার রূপের তুলনা নেই ও তনু কুন্দরই,
একটি শুধু দোষ ও-রূপে রয়েছে ঘুণ ধরি—

রূপ সে তো নির্গুণ,
করুণা আর প্রেমের যদি না রয় তাতে খুন ;
কোর্মা পোলাও সেও বিস্বাদ না যদি দাও নুন।

নেই এতে বিস্ময়,
হাফিজ ! তোমার গজল যদি স্বর্গে গীত হয়,
মুগ্ধ হয়ে হজরত ঈসাও নাচবেনই নিশ্চয় !

[প্রকাশ : 'উপাসনা', শ্রাবণ ১৩২৭।]

দীওয়ান-ই-হাফিজ

এক

নৌ-জোয়ানির জৌলুসে ফের গুলজার আজ গোলেস্তান,
ফুল-কিশোরীর খোশ-খবরি গায় বুলবুল খোশ-এলহান।

যৌবনাতুর ফুলকুঁড়ি-বাস যাচ্ছ মলয় ঘোড়-সওয়ার,
সরো, গোলাব, যুঁই, বেলিদের কইবে কি মোর নমস্কার ?

চাঁদ চেহারায় স্নান করো না কস্তুরী-কেশ-ধূপছায়ায়,
চুনোট চুলের খুনসুটি তোর করবে এবার খুন আমায় !

মদপায়ীদের নিত্য যারা বদনামি গায়,—হচ্ছে ভয়,—
এই খারাবির খেয়াল-সুখই ইমান তাদের করবে ক্ষয় !

খোদার প্রিয়ের হও প্রিয়তম, —আছেন বুঝি 'নোহের' নায়
সিন্ধুকে যে বিন্দু ভাবে তুফান যাহার হুকুম চায় !

শনির সরাই দুনিয়াখানায় পাতিসনে হাত, পালিয়ে আয় ;
অতিথ্ এলেই কঞ্জুশ এই কাফের করে কতল তায় !

মদ-পূজারী বাচ্চা শুঁড়ি পুতুল যদি হয় আমার
নয়ন-পাতায় করব ঝাড়ু শরাবখানার দোরে তার।

'সোহ্‌হম সত্য', 'জগৎ মিথ্যা' গণ্ডুষে যদি নাও শুষেও
দেহ-দেউলের কণা-রহস্য বুঝাতে নারবে বন্ধু কেউ !

আখেরে যাহার সম্বল ভাই দুমুঠো মাটির নিঁদ-মহল,
বল সে বেকুবে, গগনচুম্বী সাত-মহলাতে তার কি ফল ?

হে মোর বন্দী কিনানের চাঁদ ! মেসের আজ তব দণ্ডাধীন,
কারাবাসে এবে বিদায় বলিয়া হও এসে সখা তখ্‌ত্‌-নশিন।

জানিনে লো তোর এল কুন্তলে কি খেয়াল খেলে এলোমেলো,
আ মলো ! শ্যামল কস্তুরী-কেশ দিনে কতবার আল্‌গে লো !

মুক্তি-মুলুক, সবুরির কোঠা এমন অজেয় উচ্চশির
জিনিবে তা বলে নাই হেন শত বাদশার তরবারির।

মদ পি হাফিজ, মস্তানি চালা, বাস নেচে গেয়ে কাটুক কাল !
অন্যের মতো করো না কোরানে ফেরেববাজির ফন্দি-জাল !

[প্রকাশ : 'প্রবর্তক', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০]

দীওয়ান-ই-হাফিজ
দুই

কোন্‌ বেদনায় নিলাম বিদায় 'দিলজানি' আর দিল্‌ জানে
বদ-নসিবের দানাদানি টানছে সে কোন্‌ দূর টানে।।
তোমার সিঁথির মতির মতন নজর দেবো অশ্রু বুঁদ।
সেই দূতীরে, সালাম তোমার পৌঁছাবে যে মোর পানে।।
এস প্রিয়া, আশীস মাগি, আমার সাথে হাত ওঠাও,
তোমার প্রাণে বিশ্বাস আসে, আসেন খোদা মোর ত্রাণে।।
মোদের 'পরে জুলুম যদি করেই জাগে ঈর্ষাতুর,
ভয় কি সখি, মোদের খোদা শোধ নেবে তার সেইখানে।।
তোমার শিরের কসম 'শিরি' তোমার নেশা টুটবে না,
যদিই তামাম জাহান জুটে শির্‌ 'পরে মোর তীর হানে।।
জানো কি সই, কেনই আমায় ফেরায় গ্রহ দিগ্বিদিক ?
তোমার পানে মন টানে মোর, ঈর্ষা জাগে ওর প্রাণে।।
ব্যথিত্‌ আমি, বুকের আমার ব্যথার খবর দেয় গো ওই
তৃষ্ণার্ত ঠোঁট সিক্ত আঁখি শুষ্ক মুখের উদ্যানে।।

খুব্‌সুরত্‌ ঐ রূপের তারিফ লিখনু যেদিন্‌, সেই হতে
আমার বইয়ের পাতার কাছে ফুলের পাতা হার মানে ॥
'মাশুক' আমার আসুক ফিরে সুস্থ দেহে জল্‌দি গো,
আসবে হেসে কখন পাশে শিস্‌ দেবে সুখ সিস্তানে ॥
দোহাই খোদার ! কোথায় হাফিজ, যদিই গো কেউ জিজ্ঞাসে,
বোলো—পথিক গেছে কেঁদে আমা হতে দূর পানে ॥

'কল্লোল', পৌষ ১৩৩৮

[দিলজানি—প্রিয়তমা। বদ্‌-নসিব—ভাগ্যহত। নজর—উপহার। কসম—দিব্য। তারিফ— প্রশংসা। তামাম জাহান—সারা বিশ্ব। মাশুক—প্রিয়া।]

বাঁশি বাজে

পূবালি পবনে বাঁশি বাজে রাই রাই
ভবনের বধূরে ডাকে বনের বিরহী
রতন হিন্দোলা সঙ্গে ডালে বাঁধা
দুলে দুলে ডাকে যেন রাধা রাই
দুরু দুরু বুকে বাজে গুরু গুরু দেয়া
কেয়া ফুল সনে ফুল শ্যামসুগন্ধ রাই।

সুরসুনার প্রতিভা গ্রন্থাগারের খাতায় লেখা

স্নিগ্ধ-ছায়া শান্ত গ্রামের নিভৃত একটেরে
পাখি যথায় ফুলের সাথে আলাপ করে ফেরে
সূর্য-কিরণ গহন নীলে গাহন করি যথা
কোমল হয়ে ঝরে পড়ে, স্তব্ধ যথা-কথা,
জ্ঞান-সাধকের সেই তপোবন, সেই তো তীর্থভূমি,
কুসুম সদাই ঝরে হেথায় দেউলচূড়া চুমি।
বাইরে চলে কোলাহলের বিরাট কর্মশালা,
ধূম্র-মলিন আকাশ সেথা নীল অমিয়-ঢালা ;
নিত্য হৃদয় পিষ্ট সেথা কাজের জাঁতাকলে,
হেথায় বসে নীরব সাধক একলা তরুতলে।

হেথায় বসে গোপনে সে জ্বালায় প্রাণের বাতি,
আপনাকে সে ক্ষয় করে আর ঘুচায় আঁধার রাতি
অল্পে পরিতুষ্ট এরা, বিপুল এদের দান
এরাই করে মানুষেরে মহা মহীয়ান।
সুন্দর হোক সার্থক হোক, এই জ্ঞান-সাধনা,
আসুক হেথা যাত্রী শত কুড়াতে জ্ঞান-কণা।
বাণীর আশিস ঝরুক হেথা সহস্র কিরণে,
জাগুক ইহার মন্ত্রে সবাই নবীন জাগরণে।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯৪০

সুনির্মল বসুর বিবাহে

সুনির্মল ঐ দূর গগনে
উড়লে আজি গানের পাখি,
নতুন নীহারিকা-লোকের
স্বপ্ন-মায়া চক্ষে মাখি।
মুক্ত ছিলে ধরায় তুমি
পড়লে বাঁধন নীহারিকায়,
উজ্জ্বল হোক নতুন জীবন
নতুন লোকের জ্যোতির শিখায়।

হাসিরাশি দেবীকে প্রদত্ত কবির অটোগ্রাফ

লেখার রেখার পিঞ্জর খুলে যে কথা উড়িয়া যায়
শিল্পীর তুলি সেই লেখাগুলি ধরিয়া রাখিতে চায়।
তুলির তিলক কালে মুছে যায়, লেখা হয়ে যায় বাসি
কালের কপোলে টোল খেয়ে ওঠে তাহাদেরই হাসিরাশি।

[কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৩৪]

হারা-ছেলের চিঠি

.মা

সেদিন ছিল যাত্রানাস্তির দিন যেদিন ভোরে নতুন করে পুবের পানে পা বাড়ালাম ! ঐ পুবের পারে উদয়রবির তোরণদ্বারে সেদিন সোহিনী-বিভাস পূরবীর মতো কান্না কেঁদে আমায় ডাক দিয়েছিল। আমার মনের বীণায় বুঝি সে সুরমূর্চ্ছনার ছোঁওয়া লেগেছিল। সাগরপারের আমার সেই অচেনা বীণবাদিনীর কাজল চোখে তখন বাদল নেমেছিল। সে বিদেশিনীর সজল চাওয়ার মিনতি-ইঙ্গিত আমি সেদিন বুঝিনি। তার দীঘল ঘন আঁখিপল্লবের কম্পনে কম্পনে যে কালো ছায়াছবির মায়া দুলছিল, তাকেই আমি সেদিন বোবা বালিকার পথে বেরিয়ে পড়ার হাতছানি মনে করেছিলাম। তাই পথহীন পথের বুকে দাঁড়িয়ে আমি ঐ সীমাহারা পুবের পানে হাত বাড়ালাম। তখন ছিল যাত্রানাস্তির ক্ষণ। মনে হল, ঐ নীল আকাশের নিতল চোখে জল-ছলছল শুকতারাটি যেন তারি আঁখিতারা, তার করুণ কিরণের অরুণ সুর আমার হিয়ায় হিয়ায় পথিক বধূর বেদন জাগিয়ে গেল। তোমার পলাতকা পথিকশিশু আবার পথে বেরিয়ে পড়ল।

পথ চলতে চলতে মনে হল, এই আমার সেই 'বিপুল সুদূর'—সেই অদেখা বন্ধু, যার বাঁশির সুর আমায় দিশেহারা বাউল, পথহারা পথিক করে পথের পর পথ ঘুরিয়ে মারছে—কোথাও বাসা বাঁধতে দিচ্ছে না। ঝড়ের রাতে নীড়হারা বিহগ শাবকের মতো আমি একটু আশ্রয়-আশায় শুধু দিগ্বলয়ের কোল ঘেঁসে ঘেঁসে উড়ে বেড়িয়েছি, ঘরের পানে তৃষিত—ব্যাকুল চোখে চেয়েছি, আর কেমন এক বিদ্রোহ-অভিমানে আমার দুচোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সে আশ্রয়ও আমি পাইনি, ঘরও মেলেনি—তোমার মতন করে এ বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখিকে কেউ বুকে তুলেও নেয়নি—আজ আমি আবার ছুটে যেতে চাই কেন ? কিসের এত অভিমান-ক্রন্দন আজ আমার বুকে নিখিল মাতৃহারা শিশুর আকুল হাহাকার হানছে ? আত্মীয়-পর সবাই মিলে যার গলায় কসাই-এর মতো ছুরি চালিয়েও কাঁদাতে পারেনি, ভগবান যার প্রথম এবং প্রধান শত্রু, রুদ্রদেব সারা বিশ্বের অশান্তি আর অভিশাপ হেনেও যাকে পরাজয় মানাতে পারেনি, তাকে তুমি কেমন করে এমন অসহায় শিশুর মতন করে ডাক ছেড়ে কাঁদালে ? কেন তাকে কাঁদালে ? আর কিসের এ দুর্জয় ক্রন্দন আমার ? কেন আজ মনে হচ্ছে, এই আমার একবার প্রাণ খুলে পথে পথে কেঁদে বেড়াবার দিন ? আজ আমার মনে পড়ছে, যে কেহ আমায় আদর করে বুকে ধরতে এসেছে, অমনি সে জ্বলে 'পুড়ে' খাক হয়ে গেছে। আর অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ অকারণ আহত আমি, শুধু জল-ভরা চোখে কোন নিষ্ঠুর নিয়ন্তার পানে তাকিয়ে কী

যেন জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছি ! অমনি দূরে-দূরে শাল-পিয়ালের শ্যামল পথ পারায়ে ঐ বীণ্-বাদিনীর কচি কণ্ঠের সিক্তসুর এই বলে আমায় কাঁদিয়ে গেছে :

সে মানুষ আগুনভরা, পড়লে ধরা
সে কি বাঁচে ?
কেবলই এড়িয়ে চলার ছন্দে যে তার
রক্ত নাচে !

কিন্তু সত্যই কি আমি আগুনভরা ? সত্যই কি আমার আগুন আঁচে গৃহবাসীর ঘরের শান্তি পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ? কেন ? আমি বোধহয় ভুলেও কোনোদিন কোনো শত্রুরও শত্রুতা-সাধন করিনি। আমি পথের পথিক, পথের ভিখারি, চির-গৃহহারা। আমার শত্রুই বা কে, আর কারই বা অনিষ্ট করব ? আমি তো দুঃখ দিতে চাইনে, আমি চাই শুধু আনন্দ দিতে, নিজের সারা বিশ্বের, নর-নারীর সকল অকল্যাণ-বিষ আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে, ঘরে ঘরে কল্যাণ বিলাতে ! তবে, এ কোন নির্মম শক্তি আমার মঙ্গলপথে কাঁটার বেড়া দেয় ? তবু কি বলতে হবে মা, যে, 'মঙ্গলময়' বিশেষণে বিশেষিত বিধাতা নামক কোনো জীব এ বিশ্বকে সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্তা কেউ নাই।

যাক সে কথা। কি বলছিলাম ? সেদিন ছিল ১৩২৭ সালের ২১শে চৈত্র, রবিবার নিশিভোর ; দিন ক্ষণ সমস্ত কিছু ছিল যাত্রানাস্তি-র, যেদিন অকারণে বিনা-কাজের আহ্বানে পুবের পানে পাড়ি দিলাম। সে যাত্রার কথা আমার প্রাণ-প্রিয়তম বন্ধুদেরও জানালাম না, পাছে তারা বাধা দেয়। আমায় যে তখন চলায় পেয়েছে, তখন পথ যে আমায় ডাক দিয়েছে। আমি এই একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে আসছি যে, কাজের মাঝে ডাক পড়লে আমি তাতে সাড়া দিতে পারি না, কিন্তু বিনা কাজের ডাকে আমার মাঝের পাগল কি উল্লাসেই না নৃত্য করে ওঠে !

কেন চলেছিলাম ? কিসের আশায় চলেছিলাম ? কে আমায় দুঃখ দিল যে, আমার পথের বাসা হাতের সুখে বানিয়ে এমন করে পায়ের সুখে ভেঙে পথে দাঁড়ালাম ? তা জানিনে ! ... আজ এক-বুক বেদনা বুকে চেপে ঐ অকারণ-যাত্রার মানেটা হাজার রকমে বুঝতে চেষ্টা করছি আর সেই ব্যর্থ চেষ্টার ব্যথা ক্লেশে মাথার আর বুকের ভেতরটা আমার যেন কেমন নিসাড় হয়ে আসচে—কে যেন আগুনের হাতুড়ি নিয়ে পাঁজর-চাপা এই ঝাঁজরা কলজেটাতে ঘা মারছে।

আমার বড্ডো আদরের পথে পাওয়া এক ছোট বোন মরণ-শিয়রে দাঁড়িয়ে, তার এই পালিয়ে-বেড়ানো পথিক-ভাইটিকে ধরতে পাঠিয়ে সেই পথের বুকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত শেষ দৃষ্টিটুকুর করুণ সোহাগ-কান্না বিছিয়ে রেখেছিল। পথের নেশা আমায় এমন মাতাল করে তুলেছিল যে, নির্মম আমি, আমার অভিমানী বোনের সে অধিকার দুপায়ে দলে চলে গেছি। সে শুধু জলভরা চোখে এই স্নেহ অধিকারের পরাজয় চেয়ে চেয়ে দেখেছে—কিছু বলেনি ! তার ঐ কিচ্ছু না-কওয়াটাই আমার বুকে দাগ কেটে কেটে বসে যাচ্ছে ! আমার এ অপরাধ সে ক্ষমা করবে কিনা জানি না, কিন্তু সে করলেও

আমি কোনোদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। স্নেহ-অধিকারকে মাড়িয়ে যাওয়ার বুঝি ক্ষমা নাই।

হায় ! কত দুঃখের, কত ক্লেশের, কত আশা-ভরসার বন্ধনে আমি নিজেকে জড়াই আমার এই পথে-পাওয়াদের মাঝে ! আর কত নিবিড় করেই না তাদের এই হারা-ভীতু বুকের তলায় জড়িয়ে ধরি ! আবার, সে কোন মুহূর্তে এক নিমেষের ভুলে, এক অজানা ক্ষণের খামখেয়ালিতে কি নিষ্করুণভাবেই না সে বেদনা-বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে আর এক অজানা পথে ছুটে চলি ! সে ভুল এত বড় ভুল যে সারা জীবনের সাধনাতেও তা আর বুঝি শোধরানো যায় না। এ কি অশোয়াস্তির অভিশপ্ত অশান্ত জীবন আমার ! কে আমার এই নির্দয় ভুল করায় ? কে এমন করে আমার পথের বাসা বারেবারে ঝড়ে উড়িয়ে দেয় ? কে সে ? কেন তার এ অহেতুক দুশমন আমার ওপর ?

এই বন্ধন ছিন্ন করে করে আজ দেখছি, এতে ক্ষতি হয়েছে আমারি সবচেয়ে বেশি, দুঃখ পেয়েছি আমিই সবচেয়ে বেশি ! এতে যে আমার নিজের বুকই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমি যে বাঁধন খুলিনি, বাঁধন ছিঁড়েছি। আর, ঐ টেনে ছেঁড়ার দরুন প্রতিবারই একটা করে শক্ত গিঁট আমার কলজে-তলায় কেটে বসে গেছে ! তাই আজ আমার এই হৃদয়রোগের সৃষ্টি, আজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও আমার এত কষ্ট ! দম যেন আটকে আসছে, তবু একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না ! হিয়ায় হিয়ায় আমার এক বীভৎস খুনখারাবি—শুধু লাল আর লাল ! খানখান খুন ! ! সে ছিন্ন গ্রন্থি-বন্ধনগুলোর সব কটাই আমার হৃৎপিণ্ডটা জুড়ে ক্রমেই দাগ কেটে কেটে বসে যাচ্ছে, আর ততই আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ঝাউয়ের বুকে উত্তরী হাওয়ার লুটিয়ে-পড়া কাঁদনের মতো কাৎরে কাৎরে উঠছে ! উঃ, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা মা !

হ্যাঁ, তবু আমায় যেতে হল। সকলের স্নেহ-অধিকারের কাতর কান্না আহ্বানকে পরাজিত করে আমায় উড়িয়ে নিয়ে গেল, পুবের হাওয়ায় ভেসে-আসা ঐ বেদন সুর। সে তখন গাইছিল—'ওরে সাবধানি পথিক ! বারেক পথ ভুলে মর ফিরে।' আমার মনের কোণে কেমন যেন কাতর কান্না গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল—'ওরে এই বেলা বেরিয়ে পড়, নইলে আর সে অসম্ভাবিতের দেখা পাবিনে—পাবিনে !' হায়, কে সে অসম্ভাবিত আমার ? কোন আপন জনকে এবার পাব আমি ? কোন হারা-মা আমায় ডাক দিয়েছে ? আচ্ছা, যে স্নেহ আমায় ডাক দিয়েছে, যে ঘরের মায়া এমন করে আমায় পথের পানে আকর্ষণ করছে, সে কি নিজ হতে এসে ধরা দেবে না ? সেও কি আমার আশায় পথ চলছে না ? আবার মনের বনে আমার প্রতিধ্বনি উঠল, 'না রে পাগল ! তার চলা যে অনেক—অনেক যুগের ! এবার তোকেই এগিয়ে গিয়ে তাকে পেতে হবে।' পুবের হাওয়ায় ঐ কথাটি আমি গানের সুরে পথে পথে গেয়ে বেড়াতে লাগলাম :

কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে
আমি চলব বাহিরে।
ঐ শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে—
আর সময় নাহি রে ...

তারপর যেতে যেতে দেখলাম পথের দুধারি ঘাসে আর কাশের সার ছোট্ট অভিমানী মেয়ের মতো শীষ দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে—'না, না, না !' ধানের কচি চারাগুলি তাদের অধরপুটে সবুজ হাসি ফুটিয়ে মাথা হেলিয়ে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে—'না, না, না !' দূরে দিগন্ত-ছোঁওয়া গ্রামে সীমায় লাজনত বাঁশের বধূ মাটির পানে চেয়ে চেয়ে শ্বাস ফেলছে আর কেঁপে কেঁপে জানাচ্ছে, 'না, না, না !' বাঁধাঘাটে কাঁখের কলসি জলে ভাসিয়ে দিয়ে কিশোরী পল্লিবধূ আমার রথের পানে চেয়ে সজল চোখের করুণ চাওয়ার ভাষায় প্রশ্ন করছিল, 'কোথা যাও, ওগো বিদেশি পথিক ?' সে বালিকাবধূ ভাবছিল, হয়তো তার বাপের বাড়ির কাছেই আমার বাড়ি ! হয়তো তাদের ঘরের সামনে দিয়ে আমার চলার পথ ! আহা, ওর যে তাহলে কত কথাই জানাবার আছে তার বাপ-মাকে, তার ছোট ছোট ভাইবোনগুলিকে ! ঐ ছোট্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এ গৃহহারার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল ! আহা, মার কোল-ছেঁড়া গৃহ-হারা দিদি আমার ! আমি তোদের দেশের নই বোন, তবু কেন তোকে দেখে এত কান্না পায় ! তোর চোখে আজ সারা বাংলার ঘরহারা বালিকাবধূর ব্যথা ঘনিয়ে উঠেছে যে ভাই ! ঘরের মায়া এমনই বেদনা-বিজড়িত মধুর ! দেখলাম, ময়নামতি শাড়ির খুঁটে চোখ মুছে ভরা কলসি কাঁখে সে ধানখেত পারিয়ে শুপারি গাছের সারির মাঝে মিলিয়ে গেল। 'রাজা রানি' নাটকের 'কুমার'-এর 'ইলা'-র সঙ্গে কথোপকথনের সেইখানটা মনে পড়ে গেল, যেখানে 'কুমার' তার বড় সোহাগের বড় আদরের ছোট বোন 'সুমিত্রা'-র কথা মনে করে চোখের জল ফেলছে। 'সুমিত্রা' তখন পর হয়ে গেছে—তার বিয়ে হয়ে গেছে। সেই কথাটি সে 'ইলা'র কাছে প্রাণ-কাঁদানো ভাষায় করুণ মধুর করে বলছে। সেই সঙ্গে 'ইলা'র মর্মস্পর্শী গানটিও মনে পড়ে গেল :

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর।
বাহিরে বাঁশির সুরে ছেড়ে যায় ঘর !

আরো দেখলাম, কলার ভেলায় চড়ে উদাসীন পথিক গাঙ পার হচ্ছে, আর গাঙের দুপাশের ধানের চারায় ধানি হরফে লেখা তার কোন যেন হারানো-জনের পত্র-লেখা আনমনে পড়তে পড়তে যাচ্ছে। আমার মনের গাঁয়ের চিরদিনের পসারিনী তখনো 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে' হেঁকে হেঁকে দখিন হাওয়াকে ব্যথা দিচ্ছিল।

রোদে-পোড়া দুপুরটা তৃষ্ণাকাতর যমকাকের মতো হাঁপাচ্ছে আর খাঁ খাঁ করছে, তখন তরী আমাদের পদ্মার বুকে ভাসল ! দেখলাম পদ্মার শুকনো ধূ-ধূ করা চরটা নির্জলা একাদশীর উপবাস-ক্লান্ত বিধবা মেয়ের মতো উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে ধুঁকছে। ও-পারে মানিকগঞ্জের সীমানা সবুজ রেখায় আঁকা। এ-পারে ফরিদপুরের ঘন বনছায়া। এ-পারে ও-পারে দুটি সাথী-হারা কপোত-কপোতী কূজন-কান্নায় তখন যেন সারা দুপুরটার বুকে দুপুরে মাতন জুড়ে দিয়েছিল ! কি এক অকূল শূন্যতার ব্যথায় বুকটা আমার যেন হো হো করে আর্তনাদ করে উঠল।

মা ! যেদিন নিজে নিজে কেঁদে তোমাদের কাঁদিয়ে বিদায় নিয়ে আসি, সেদিন আসন্ন বিকালে এই গোয়ালন্দের ঘাটে পদ্মার বুকে স্টিমারে রেলিং ধরে ঐ পরপারে—

মানিকগঞ্জের সবুজ সীমারেখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, আমার বুক চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। তুমি যে বলেছিলে যে, ঐখানে—ঐ অপরপারের সুনীল রেখায় আমাদেরও ঘর ছিল। সে ঘর হয়তো আজো আছে, কিন্তু সে আজ পোড়োবাড়ি, আরো মনে পড়ল, ঐ গাঁয়েরই চিতার বুকে হয়তো এই কীর্তিনাশারই অপর কূলে, আমার হারা-বোন বেলির স্মৃতি ছাই হয়ে পড়ে আছে। ওরে কোথা সে সর্বগ্রাসী শ্মশান-মশান? কোথায় সে শতস্মৃতি বিজড়িত পোড়ো ঘরখানি? আমার সবচেয়ে বেশি করে কাঁদাতে লাগল আমার ঐ দুটি হারা-বোন লিলি আর বেলির পোড়া স্মৃতি! সবচেয়ে বেশি দুঃখ রয়ে গেল আমার, আমি তাদের দেখতে পাইনে! বেলা নাকি যাবার দিনে 'পদ্ম-পলাশ-আঁখি' দেখেছিল! এই কথা শুনে কমলা প্রমীলা হেসে উঠেছিল, তাই সে রেগে বলেছিল, 'তোরা কখনো তাঁকে দেখতে পাবিনে, তোরা মিথ্যা বলিস, যারা মিছে কথা কয়, তাদের তিনি দেখা দেন না!' ঐ সত্য আর তেজের মধ্য দিয়েই তার বহুযুগের সহজ সাধনা পূর্ণতা লাভ করে আসছিল, তাই যেদিন সে পদ্ম-পলাশ-আঁখির চাওয়া দেখলে, সেদিন সে মুক্ত। সে মুক্তকে কি আর আমরা বেঁধে রাখতে পারি? তাই সে বাঁধনহারা মেয়ে বাঁধন কেটে চলে গেল।

ওরই ঘণ্টাখানিক আগে আমার আর একবার বুক তোলপাড় করে উঠেছিল, যখন এপারে ফরিদপুরের পানে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, ঐ ছায়া-সুনিবিড় কোনো একটি গৃহের আঙিনার তুলসি-মঞ্চে আমার স্নেহময়ী তেজস্বিনী মাসি-মার সন্ধ্যা-প্রণামগুলি হারিয়ে গেছে! স্বাহা কন্যা আমার এই দীপ্তিমতী সন্ন্যাসিনী মাসি-মাকে মনে পড়ে আমার আকুল কান্না চেপে রাখতে পারিনি। আচ্ছা বলতে পার, এ তপস্বিনী মেয়ের হাতের নোওয়া, সিঁথির সিঁদুর কেড়ে বিধাতার কি মঙ্গল সাধিত হল? কে এর জবাব দেবে মা? এতেও কি বলতে হবে যে, মঙ্গলময় নামের কোনো একটি বিশেষ দেবতা আছেন—যাঁর সকল কাজেই কল্যাণ রয়েছে? এই বিধবা মেয়েদের দেখলে আমার বুকের ভেতর কেমন যেন তোলপাড় করে ওঠে। বাংলার বিধবার মতো বুঝি এত করুণ—এত হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর নেই। এই তপস্বিনীদের উদ্দেশ্যে আমি আমার হৃদয়-জোড়া শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম—আরো মনে পড়েছিল, আমার বিদ্রোহিনী মেয়ে ছোট মাসিমার কথা।

আমি ছায়া-সুনিবিড় ঐ এপার ওপারে গাছের সারির পানে সজল চোখে চেয়ে চেয়ে চিনবার চেষ্টা করতে লাগলাম, কোথায় আমার সেই মা-মাসিমার পরশ-পূত হারা-গৃহগুলি?

পদ্মার বুকেই ধোঁয়ার মতন ঝাপসা হয়ে মলিন সন্ধ্যা নেমে এল! সন্ধ্যা এল, ধূলি-ধূসরিত সদ্য-বিধবার মতন ধূমল কেশ এলিয়ে, দিগ্‌বালাদের মেঘলা অঞ্চলে সিঁথির সিঁদুরটুকুর শেষ রক্তরাগ মুছে! ধানের চারায় আর আমার চোখে অশ্রু-শীকর ঘনিয়ে এল!

চাঁদপুরে যখন রেলে চড়লাম, তখন সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে এসেছে। ট্রেন চলতে লাগল। আমি কেমন যেন উন্মনা হয়ে পড়লাম। অলস উদাস চোখে আমার শুধু এইটুকু ধরা

পড়ছিল যে, ভীষণ বেগে উল্টোদিকে ছুটে যাচ্ছে—আঁধার রাতের আঁধারতর গাছপালাগুলো। চলন্ত ট্রেনের ছায়াটা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন একটা বিরাট বিপুল কেন্নো ছুটে যাচ্ছে।

কুমিল্লায় যখন নামলাম, তখন বেশ রাত হয়েছে। কন্দর্পের মতো সুন্দর এক যুবক আমায় 'এসো' বলে হাত বাড়ালে—এই আর এক পদ্ম-পলাশ-আঁখি দেখে, আঁখি আমার জুড়িয়ে গেল! আমরা না চিনতেই পরস্পরকে ভালোবাসলাম। সে উল্টো আমাকেই পদ্ম-পলাশ-আঁখি বলে ডাকলে। আমার চোখে জল ঘনিয়ে এল।

দুটি ভাই-এ গলাগলি করে যখন আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম, তখনও সেখানে নিশি যেন নিশি-জেগে বসে আছে! প্রথমেই দু-তিনটি চঞ্চল দুষ্টু মেয়ে চোখে পড়ল। তারা সকৌতুক-বিস্ময়ে আমার পানে তাদের ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

তুমি এসে দাঁড়াতেই আমি কেমন অভিভূতের মতো তোমার পানে চেয়ে রইলাম। আমার এমন মুখর মুখও মূকের মতো কথা হারিয়ে ফেলল।

আমি তোমায় চিনলাম। কত দেশ-বিদেশেই তো ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু এমন ভরাট শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃরূপ তো আর আমার চোখে পড়েনি। সে রাজরাজেশ্বরী বিশ্বমাতার অন্নপূর্ণা-রূপে দু-চোখ আমার ডুবে গেল! তোমার বিহ্বল চোখের চাওয়াতেও জন্ম-জন্মান্তরের মাতৃত্বের অতৃপ্ত ক্ষুধিত চেনা চাওয়া দেখেই আমি চিনলাম, এ যে আমারই হারা-মায়ের দৃষ্টি! তুমি বলেছিলে নাকি, তোমার কোন-সে অতীতজন্মের হারা-মানিককে খুঁজে পেতেই এমন করে বারে বারে শত শত মা-হারা ছেলের মা হচ্ছ। এমন করে বিশ্বমায়ের ফাঁদ পেতেছ, সেই পলাতকা শিশুকে ধরবার জন্য। তাই তুমি ধর্ম-সমাজ কিছু মানোনি সকল পথে-পাওয়া ছেলেকেই সমানভাবে কোল দিয়েছ। আকাশে বাতাসে আমার মনের কথা ধ্বনিত হল, ওরে, এবার আমায় পথে বেরিয়ে পড়া সার্থক হয়েছে। এবার আমি বুঝি 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ'! কত কথাই না মনে হল তখন, সে যেন কেমন এক অভিভূতের ভাব। সেসব মনে পড়ে এত বিহ্বল হয়ে পড়ছি আমি যে, আজ তা জানাতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলছি। ... যাক, সে রাত্তিরে বড় শান্তির ঘুম ঘুমালাম—এই সুখে যে, আজ আমি ঘরের কোলে ঘুমাচ্ছি। ... তারপর, বুকে তীর বিঁধে আবার যখন আহত পাখিটির মতন রক্তবমন করতে করতে তোমার দ্বারে এসে লুটিয়ে পড়লাম, তখন তুমি আর মাসি-মা আমায় কী যত্নেই না বুকে করে এসে তুলে নিলে। তোমরা আর আমার ঐ শিশু-বোন কটিই আবার যমের দ্বার হতে আমায় ফিরিয়ে আনল। আজ ভাবছি কী ঘরের মায়ায় বনের হরিণকে মুগ্ধ করলে? আশীর্বাদ করো মা, তোমাদের এই দেওয়া প্রাণ যেন তোমাদেরই কাজে লাগিয়ে যেতে পারি।

[প্রথম প্রকাশ : 'অলকা'। প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, পৌষ ১৩২৯। পৃ. ৬০৮-৬১৪]

রাজপুত্রের সঙ

[কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বাল্য ও কৈশোরেই 'লেটো'র দলের গীতিকার ও গায়ক ছিলেন। নজরুলের জন্মভূমি বর্ধমানের চুরুলিয়া অঞ্চলে ছিল 'লেটো' গানের—অর্থাৎ কবি-গান জাতীয় এক ধরনের গানের ব্যাপক প্রচলন। কৈশোরেই তিনি জীবিকার প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের জন্য এই 'লেটো'র দলে যোগদান করেন, এবং সেই অল্প-বয়সেই রচনা করেন নানা ধরনের গান, গীতি–আলেখ্য, নাটিকা ইত্যাদি। 'লেটো'র দলে থাকাকালে রচিত নজরুলের কিছু কিছু রচনা ইতিমধ্যেই সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হলেও, এখনো অনেক রচনা রয়েছে আবিষ্কার ও উদ্ধারের অপেক্ষায়। বর্তমান রচনাটি উদ্ধার করেন পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমানের বিশিষ্ট নজরুল–গবেষক শেখ আজিবুল হক। তাঁর সৌজন্যেই রচনাটি 'নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।]

চল ওহ মন্ত্রী–সূত স্বরাজ্যে ফিরে
ঈশ্বরের অপার মহিমা দেখিলাম দেশ–দেশান্তরে॥
অসংখ্য গ্রাম–নগরাদি
দুর্গ–গুহ পর্বতাদি

কত নদ–নদী দেখিলাম নিরবধি—স্বদেশ জাগিছে অন্তরে॥

রাজকুমার॥ মন্ত্রী–নন্দন ! অনেক দিন হইল ! স্বরাজ্য ছাড়িয়া আসিয়াছি তজ্জন্য মন সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' তাহা তো তুমি জানো। অতএব চল শীঘ্র নিজ দেশে ফিরিয়া যাই।

মন্ত্রী॥ রাজকুমার। এ দাস তো সদা–সর্বদাই উপস্থিত। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য—।

রাজপুত্র॥ তবে শীঘ্র উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হও।

মন্ত্রী॥ কুমার ! অশ্ব এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি সমস্তই সজ্জিত হইয়াছে। আসুন, অশ্বারোহণ করুন।

রাজপুত্র॥ তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? শীঘ্র চল। মন্ত্রী॥ কুমার ! যাচ্ছি–যাচ্ছি–যাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে দুটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমি দুইটি ঘোরতর অপরাধ করিলেও তাহা মার্জনা করিবেন, তবেই যাই।

রাজপুত্র॥ মন্ত্রী–নন্দন ! আমার কথায় কোনোরূপ পার্থক্য হইবে না। নিশ্চয় তোমার কথামতো কার্য করিব।

[গীত]

শুন শুন মন্ত্রী-নন্দন
কথার পার্থক্য হবে না যদি মোর যায় জীবন॥
যদি সূর্য পশ্চিম দিকে
উদয় হয়ে থাকে
কিংবা অন্য দিকে
তবু মন্ত্রী মম বাক্যের মিথ্যা নাই তো কদাচন॥
যদি আঁধি ঘোরতর
মোর কাছে অপরাধ কর
কিংবা প্রাণ হয় কাতর
নির্ভয় অন্তরে কর কার্য সম্পাদন॥
নজরুল এসলাম কয়
তোমার প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়
হইবে হে লয়
এখন তোরে দেয় অভয় পরে বিষ বরিষণ॥

মন্ত্রী॥ তবে আপনি অগ্রসর হউন। আমি আপনার পশ্চাত পশ্চাত চলিলাম।

রাজপুত্র॥ (কিছুদূর গিয়া) মন্ত্রী! সম্মুখে যে এক ভীষণ নালা। পার হইব কেমনে?

মন্ত্রী॥ কুমার! সাবধান, সম্মুখের নালা ডিঙাইবেন না। (এই বলিয়া ঘোড়ার পাকাটিয়া দিল)

রাজপুত্র॥ কি মন্ত্রী! তুমি আমার তরবারির ভয় রাখ না? তোমার এত স্পর্ধা যে বিনা কারণে আমার অশ্বপদ কাটিয়া দিলে?

মন্ত্রী॥ (কতকদূর গিয়া) ঐ যে আপনার সিংহদ্বার। আপনি এইখানে অবস্থান করুন।

রাজপুত্র॥ যাও। শীঘ্র যাও। রাজবাটিতে গিয়া সংবাদ দাও।

মন্ত্রী॥ (কিছুক্ষণ পরে) কুমার আসুন। আপনার পিতা আপনার সম্মানের জন্য আসিতেছেন। আপনি আপনার পিতার সম্মানের জন্য পদব্রজে আসুন।

রাজপুত্র॥ আচ্ছা, চল মন্ত্রী। (চলিতে চলিতে) একি! আমার সিংহদ্বার কে ভাঙিল?

মন্ত্রী॥ আমিই ভাঙিয়াছি। আপনি যে দুইটি অপরাধ মার্জনা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল।

রাজপুত্র॥ কিন্তু মন্ত্রী! শীঘ্র ইহার কারণ বল, নতুবা তোমার প্রাণ সংশয়

[গীত]

প্রতিজ্ঞার কথা মন্ত্রী নাই স্মরণ আমার
শীঘ্র কারণ না বলিলে প্রাণ বাঁচা তোর হবে ভার॥

অমূল্য জীবন বাঁচাতে
যদি তবে ইচ্ছা থাকে
মোর নিকটেতে এর সত্য কারণ বলিতে হও তুমি আগুসার॥
অশ্বপদ কাট কি কারণ
সিংহদ্বারের দশা কেন করিলে এমন
শীঘ্র কও সত্য বিবরণ নইলে পাবে না যে নিস্তার॥
নজরুল এসলাম কয় কাতরে
এইবারে মন্ত্রী পড়েছে বিষম ফেরে
ঈশ্বর না করালে পার নাই তব উদ্ধার॥

রাজপুত্র॥ মন্ত্রী নন্দন ! চাতুরি ছাড়ো

মন্ত্রী॥ কুমার ! আপনার এই পদ্মপুষ্পের ন্যায় সৌম্য-মূর্তি বিচলিত হইল কেন ? (চিন্তিয়া) হায় ! তবে কি আমার আজন্ম পাষাণ হইয়া থাকিতে হইবে ? হায় ! আমি কি হতভাগ্য ! কুমার যদি একান্তই শুনিবেন তবে আসুন আপনাকে কানে কানে বলি।
(কানে কানে ফিস ফিস করিয়া কি বলিল) হায় ! একি, আমার অষ্টাঙ্গ কাঁপিতেছে কেন ? একি অষ্টাঙ্গ পাষাণ হইয়া গেল !

[গীত]

বলো ওস্তাদ ইহার কি উপায় হইবে ?
কিরূপে-জেত পাবে মুক্তি-কে ইহার প্রাণ বাঁচাবে॥ ?॥
কিসে মন্ত্রী পাবে প্রাণদান
বলো ওস্তাদ তাহার সন্ধান
কিংবা সে হায় পাষাণ
জন্ম-জন্মান্তরে রবে॥ ?॥
অশ্বপদ মন্ত্রী-নন্দন
কেন কেটেছিল তখন
সিংহাদ্বার কিসের কারণ
ভেঙেছিল বলে যাবে॥
কি কথা সে রাজনন্দনে
বলেছিল কানে কানে
বলে পাষাণ হল কেনে
এর সত্যতত্ত্ব বলিবে॥
নজরুল এসলাম ভেবে বলে
বলো ওস্তাদ সভাস্থলে
উত্তর দিতে না পারিলে
উপযুক্ত অপমান হবে॥

লক্ষ্যভ্রষ্ট

মানুষ যেদিন হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, সেইদিন হইতে পৃথিবীতে কলি—অর্থাৎ অশান্তি, অকল্যাণ, উৎপীড়ন, দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ—প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া আজ প্রবলতম আকার ধারণ করিয়াছে। আজ মানুষের দুঃখ চরমে উঠিয়াছে ; তাহাদের উপর যেন আল্লার অভিশাপ—তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রবৃত্তিপরায়ণ আসুরিক ইউরোপ তাহার চরম শাস্তি ভোগ করিয়াছে। আর কিছুদিন পরেই পৃথিবীর মানুষ দেখিতে পাইবে, এই পঙ্কিল-প্রবৃত্তিদুষ্ট মানবরূপী দানবেরা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—তাহাদের এত সাধের এত সাজানো স্বর্গ আল্লার অভিশাপে, ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার আর বেশি দেরি নাই। যে-অগ্নি আজ পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে জ্বলিয়া উঠিয়াছে মৃত্যুক্ষুধার মতো উন্মত্ত উল্লাসে, তাহা পৃথিবীর সকল দানব, অসুরকে সংহার না করিয়া নিভিবে না।

ইউরোপ তাহাদেরই সৃষ্ট নরকাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে ; আর ভারত পুড়িয়া মরিতেছে ক্ষুধাগ্নিতে, ভয়ে, উৎপীড়নে, আত্মগ্লানির অনুশোচনায়। পশ্চিমের অগ্ন্যুৎপাত আজিও ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে নাই, তাহারা উৎপীড়িত বলিয়া ; তাহারা আজিও ইউরোপের মতো আল্লা-বিদ্বেষী (এন্টি-গড) হইয়া যায় নাই বলিয়া। যে নামেই হোক, ভারতবাসী এখনো তাঁহাকে স্মরণ করে, তাঁহার এবাদত করে, তাঁহার নাম জপ করে। সেই একমেবদ্বিতীয়ম, নিত্য পরম পূর্ণ সনাতনকে ভুলিয়া তাঁহার অংশ সৃষ্টি করিয়া ভারত অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে—কিন্তু ইউরোপের মতো মার খাওয়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান আজ দৃষ্টি-বিভ্রান্ত, তাই অন্ধের মতো এক আল্লার সৃষ্টি হইয়াও পরস্পরে দ্বন্দ্ব-কলহ করিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। নিত্যপূর্ণ পরম অভেদ যিনি, তাঁহার সৃষ্টিতে ভেদ সৃষ্টি করিয়া ইহারা তাঁহার ক্রোধভাজন হইয়াছে। তাই ভারতে এত দারিদ্র্য, এত ব্যাধি, এত ক্লৈব্য, এত ভয়, এত বিদ্বেষ, এত হানাহানি, এত উৎপীড়ন। তাই এই পরাধীনতার অভিশাপ। যতদিন ভারত একমেবদ্বিতীয়মকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার শক্তি বা অংশের পূজা করিবে, ততদিন সে এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবে না। যিনি ব্যক্ত-অব্যক্ত সর্ব সৃষ্টি স্থিতি সংহারের, সর্বশক্তির একমাত্র পূর্ণ পরম অধীশ্বর—তাহাকে ছাড়া আর কোনো শক্তিকে, কোনো দেবতাকে বা আর কাহাকেও পূজা করার অজ্ঞানতামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, পৃথিবীর মানুষ লাঞ্ছনা, পীড়ন, শাস্তি মুক্ত হইবে না। ততদিন পৃথিবীতে শান্তি, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আসিবে না।

সকল দেশের, সকল জাতির, সকল মানুষের সেই একমেবদ্বিতীয়ম লা-শরিক আল্লাহ যদি একমাত্র লক্ষ্য হন, তাহা হইলে আর মানুষের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এই অভিশপ্তের জীবন বহন করিবে না। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন সেই পরম বিচারকের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আজ পৃথিবীতে ধর্ম-প্রচারকের নামে পাদ্রি পুরোহিত মৌলানার রূপ ধারণ করিয়া শয়তান বাহির হইয়াছে। ইহারা ধর্মে ধর্মে কেবল সংঘাত আনিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের চেয়েও অকল্যাণ করিতেছে আপন ধর্ম রক্ষার নামে যেসব নেতা দেশময় আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা শয়তানের গুপ্তচর, পশ্বাচারী, ভোগী, ঘোর স্বার্থপর একদল ধনিকের ঘুষ ও বেতন-ভোগী। যেসব ধর্মান্দোলনকারী ঘুষখোর নয়, অর্থলোভী নয়, তাহারা অজ্ঞানে অন্ধ, ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট। ইহারা সব ভীষণ বিষাক্ত জীব, ইহারাই দেশময় বিষ ছড়াইতেছে। মানবের কল্যাণের জন্য এইসব বীজাণুর সংহার করিতে হইবে, পৃথিবী হইতে এই বিষ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। এইসব বীজাণু বাঁচিয়া থাকিতে দেশ কখনো স্বাধীন হইবে না, কখনো শান্তি আসিবে না। এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ নেতাদের বাহন আজ দেশের যৌবনশক্তি। হায়রে তরুণ, জরা আর কতদিন তোমাদের স্কন্ধে চড়িয়া জাতির, দেশের, মানুষের, পৃথিবীর শত্রুতা সাধন করিবে? ইহাদিগকে, এই বার্ধক্যকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে একমাত্র যৌবনশক্তি। দেশের যুবকেরা যদি এইসব লোভী, ক্ষুদ্রআত্মা, প্রতারক, বিদ্বেষবিলাসী নেতাদের সংস্পর্শ ত্যাগ না করে, ইহাদের মুখোস খুলিয়া ইহাদের কুৎসিত রূপকে জনগণের সম্মুখে না দেখাইতে পারে, তাহা হইলে এদেশকেও অসুরের নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইবে। ইহারা নরকের দালাল, আল্লাহ ইহাদের দগ্ধ করুন, সংহার করুন। তাঁর সেই সংহারশক্তি দেশের এই তরুণেরা।

ইহাদের বিরুদ্ধে আজ দেশের যৌবনশক্তির প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। ইহা না করিলে দেশে শান্তিপ্রবাহ আসিবে না, যৌবন জাগিবে না, ক্লিবতা, কাপুরুষতা, মৃত্যুভয় দূর হইবে না। ইহাদের বড় বড় উপাধির ন্যাজ (টাই ও টেল) ও ধর্মনামের ব্যাজকে শ্রদ্ধা করিতে গিয়াই তরুণেরা পথভ্রষ্ট হইয়াছে। এই অভিশপ্তের সংস্পর্শে আসিয়াই তারুণ্য আজ চাকুরিভিক্ষু, প্রাণহীন, যৌবনেই জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইসব তথাকথিত নেতারা সংক্রামক বীজাণু। সর্বধর্মের সরল-বিশ্বাসী সর্বমানুষকে ইহাদের অশুচি সংস্পর্শ হইতে নিত্যমুক্ত রাখিতে হইবে।

রাজনৈতিক নেতারা—ডিকটেটরগণ ইউরোপে রাজসিক শক্তির অসুরকে জাগাইয়া আজ কি অকল্যাণ আনিয়াছেন পৃথিবীতে, তাহা আমরা প্রত্যহ শুনিতেছি।

আত্মপ্রতিষ্ঠালোভী ডিকটেটর বা কূট-রাজনীতিক কোনোকালে পৃথিবীতে কল্যাণ ও শান্তি আনে নাই। শান্তি, কল্যাণ আনিয়াছেন আল্লাহর প্রেরিত নবি, অবতার ও সংস্কারক। তাহাদের আদর্শকে, তাঁহাদের বাণীকে মানুষ যখনই অস্বীকার করিয়াছে, তখনই ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার ভীষণ মার অবতীর্ণ হইয়াছে। এ যুগের মহাযুদ্ধেই তাহার প্রমাণ। আবার নিরুদ্বেগ অকুতোভয় মৃত্যুহীন যৌবন সংঘবদ্ধ হউক। বৃদ্ধেরা—বুদ্ধি

যাহাদের অর্থসঞ্চয়ের অস্ত্রমাত্র, নেতৃত্ব যাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আত্মজ ধ্বনি শুনবার জন্য—তাহারা কোনোদিন যুদ্ধ করিবে না। যেসব তরুণ উৎপীড়িত জনগণের জন্য আত্মদান করিতে যাইবে, ইহারা তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে। আজও ইহারাই আমাদের মুক্তিপথের বাধা। অন্য বাধা মুক্ত হইবার পূর্বেই ইহাদের সরাইয়া ফেলিয়া আমাদের তীর্থপথকে কন্টকমুক্ত করিতে হইবে।

কোথায় দেশের অনাগত সেনাদল? জাগো! বহন করো না আর জরার স্বার্থের বোঝা। দিও না এই পঙ্গুদের অকারণে দেহের রক্ত। তোমরা এসো, সমবেত হও, হিন্দু-মুসলমানেরা দুই আকাশের তলে নয়, এক আকাশের তলে। তোমরা মৃত্যুভয়কে জয় কর। ক্ষুদ্র চাকুরে হইয়া বাঁচিবার ক্ষুদ্র তৃষ্ণাকে দূর কর।

সুন্দর পৃথিবী সুন্দর মানুষের বাসস্থান হোক। যাহাদের মনে ভয়, অস্ত্র তাহাদের বিড়ম্বনা। অস্ত্র আল্লা দিবেন। তাঁহার শক্তির পরমাস্ত্র। তাহার আগে তোমরা একতাবদ্ধ হও আত্মত্যাগের কুচ-কাওয়াজের ময়দানে। দেশে আবার নির্মল বায়ু বহুক, আকাশ আবার মালিন্যমুক্ত হোক, পাতালতলের দানব, অসুর আবার পাতাল-তলে প্রবেশ করুক।

ভাবিয়া রাখ বাংলার যুবকগণ, এই বাংলাতে দুই বৎসরের মধ্যে যে দুর্নিবার দুর্জয় শক্তি জাগিবে, তাহাতে পৃথিবী মুগ্ধ হইবে, মানুষ বিস্মিত হইবে! সেই অনাগত শুভ দিনের আশায় আল্লার শক্তিতে শক্তিমান হও তোমরা! দেশের, জাতির লজ্জা দূর করিয়া মহিমার উচ্চতম শিখরে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত কর।

সতী তুলসী

আমি নিজে বিশ্বাস করি, পুরাণের গল্পগুলির মধ্যে যেমন ঐতিহাসিক সত্য আছে, তেমনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বও নিহিত আছে। যে যুগে পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে যুগে হয়তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি স্তরের আচার্য বা ঋষিদের লেখার ভঙ্গিই ছিল ঐ প্রকার—যে ভঙ্গিকে আধুনিক শিক্ষিত মন গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে। স্বর্গ মর্ত পাতালকে সে জয় বা বশীভূত করিতে পারে। তামসিক বা রাজসিক অসুর অজ্ঞান-অহঙ্কারে অন্ধ বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে ভুলিয়া যায় বা অবহেলা করে। কিন্তু সাত্ত্বিক অসুরের জ্ঞান টনটনে থাকায় সে তাঁহাদের চিনিতে পারে। তাই শঙ্কর ও মহাকালি যখন যুদ্ধ করিতে আসিলেন শঙ্খচূড়ের সাথে, শঙ্খচূড় যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিল। তাঁহারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে শঙ্খচূড় শিবশক্তির স্তব করিতে লাগিল, আর অমনি শিবশক্তির নিক্ষিপ্ত অস্ত্র তাঁহাদের কাছে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। শঙ্খচূড়কে আহত বা হত করিতে পারিল না। এ সংসারেও আমরা দেখি, যাহারা সমস্ত আঘাত, মান-অপমান,

দুঃখ, শোক, ব্যাধির মূল কারণ ভগবানকেই মনে করে, তাহাকে কোনো দুঃখই স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু ভগবানের এত বড় ভক্ত তাঁহার এত কাছে আসিয়াও সাত্ত্বিক অহঙ্কারের বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে তাহা তিনি দেখিতে পারেন না, তাহাকে কোলে টানিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল হন ! তাই তাহার অহংকারের মূল কারণ তাহার তুলসি শক্তি ছিঁড়িয়া ধূলায় ফেলিয়া দেন, ইহাই মানুষের পরম পরিণতির বাধা ও তাহার সংহারের কথা পুরাণে সুরাসুরের গল্পরূপে লিখিত হইয়াছে। শঙ্খচূড় যে কোনো যুগে একবার আসিলেও তাহার নিত্য অসুরত্ব লইয়া সে যুগে যুগে আসে—প্রতি মানবের মনেও সে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার সংহারও হয়।

এই শঙ্খচূড় দৈত্য সাত্ত্বিক অহম। তামসিক দৈত্যের কুৎসিত রূপ সহজেই চোখে পড়ে। রাজসিক দানবের উগ্ররূপ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মনে ভীতি জাগায়। কিন্তু সাত্ত্বিক অহম্‌কে চেনা যায় না। সে তুলসিমালা গলায় দিয়ে চন্দন তিলক সুশোভিত হইয়া, বিষ্ণু কবচ ধারণ বা নারায়ণের নাম মুখে লইয়া মনে করে সে মুক্ত হইয়া গিয়াছে। সাত্ত্বিক শক্তিবলে এই অসুর ত্রিলোক জয় করে দেবতা, মানব, অসুর সকলকে অর্থাৎ পুরাণে তুলসির সতিত্ব নাশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভগবান সাত্ত্বিক অহমরূপী শঙ্খচূড়ের নারায়ণ নাম বা বিষ্ণু কবচ হরণ করিয়া লন। তাহাকে তখন শিব আসিয়া বধ করেন—এই শিব হইতেছেন বিশুদ্ধ জ্ঞান। অর্থাৎ শিব তাহার মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বা শিব-শক্তির উদয় হইতেই তাহার সাত্ত্বিক গুণের নাশ হইয়া সে অমৃত-লোকে বা গোলোকে চলিয়া যায় ! ইহাই হইল শঙ্খচূড় দৈত্যের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। এই দৈত্যকে যে-কোনো উচ্চ স্তরের সাধক চেনেন। তামসিক ও রাজসিক গুণকে জয় করার পর এই অসুর সাত্ত্বিক গুণের কোলে জন্মগ্রহণ করে। এই অসুর নিধন হইলে সাধকের মোক্ষ লাভ হয়।

[সতী তুলসী, N 27036 to 27041]

কোরান শরিফ সম্বন্ধে মন্তব্য

কোরান শরিফে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, যিনি বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য লাভ করেছেন কোরান পাঠ ক'রে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার তিনিই অধিকারী হয়েছেন। কোরান আরম্ভ হয়েছে 'সূরা বকরা' দিয়ে। এই বকরা পার্থিব ও অপার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতীক। কোরানে আল্লাহকে একমেবাদ্বিতীয়ম অভেদম, পরম পূর্ণম, পরম নিত্যম বলা হলেও তিনি নিত্য পরম প্রেমময়, পরম ক্ষমাসুন্দর, পরম করুণাময়—এই আশার কথাই বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। কোরানে সাধনার সহজতম পথের ইঙ্গিত—আছে—যে-পথে অতি সহজে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তার অপূর্ব সহজ উপায় ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ ও তত্ত্ব বর্ণিত আছে। তবে অতি উচ্চ স্তরের সাধক ব্যতীত সে-ইঙ্গিত ধরতে পারবে না। সকল ধর্মের লোক কোরানের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনে উপকৃত হবেন। বিশেষ ক'রে যাঁরা সাধক পথের পথিক—তাঁরা অনকে গুপ্ত পথের হদিস পাবেন এতে।

[সূত্র : বেতার জগৎ, ১. ২. ১৯৪১ সংখ্যা]

সোনালী স্বপন

নাজিরুল ইসলাম প্রণীত গল্পগ্রন্থ

নাজিরুল ইসলাম সাহিত্য আকাশে এসেছেন নব নক্ষত্রোদয়ের বিস্ময় নিয়ে। কাজেই তিনি নবাগত হলেও তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবার ঔদ্ধত্য আমার নেই। সাহিত্যাকাশের নীহারিকাপুঞ্জে যে অনাগত রবি-চন্দ্রের উদয়সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, নাজিরুল ইসলাম সেই নীহারিকা লোকচারী। তাঁর চোখে সেই অনাগত সৌরলোকের দীপ্তি, চন্দ্রলোকের স্বপন দেখেছি। এঁর লেখায় পাই সীমাহীন সমস্যা, অনন্ত প্রশ্ন আর সেই জিজ্ঞাসার পেছনে বিংশ শতাব্দীর মানুষের পীড়িত চিত্তের আকুল-আকুতি। এই যন্ত্র-নিষ্পেষিত মানবমনের সাথে চিরযৌবনা প্রকৃতির মিলনমন্ত্রের অস্ফুট বাণী এর কণ্ঠে যেন শুনতে পাই। এর পথ নূতন, এঁর ভাষা নূতন। এঁর চিন্তার ভঙ্গি নূতন। গল্প বলতে আমরা যা বুঝি, এঁর লেখায় ঠিক সে জিনিস নেই। এঁর লেখা অপরিণত যুবক-যুবতীর চিত্তবিনোদনের জন্য নয়, নিতল স্বব্ধ পরিণত ধ্যানী চিত্ত যাঁদের—এ শুধু তাঁদেরই আনন্দ দান করতে পারবে।

প্রতিভা লাইব্রেরী

'সুরশুনা প্রতিভা লাইব্রেরী' পরিদর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করে ধন্য হলাম। এ যেন শ্যাম তপোবনের তীর্থলোক। পল্লীর পাঠাগারে একসঙ্গে এত ইংরেজি ও বাংলা বইএর সমাবেশ খুব বিরল। এই জ্ঞান–দেউলের চেয়েও মহত্তর এর পূজারীরা। এঁদের সত্যিকার জ্ঞান অর্জনের তৃষ্ণা আছে, তপস্যা আছে। বিরাট–প্রাণ শ্রীযুক্ত সুরেশনাথ পাল মহাশয় তাঁর অঙ্গনে এই বাণীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করে শুধু পুণ্য সঞ্চয় নয় অপূর্ব কীর্তি স্থাপন করেছেন। বহু লোকের মনে জ্ঞানের চির–ভাস্বর আলো দানের ত্যাগ স্বীকার করে তিনি যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর নাম বাণীপূজারীদের কাছে শাশ্বত হয়ে থাকবে।

বাণীপূজার আয়োজন আড়ম্বরশূন্য, নীরবে সমবেত হন এঁর পূজারীরা ; অন্তরের ঐশ্বর্যই এঁদের প্রাণের সম্বল ; তবু মানুষকে মানুষরূপে পরিচিত করার সাধনা এঁদেরই।

প্রার্থনা করি এঁদের জ্ঞানের তৃষা, আলোর পিপাসা, এই নীরব তপস্যা পূর্ণতর হউক। এই জ্ঞানতীর্থে আরো শত শত তীর্থপথিক এসে ভিড় করুক। এই মন্দির আরো ... হউক।*

[১৪ই জৈষ্ঠ্য ১৩৪০]

ফজলুল হক ছাত্রাবাস
কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের আবেদন

'ফজলুল হক দরিদ্র ছাত্রাবাস' নামে একটি মুসলিম ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। রাহে লিল্লাহ এঁদের নামে যাঁরা খয়রাত করবেন, আল্লাহর রহম তার প্রতিদানস্বরূপে তাঁরা প্রাপ্ত হবেন। এই দরিদ্র কাঙালের রূপ ধরে যে নিত্য অমর রুহ—আত্মা আজ ধরণীর দুয়ারে হাত পেতেছে—তাঁকে যে আল্লাহর নামে ভিক্ষা না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়—আল্লাহ্ তাঁকে কঠোর শাস্তি দেন ইহলোকে এবং পরলোকে। ইহা কোরান মজিদের আল্লাহর বাণী। তিনি যে ধনীদের উদ্বৃত্ত অন্ন দিয়েছেন, ক্ষুধাতুরের সেই উদ্বৃত্ত অন্নে হিস্‌সা আছে। তাদের এই প্রাপ্য যে বঞ্চিত করে, সে ভোগী : দোজখের নার প্রজ্জ্বলিত তাহারই জন্য। এই দরিদ্র ছেলেরা ভিখারী নয়, ইহাদের হিস্‌সা ইহারা দাবি করে—আল্লাহর আদেশ এই দরিদ্রদের মধ্য দিয়া আল্লাহর আস্থা—রুহুল আজম—আজ হাত পেতে দাঁড়িয়েছে। আশা করি, মুসলমান যিনি, আল্লাহর বান্দা যিনি, তিনি এদের দান করে ধন্য হবেন।

ভূমিকা

শ্রীমান সতীশ মিত্রের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' পড়লাম। পড়ে শুধু মুগ্ধ নয়—বিস্মিত হলাম। যে স্তরে উঠলে ছান্দসিক কবি হয়ে ওঠেন, শ্রীমান সতীশ সেই স্তরে উঠে গেছে। ওর লেখা যখন প্রথম পড়ি, তখন সে রীতিমতো ছন্দের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। এত শীগগির যে সে কাব্যলক্ষ্মীর কমল-কাননের কাছাকাছি এসে পৌঁছুবে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। অনেক শক্তিশালী লেখককে দেখেছি—ছন্দের সিঁড়িতেই তাঁদের জীবন কেটে গেল, ছন্দলোক অতিক্রম করে কাব্যলোকে আর পৌঁছোতে পারেননি। সতীশ ভাগ্যবান, কাব্যলক্ষ্মীর আঁখির প্রসাদ সে পেয়েছে!

ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ নামে পরিচিত ফিট্‌জেরালডের কবিতার অনুবাদে বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে। বড় ছোট সকল কবি অ-কবি মিলে বেচারা খৈয়ামকে ছেঁকে ধরেছেন। খৈয়ামের ভাগ্য ভাল ফিট্‌জেরালড খৈয়ামকে অনুবাদ করেননি, তাঁর দর্শনকে কেন্দ্র করে স্বাধীনভাবে কবিতা লিখেছেন। ফিট্‌জেরালডের এই চাতুরী ধরা পড়ার পরেও সাহিত্যিকরা ওঁর ওপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠেননি—কারণ, ফিটজেরালড স্বাধীনভাবে লিখলেও চমৎকার কবিতা লিখেছেন। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের চেয়ে তা খারাপও নয়—পানসেও নয়।

আমি খৈয়ামের রুবাইয়াৎ ফারসি ভাষার মারফতে পড়েছি, আসল রুবাইয়াতে যা আছে তা ফিটজেরালডে নেই, ফিটজেরালডে যা আছে তা খৈয়ামে নেই। তবু দুঃখ হয় না তার জন্য। শিরাজি আর শ্যাম্পেনের স্বাদ বোধ হয় আলাদা, কিন্তু নেশা হয়তো প্রায় একরকমই হয়।

আমার মনে হয়, একমাত্র হুইনফিল্ডই (ভালো কবি না হলেও) সঠিক অনুবাদের দিক দিয়ে খৈয়ামের খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছেন। কোনো বড় কবি যদি হুইনফিল্ড-এর অনুবাদকে অবলম্বন করে রুবাইয়াৎ লেখেন, তাহলে সত্যিকার খৈয়ামকে অনেক বেশি জানতে পারব।

শ্রীমান সতীশও অন্যান্য কবিদের মতো ফিট্‌জেরাল্‌ড্‌কেই অনুবাদ করেছে। ফিটজেরালডকে ঠিক ঠিক অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ, বিশেষ করে ঐরকম চার পঙক্তির বন্ধনকে স্বীকার করে। আর যেসব কবি ফিটজেরালড অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হয়েছেন, শ্রীমান সতীশের অনুবাদ তাঁদের কারুর অনুবাদের চেয়ে খারাপ হয়নি, বরং কারুর কারুর চেয়ে সুন্দরতর হয়েছে—এ আমার ব্যক্তিগত ধারণা। কাব্য-লোকের নবীনতম আগন্তুক বলে উপেক্ষা না করে এ অনুবাদ পড়ে গেলে সকলেরই এই

ধারণা হবে বলে আমার বিশ্বাস। কোথাও কষ্টকল্পনা নাই, চমৎকার মিল, সুন্দর ভাষা, সমতল ছন্দ—সব মিলে সুন্দর কবিতা হয়ে উঠেছে। অনুবাদ বলে মনে হয় না।

খৈয়ামের দর্শন নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে ও হচ্ছে—কাজেই ও নিয়ে আর না-ই বললাম কিছু। এ অনুবাদ পড়ে আমি সত্যি সত্যি আনন্দিত হয়েছি। চমৎকৃত হয়েছি। এই ভালো লাগাকে আরো ভালো করে বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। আমার এ ভূমিকা না হলেও ওর চলত—কেননা কাব্য-সরস্বতীর আশীর্বাদ সে লাভ করেছে।

ভূমিকা

পরিচায়িকা

আমার বন্ধু খগেনবাবুর সঙ্গে বহুদিন আগে যেদিন আমার প্রথম আলাপ হয় রসগ্রাহী সুন্দরের রূপতৃষ্ণাতুর তরুণরূপে, সেদিন তাঁর হৃদয় বনভূমিতে দেখেছিলাম রসের তরঙ্গ—পুষ্পপল্লবের সমারোহ দেখিনি। তার পরেও বহু বৎসর ধরে আলাপ-পরিচয়ের মাঝেও জানতে পারিনি তাঁর সেই বিজন বনভূমিতে কুমারী বনলক্ষ্মীর মধুর আবির্ভাবের বার্তা।

সহসা আমার প্রিয় কবি-বন্ধু সুবোধ রায় দুটি অযত্নরক্ষিত খাতা নিয়ে দেখতে দিলেন। ভয় পেয়ে গেলাম! আবার বুঝি কোনো অনিদ্রাব্যাধিগ্রস্ত তরুণের উত্তপ্ত মস্তিষ্কপ্রসূত দুশ্চিন্তাপ্রবাহ গলাধঃকরণ করতে হবে। কিন্তু এক চুমুক পান করেই দেখলাম এ গরল নয়, বেদনার সমুদ্রমন্থন শেষের অমৃত; আমার মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। আমার বিদায়-চাওয়া যৌবন যেন মাঝপথ থেকে ফিরে এলো উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। রাত্রিদিন নানা সাময়িকী পত্রিকায় কবিতার যে আগাছা দেখেছিলাম, তার মাঝে বিচরণ করে ক্লান্ত হয়ে যেন সহসা নন্দনের মঞ্জু-বনশ্রীকে দেখতে পেলাম। নয়নমন সার্থক হয়ে গেল।

শাশ্বত হোক ২৪শে আশ্বিন! এই শতাব্দীর কোনো এক বৎসরে ঐ শুভদিনে ধরায় ধরা দিলেন আমার কবিবন্ধুর তপস্যা, বিগত জন্মের বিস্মৃতা বাণী। কবির চিত্তলোকে এল অত্যন্ত বসন্তের উৎসব। অসীম বেদনার দহন-সুখ। যত ফুল, তত কাঁটা—যত সঙ্গীত, তত ক্রন্দন।

বিরহের মহাসিন্ধুর তীরে প্রিয়াহারা একা কবি যে-গান গাইলেন তাতে সমুদ্রে উঠল কল্লোল, বাতাসে জাগল ঝঞ্ঝার হিল্লোল, জ্যোৎস্নার আঁচল ছড়িয়ে পূর্ণিমা-বিভাবরী উঠল কেঁদে। সে কী ভাষা, সে কী উপমা! সত্যকার ভালো না বাসলে, প্রেমের তপস্বী না হলে এ বাণী, এ ভাব-ব্যাকুলতা লেখনিমুখে আসে না। স্বতঃউৎসারিত ঝর্নাধারার মতো স্বচ্ছন্দ সতেজ এই গতি আসতে পারে না মহারানির কৃপা ছাড়া। যে দেবী কবির হৃদয়ে জ্বালিয়েছিলেন বিরহের দীপশিখা, তাঁকে নমস্কার। মিলনের উন্মুক্ত প্রান্তরে যেন সে দীপশিখা নিভে না যায়। মাঝে থাক বিরহের মহাপারাবার—অনন্ত রাত্রি, দুই কূলে কাঁদুক দুই চখাচখী—নইলে এই গান, এই মধুর ক্রন্দন শুনতে পাব না। কবি বাণীর জয়মাল্য গলায় নিয়ে এসেছেন, কাজেই কোনো কবিরই পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নাই। তাঁর এই কবিতাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বাংলার কাব্যগগনে এতদিনে এক নতুন জ্যোতিষ্কের উদয় হলো, এই জ্যোতিষ্ককে আমার সঙ্গে সকলেই সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করবেন, সন্দেহ নাই।

কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধকে লেখা

বাবা নিনামণি !

তোমারও চিঠি পেয়েছি—চমৎকার লেখা তোমার। তোমাকে এইবার সায়েব বাড়িতে চাকরি করে দেবো। তোমার ফুল পেয়েছি। চমৎকার ফুল—সুন্দর গন্ধ। ভগবানকে দিয়েছি তোমার ফুল। তিনি তোমার ফুল পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। তোমাকে চুমু দিয়েছেন তিনি। কালি ফুরিয়ে গেল। তাই পেন্সিলে লিখছি। তোমরা বীর ছেলে হয়ে উঠবে, দুষ্টুমি করো না, কেঁদো না, জল ঘেঁটো না। আমি রোজ তোমাদের দেখে আসি চুমু খাই—তোমরা যখন ঘুমোও। চণ্ডীর সঙ্গে খেলা করবে। এখন আমি কোলে নেব। আবার ফুল পাঠিয়ো—তোমাদের ভগবানকে দেবো। এতগুলো চুমু নাও। ইতি

তোমার বাবা

উপহার

প্রাণ-সুন্দর মরমী শিল্পী
শ্রী কিরণশঙ্কর রায়-এর
সুকরকমলে
পুলক-পূজাঞ্জলি

স্নেহ-অভিষিক্ত নজরুল

গ্রন্থ-পরিচয়

['নজরুল-রচনাবলী'-র বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও কতকগুলি রচনা সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো। 'পুনশ্চ' শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের (২০০৮) সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হয়েছে।]

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
নজরুলের 'নবীনচন্দ্র' শীর্ষক কবিতা প্রসঙ্গে

নজরুল যেমন তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা-গান ইত্যাদি লিখতে পারতেন, তেমনি অনেক রচনার পেছনে যথেষ্ট শ্রমও ব্যয় করতেন। কবির নিজের হাতের লেখা-পাণ্ডুলিপিতে বহু কবিতা-গানে পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংস্কার—এমনকি সম্পূর্ণরূপে বর্জনেরও পরিচয় আছে। অনেক রচনা তিনি পুনর্লিখনও করেছেন। পরিকল্পনা মাফিক এবং তথ্য ভিত্তিক কবিতা রচনার উদাহরণও আছে। নজরুলের 'নবীনচন্দ্র' শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতাটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চট্টগ্রামে হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন্নাহার (মাহমুদ)দের বাড়িতে অবস্থানকালে নজরুল মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন স্মরণেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এই কবিতাটি রচনা করেন। নজরুলের হাতের লেখা মূল পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, কবিতাটি রচনার আগে তিনি নবীন চন্দ্র সম্পর্কিত কিছু তথ্য (জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির তারিখ), কবির গ্রন্থাবলীর তালিকা ও প্রকাশ-কাল এবং উক্ত কবিতায় উল্লিখিতব্য মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাস, কবি কঙ্কন, জয়দেব, ভারতচন্দ্র অর্থাৎ নবীনচন্দ্রের পূর্বসূরি কবিদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেছেন—এবং সে-সবের ভিত্তিতেই রচনা করেছেন দীর্ঘ (মূল পাণ্ডুলিপিতে ৯৬ পংক্তি কথাটি ইংরেজিতে লেখা) কবিতা 'নবীনচন্দ্র'। কিন্তু নজরুল প্রায় প্রতিটি পংক্তি কেটে দিয়ে কবিতাটি পুনর্লিখন করেন। পুনর্লিখিত 'নবীনচন্দ্র' কবিতাটি কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'জয়তী' পত্রিকার ১৩৩৭ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

মন্তব্য

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে কবি নজরুল ইসলাম মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পাঁচথুপীতে গিয়েছিলেন। পাঁচথুপীর সুন্দরপুর গ্রামে ছিল নজরুলের বন্ধু,কলকাতা করপোরেশনের পদস্থ

কর্মচারী আবদুল হামিদের বাড়ি। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কবি। নজরুল ঐ অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন। পাঁচথুপীর 'বাণীমন্দির পাঠাগারে'র পরিদর্শক বই-এর পাতায় নজরুল লিখে দিয়েছিলেন এই কথাগুলি :

ময়ূরাক্ষীর কোলে এই 'বাণীমন্দির'। আমি এখানে এসে ধন্য হলাম। প্রাণের পরশমণি দিয়ে গাঁথা এই মন্দিরের বেদি। সকল জাতির সকল মানুষের শ্রদ্ধা দিয়ে রচিত এর দেবতা। এঁরা সৃষ্ট দেবতার পূজা করেননি, দেবতাকে সৃষ্টি করেছেন।—

অনেক গ্রামেই আমি গেছি, কিন্তু এমন জীবন্ত গ্রাম দেখিনি। —যৌবনকে এঁরা বয়সের ফ্রেম দিয়ে বেঁধে রাখেননি। যাঁর অন্তরের যৌবন আজো মরেনি এরূপ বহু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকেও এঁদের দলে দেখলাম।

সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেলাম এই দেখে যে, এখানে নাগরিক রাজনৈতিক হোলি খেলার ধুলোকাদা এখানে এসে পৌঁছায়নি সহজ আনন্দে সহজ জীবনের ধারাটিকে এঁরা অদ্ভুতরূপে আয়ত্ত করেছেন। মনে হয়, বাউলের একতারার ধ্বনি এঁরা শুনেছেন। এই সহজ হতে পারিনে বলেই আমাদের নাগরিক জীবন এত ধুলোকাদা জমে ওঠে, সেখানে ভোজপুরির প্রমত্ততা সকল আনন্দকে কুৎসিত করে তোলে। একই নদীর বিচিত্র তরঙ্গমালার মতো—এঁরা জাতিধর্মনির্বিশেষে একই গ্রামের বুকে খেলে বেড়াচ্ছেন পল্লিগ্রামেও এ দৃশ্য বিরল।

সহজিয়ার—বাউলের দেশ এ। এই সহজভাবে যদি এঁরা এমনি করে বেঁচে থাকেন—তাহলে তাই হবে অন্যকে বাঁচিয়ে রাখার আদর্শ মন্ত্র। 'সবার চেয়ে কঠিন সাধন সহজ যাহার সুর'—এই সাধনায় এঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন। আমিও তাঁদের আনন্দের অংশ নিয়ে গেলাম।

[৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩১]

[নজরুল রচনাবলী সপ্তম খণ্ডের ছবি-অংশ নজরুল হস্তলিপি দ্রষ্টব্য]

নজরুলের এই মানবিক আবেদনটি ইতিপূর্বে 'নজরুল-রচনাবলী'-তে ছিল না। নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণে সংযোজিত হলো।

নজরুলের একটি আবেদন প্রসঙ্গে

কাজী নজরুল ইসলাম দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার ১ম বর্ষ : ৩২ সংখ্যায় (৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪৮, ২৪ নভেম্বর ১৯৪১) সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলামে তাঁর স্বাক্ষরিত এক আবেদনের মাধ্যমে দরিদ্র ছাত্রদের কল্যাণার্থে 'ফজলুল দরিদ্র ছাত্রাবাস'কে আর্থিক সাহায্য প্রদানের আকুল ও হৃদয়স্পর্শী আহ্বান। উক্ত 'ফজলুল হক দরিদ্র ছাত্রাবাস'-টি কলকাতায় অবস্থিত কিনা, নাকি ঢাকায় অবস্থিত, সে-বিষয়ে কবির আবেদন কোনো উল্লেখ নেই। 'নবযুগ ও নজরুল জীবনের শেষ পর্যায়, শীর্ষক গ্রন্থের লেখক—বিশিষ্ট নজরুলগবেষক জনাব শেখ দরবার আলম,

এ-বিষয়ে কোনো আলোকপাত করেননি। তবে এই অনুরোধ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ফজলুল হক দরিদ্র ছাত্রাবাস'-এর ছাত্রদের কল্যাণেই নজরুল সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রবাস রয়েছে সেটির নাম 'ফজলুল হক মুসলিম হল' ১৯৪১ সালের ২০শে নভেম্বর এই হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বাংলার তৎকালীন গবর্নর। [দ্রষ্টব্য : দৈনিক নবযুগ, ১ম বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৯৪১]

উল্লেখযোগ্য যে, নজরুল ছিলেন ১৯২০ সালের মে মাসে প্রকাশিত এ.কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ'-এর যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে এ.কে. ফজলুল হকের উদ্যোগে দৈনিক 'নবযুগ' নব পর্যায়ে পুনঃপ্রকাশিত হলে নজরুল নিযুক্ত হন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। ১৯৪২ সালের ১০ই জুলাই কবি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।

নজরুলের হিন্দী গান প্রসঙ্গে
নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র বিষয়ে ও নানা সুরে এবং আঙ্গিক ও রূপরীতিতে অসংখ্য গানের রচয়িতা, সুরকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুল যে বহুসংখ্যক হিন্দি গান রচনা করেছেন, বহু গানে যে নিজে সুরারোপ করেছেন, এই তথ্য বহুলোকেরই জানা ছিল না। নজরুলের সুস্থাবস্থায় ১৯৩০-এর দশক থেকে তাঁর রচিত হিন্দি গান গ্রামোফোন রেকর্ডে, বেতারে, ছায়াছবিতে শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়েছে। তাঁর রচিত হিন্দি-রেকর্ড-নাটক 'জন্মাষ্টমী'ও সেকালে গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পীকণ্ঠে ধারণ করা হয়েছে। নজরুল শুধু নতুন হিন্দি গানই রচনা করেননি, তিনি তাঁর কিছু কিছু বিখ্যাত বাংলা গানেরও হিন্দি রূপান্তর করেছেন, ভাবানুসরণে নতুন গান রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দি গান রচনায় নজরুল যেমন দেবনাগরী বর্ণমালা বা অক্ষর (Script) ব্যবহার করেছেন, তেমনি আবার হিন্দি গান বাংলা বর্ণমালা তথা অক্ষরে (Script) লিখেছেন। নজরুলের হাতের লেখা হিন্দি গানের পাণ্ডুলিপিতে দুই রূপরীতিরই পরিচয় লক্ষণীয়।

পরিতাপের বিষয়, নজরুল বহু সংখ্যক হিন্দি গানের রচয়িতা এবং সুরকার হওয়া সত্ত্বেও, নজরুলের অসুস্থতার এবং বাকশক্তিহীন হয়ে যাওয়ার পর তাঁর হিন্দি গানের প্রচার একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দি গানের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়াও, কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকেও নজরুলের হিন্দি গান তেমন একটা প্রচারিত হয়নি, ছায়াছবিতেও খুব একটা নয়। ফলে নজরুলের রচিত হিন্দি গান ও রেকর্ড-নাটিকা ধামাচাপা পড়ে। হিন্দি গান রচনায়ও যে নজরুল অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এ তথ্য ও সত্য নজরুল-সঙ্গীতের অনুরাগীদের—এমনকি বিশেষজ্ঞদের কাছেও অনেকটা অজানা থেকে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, নজরুলের সুস্থাবস্থায় তো নয়ই, তাঁর অসুস্থতার পরও দীর্ঘকাল কবির রচিত হিন্দি গানের কোনো গ্রন্থ কিংবা 'সংগ্রহ' তাঁর কর্মস্থল ও সাহিত্য সাধনার কেন্দ্রভূমি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়নি, অন্য কোথাও থেকেও নয়।

বর্ণিত পরিস্থিতি-তে, নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আব্দুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশ (১৯৬৬, ৬৭, ৭০), বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হলে (১৯৭২) একাডেমী থেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড (১৯৭৭) এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্থ ও দ্বিতীয়ার্ধ (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। কবি আব্দুল কাদিরের মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও, 'নজরুল-রচনাবলী'তে নজরুলের রচিত হিন্দি গান উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সংকলিত করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ, নজরুলের হিন্দি গান সহজলভ্য ছিল না, এবং বৃহত্তর সংখ্যক গানই নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পীকণ্ঠে ধারণকৃত অবস্থায় চাপা পড়েছিল, গানের কোনো প্রচার ছিল না। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' থেকে আব্দুল আজীজ আল আমানের সম্পাদনায় 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থ এবং ১৯৮৯ সালে 'অপ্রকাশিত নজরুল' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে নজরুলের অনেক হিন্দি গানসহ বহুসংখ্যক বাংলা গান সংকলিত হয়। 'অপ্রকাশিত নজরুল' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয় কবির বহু সংখ্যক হস্তলিপি। গান ও কবিতার স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি। 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে নজরুলের যেসব গান ও কবির হাতের লেখা মুদ্রিত হয়, তাতে গানের যে বাণী স্থান পায়, তার সঙ্গে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত বাণীর বহু স্থানেই পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ, নজরুল গান-কবিতা ইত্যাদি রচনার পর পাণ্ডুলিপিতে বহু ক্ষেত্রেই বাণীর অনেক পরিবর্তন সংস্কার ও পরিমার্জন ঘটিয়েছেন। গ্রামোফোনে রেকর্ডে শিল্পীকণ্ঠে গীত হওয়ার আগেও প্রয়োজনে সংস্কার সাধন করেছেন। শুধু বাংলা গানেই নয়, হিন্দি গানেও অনেক পরিবর্তন, সংস্কার ও পরিমার্জন করেছেন। বাস্তব কারণেই, 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে সংকলিত সব গানের বাণীই সর্বোতোভাবে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়নি, 'অপ্রকাশিত নজরুল' গ্রন্থের অন্তর্গত নজরুলের হাতের লেখা গানের ও কবিতার পাণ্ডুলিপি সর্বশেষ বা চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি হিসাবে বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি। গানের ক্ষেত্রে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীকেই নির্ভরযোগ্য বলে ধরা হয়েছে।

'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণে (২০০৮) 'নজরুলের রচিত বহুসংখ্যক হিন্দি গান সংকলিত হয়েছে কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের তৃতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ (২০০৪) থেকে। এই সংস্করণের সম্পাদক প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক, নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রাহক ও সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (মূল সম্পাদক আবদুল আজীজ আল আমান)। হিন্দি গানসহ এই গ্রন্থের অন্তর্গত সব ধরনের 'নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহের উৎস সম্পর্কে' গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকায় ২৪-০৮-২০০২ তারিখে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর লিখেছেন : (১) গানের

বাণী : যতদূর সম্ভব বর্তমান সংস্করণে আমি আদি রেকর্ডের বাণীকে অনুসরণ করেছি। গীতিগ্রন্থের বাণী গ্রহণ করিনি। বাংলাদেশের নজরুল ইন্সটিটিউট এই নীতি গ্রহণ করেছেন। (২) এইচ. এম. ভি. কোম্পানিতে রক্ষিত চুক্তিপত্র, র‍্যায়লিটি রেজিস্ট্রার, মেট্রিক রেজিস্টার, বুলেটিন, মাদার সেল ইত্যাদি নিরীক্ষণ করেছি। (৩) আমার কাছে ১৫০৩টি আদি রেকর্ডকৃত গানের বাণী ও সুর টেপে রক্ষিত আছে।'

উল্লেখ্য, ডক্টর ব্রহ্মমোহন ঠাকুর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এসব টেপের বহু সংখ্যক গান ঢাকার নজরুল ইন্সটিটিউটকে প্রদান করে গেছেন। শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ থেকে ৭৩টি হিন্দি গান 'নজরুল-রচনাবলী'র বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৬টি হিন্দি গান সংকলিত হয়েছে প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত গবেষক, সংগ্রাহক ও সঙ্গীতজ্ঞ জনাব আসাদুল হকের 'নজরুলের হিন্দি গান' গ্রন্থ থেকে। উক্ত গ্রন্থে হিন্দি গানের সংখ্যা ৭২টি।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

[চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত]

নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' প্রসঙ্গে

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র ২য় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) নজরুলের অনুবাদ-গ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থে পারশ্যের বিশ্বখ্যাত মরমী কবি হাফিজের মরমী ভাষায় রচিত ৭৩টি রুবাইয়ের কাব্যানুবাদ ছাড়াও রয়েছে নজরুল-রচিত 'মুখবন্ধ' , উৎসর্গ-পত্র এবং বুলবুল-ই-শিরাজ মরমী কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী'। 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর প্রথম সংস্করণ-সম্পর্কিত তথ্যাদি ছাড়াও, কবি হাফিজ এবং তাঁর 'রুবাইয়াৎ'-এর অনুবাদ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।

'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' (১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০) কর্তৃক প্রকাশিত 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে (প্রকাশকাল : জুন, ২০০১) নজরুল-অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থের অন্তর্গত ৭৩টি রুবাই-ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ২য় খণ্ডের (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) অন্তর্গত ৭৩টি রুবাই আর 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র ২য় খণ্ডে (জুন, ২০০১) অন্তর্গত ৭৩টি রুবাইয়ের মধ্যে বাণীর দিক থেকে কোনোরূপ পার্থক্য নেই। কিন্তু পার্থক্য রয়েছে পংক্তি ও স্তবক-বিন্যাসে। ছান্দসিক-কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী' অন্তর্গত প্রতিটি রুবাইয়ের পংক্তি ও স্তবক-বিন্যাস নিম্নরূপ :

'তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক—হারা।

তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলেনা সে-পথ ছাড়া।
হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কিগো ঘুম,
দগ্ধ হল নয়ন-তারা।'

'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' প্রকাশিত (জুন, ২০০৪) 'রচনা-সমগ্র : কাজী নজরুল ইসলাম' শীর্ষক রচনাবলীর ২য় খণ্ডে উপরোক্ত রুবাইটির পংক্তি ও স্তবক-বিন্যাস নিম্নরূপ :

'তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়, দৃষ্টি আমার পলক-হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ, পা চলেনা সে-পথ ছাড়া।
হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কি ঘুম দগ্ধ হল নয়ন-তারা॥'

উপরোক্তরূপে চরণগুলো বিন্যাস সম্পর্কে 'গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে "নজরুল রচনাসমগ্রে স্থান-সংকুলানের স্বার্থে চরণগুলি হয়েছে অধিকাংশ স্থলে চতুষ্পঠিক।" উক্ত 'নজরুল রচনা সমগ্রে'র (২য় খণ্ড) গ্রন্থ-পরিচয়ে' আরও বলা হয়েছে, "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ-এর প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ পরিপাট্য ছিল প্রশংসনীয়। পদগুলিও বর্ধিত স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল।" উক্ত গ্রন্থ থেকে উদাহরণ হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে নিম্নোক্ত রুবাইটি :

'দয়িত মোর ! অল্পে এত
ছাড়ব্ তোমায় কেমন করি',
মরকত্-নীল ও কেশ-ফাঁসে
যতক্ষণ না প্রাণ বিসরি'।
লোহিত চুণীর ঠোঁট গো তোমার
মোর জীবনী-শক্তি সে যে,
লক্ষ প্রবাল বিনিময়েও
পারব না তা দিতে, গোরি !

[১ম সংস্করণের একটি পৃষ্ঠা]

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ২য় খণ্ডে (নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩) 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থে প্রতিটি রুবাইয়ে উপরোক্তরূপ পংক্তি ও স্তবক-বিন্যাস বজায় রাখা হয়েছে, 'স্থান-সংকুলানের স্বার্থে পংক্তি ও স্তবক-বিন্যাস ভিন্নরূপ করা হয়নি। যেহেতু ১৩৩৭/১৯৩১) সালে নজরুলের সুস্থাবস্থায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, সে কারণে মূল অনুসরণই যথার্থ।

নজরুলের অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এর শেষে লেখা আছে : বিনয়াবনত নজরুল ইসলাম, কলিকাতা, ১লা আষাঢ়, ১৩৩৭।

জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।

১৯০৮ পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯০৯ গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের সেবক, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।

১৯১১ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১২ স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্‌শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।

১৯১৪ কাজী রফিজউল্লাহ্‌র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১৫-১৭ রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।

১৯১৭-১৯ সৈনিক জীবন, প্রধানত করাচিতে গন্‌জা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নতি, সাহিত্য-চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফ্‌তরে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন : মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা যাত্রা, কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের অনুষ্ঠানে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা প্রত্যাবর্তন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ পুনরায় কুমিল্লায় আগমন, চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ, অক্টোবর মাসে 'অগ্নি-বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, 'শনিবারের চিঠি'তে নজরুল-বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, 'মজুর স্বরাজ পার্টি' গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'-এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল-পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত,

'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্লাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ, 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইব্‌রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা ['চল্ চল্ চল্'] ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহী সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯ ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০ 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ, কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে ও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার দরুণ কারাবাস থেকে রেহাই। কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশগ্রহণ। গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৩২ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৪ 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত।

ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চ, বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক—	সজনীকান্ত দাস
	জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—	এ. এফ. রহমান
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
	তুষারকান্তি ঘোষ
	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
	সৈয়দ বদরুদ্দোজা
	গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নী প্রমীলাকে চিকিৎসার জন্য লণ্ডন প্রেরণ করা হয়। 'জল আজাদ' নামক জাহাজে লণ্ডন যাত্রার আগে কবি ও কবি-পত্নী বোম্বাইয়ের (বর্তমানে মুম্বাই) মেরিন ড্রাইভের 'সী গ্রীন হোটেল'-এ

অবস্থান করেন। ঐ হোটেলের সভাকক্ষে নজরুলের সম্মানে এক বিরাট সংবর্ধনা–সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন উপমহাদেশের বহু খ্যাতনামা চলচ্চিত্র–শিল্পী, কবি–সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। অশোককুমার, প্রদীপকুমার, কে. এস. ইউসুফ, কামাল আমরোহী, কে. এ. আব্বাস, মুকেশ, নৌশাদ আলী ছাড়াও, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোশ মালিহাবাদী, কাইফি আজমী, খৈয়াম, সাহীর লুধিয়ানভী, মাজাজ লাখনভী, কাতিল সিপাহী, ফিরাক গোরকপুরী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ। নজরুল–বন্দনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কাইফী আজমী ও শাতীর লুধিয়ানভী। নজরুলের 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি পরিবেশন করেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে কবির চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ হাজার টাকা তুলে একটি থলিতে কবির হাতে প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা–অনুষ্ঠান নজরুল–জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। [তথ্যসূত্র : 'নজরুল স্মৃতি', ডঃ অশোক বাগচী, নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, জুন, ১৯৯৫]। লন্ডনে মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক্ ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ্ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল–পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৭৪ এবং ১৯৩১ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল–রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশ।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র–ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল–জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে

উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাক্‌শান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত এবং কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভিত কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮-২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান	গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।
অগ্নি-বীণা	কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
যুগ-বাণী	প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
রাজবন্দীর জবানবন্দী	ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
দোলন-চাঁপা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।
বিষের বাঁশী	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।
ভাঙার গান	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।
রিক্তের বেদন	গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।
চিত্তনামা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।
ছায়ানট	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ করকমলে'।
সাম্যবাদী	কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।
পূবের হাওয়া	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।

ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণার-বিন্দে'।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ--'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ—'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ—'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'
ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০

	কবির জামিন লাভ, আপিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি, কিন্তু 'প্রলয়-শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
কুহেলিকা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
নজরুল-স্বরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, আগস্ট ১৯৩১।
চন্দ্রবিন্দু	গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।
শিউলিমালা	গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।
আলেয়া	গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট-নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।
সুরসাকী	গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।
বন-গীতি	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।
জুলফিকার	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।
পুতুলের বিয়ে	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
গুল-বাগিচা	গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ—'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'
কাব্য-আমপারা	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে-নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।
গীতি-শতদল	গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।
সুরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।
সুরমুকুর	স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।
গানের মালা	গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।

মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
সন্ধ্যামালতী	গান। মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৭৭, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
নজরুলের 'ধূমকেতু'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
নজরুলের 'লাঙল'	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। জানুয়ারি ২০০৪। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
নজরুল সঙ্গীত সমগ্র	সম্পাদনা : রশিদুন্‌নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, কার্তিক ১৪১৩/অক্টোবর ২০০৬।

নজরুলের হিন্দি গানের বাণীর পাঠান্তরের কারণ

বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য গানের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম বহু সংখ্যক হিন্দি গান রচনা করেছেন। বাংলা ভাষা ও অন্যান্য ভাষায় রচিত অনেক গানের মতোই হিন্দি ভাষায় (হিন্দি বর্ণমালায় ও বাংলা বর্ণমালায়—উভয় রীতিতে রচিত) গানেও তিনি অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংস্কার করেছেন। কবির বহু গানের একাধিক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। নজরুলের গান রচনা এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীতজগতের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সহচর জগৎ ঘটক জানিয়েছেন—'লিখেছেন তিনি অনেক—তাঁর ছিল অনেক খাতা, সব বাঁধানো খাতা। একখানা লিখে শেষ করতেন আর তার থেকে পরিষ্কার করে লিখতেন আরেক প্রস্থ বাঁধানো খাতায়। তার সাথে ছিল একটা চামড়ার ব্যাগ—যেখানে যেতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন। থাকতো তার মধ্যে Draft খাতা। যখন যেখানে বসে লিখতেন বার করতেন সেই খাতা। বাড়ি এসে প্রয়োজনমত লিখে রাখতেন Fair খাতায় ... সীতানাথ রোড, হরি ঘোষ স্ট্রিট, এবং পরে শ্যামবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত খাতাগুলো এসেছিল জানি—এর কারণ সব খাতারই হিসাব ছিল আমার কাছে। মনে হয়, শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ অসুস্থ অবস্থায় পাইকপাড়ার বাড়িতে স্থানান্তরিত হবার সময় সব গোলমাল হয়ে গেছে। এই সময়েই কবির লেখার ভাণ্ডার তছনছ হয়ে যায়।' ('কাফেলা', কলকাতা, নজরুল-সংখ্যা, ১৩৭৯) নজরুলের লেখার গানের Fair খাতা যারা পাননি তারাই Draft বা খসড়া খাতা পেয়ে 'আসল' পেয়েছি বলে বিভ্রাট বাধিয়েছেন।

নজরুলের গান ও কবিতার যে নানা পাঠান্তর—এটাই এর মূল কারণ।

হিন্দি গানের বাণীর পাঠান্তর

১	২	৩	৪
গানের প্রথম পংক্তি	'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে	'নজরুলের হিন্দি গান' গ্রন্থে	মন্তব্য
১. অভি নিশি রহি না যাও ন জাও	অভি নিশি রহি নজাও ন যাও গানটিতে একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'দূর নৌবৎসে বাজনে দো বাঁশরী'	'অভিনিশি রহি নাজাও না যাও' গানটিতে একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'দূর সৌবৎসে বাজ্‌লে দো বাঁশরী'	

২.	আ' মেরে সঙ্গ আ, মঙ্গল গা হিল্‌মিলকে	'আ' মেরে সঙ্গ আ, মঙ্গল গা হিল্‌মিল্‌কে' গানটিতে একটি পংক্তি : 'তু মুঝকো ধূল সমঝকে' আরেকটি পংক্তি : 'তু হামকো খাক্ ছানায়া (আউর) ব্যাকুল আপনা বনায়া' আরেকটি পংক্তি : 'খোঁ জাঁয়ে যুঁহি মিট্টি, মে হাম মিলকে' এয় বনমালি'॥	'আ' মেরে সঙ্গ আ, মঙ্গল গা হিল্‌মিল্‌কে' গানটিতে একটি পংক্তি : 'তু মুঝকো ধূল সামঝকে' আরেকটি পংক্তি : তু', হামকো খাক ছানায়া আউর, ব্যাকুল আপনা বানায়া, আরেকটি পংক্তি : 'খো জাঁয়ে যুঁ হি মিট্টি মে হাম মিলকে এয় বনমালি॥
৩.	আও জীবন মরণ	'আও জীবন মরণ' গানটিতে দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) 'পাত্তে মে টুঁঢাতা তোড়ী পাপী' (২) 'শ্যামা হোকে জ্বালা ম্যয় তোহারি আঁখমে'	'আও জীবন মরণ' গানটিতে দু'টি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) 'পামেমে টুঁঢা তা তোড়ী পাপী (২) শ্যামা হোকে জ্বালা ম্যয় তোমারি আঁখমে'
৪.	আকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরু শ্যাম	'আকুল ব্যাকুল ঢুড়ত ফিরু শ্যাম' গানটিতে তিনটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) আকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরুঁ শ্যাম তুম বিনা রহনা যায় (২) আওয়ো মিলো কৃপা কর স্বামী (৩) নিঁদ নাহি রয়না দিন নাহি চায় না	'য়্যাকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরু শ্যাম' গানটিতে তিনটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) য়্যাকুল ব্যাকুল ঢুড়ত ফিঁরু শ্যাম তুম বিনা রহন না জায় (২) আয়ে মিলো কিরপা কর স্বামী (৩) নিঁদ নহি রৈনা দিন নাহি চয়না

১	২	৩
৫. কিস গাবরুকো সাঁইয়া বানাউঙ্গি	'কিস গাবরুকো সাঁইয়া বানাউঙ্গি' গানটিতে একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'উভরে যৌবন সে ভয়ে মস্তানী।'	'কিস গাবরুকো সাঁইয়া বানাউঙ্গি' গানটিতে একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'উভয়ে যৌবন সে ভয়ি মস্তানী।'
৬. খেলত বায়ু ফুল বন মে	'খেলত বায়ু ফুলবন মে' গানটির একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'মন বন মে প্রেম মিলি গাওত হায় ফুলকলি'	'খেলত বায়ু ফুলবন মে' গানটির একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'মন বন সে প্রেম মিলি খেলত হ্যয় ফুলকলি'
৭. গাও স্যব ভারতকা প্যারা	'গাও স্যব ভারতকা প্যারা' গানটিতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) হিন্দু স্থান কো তিলক থা বো (২) ভুলো ভেদ অ্যর গ্যল ল্যগ যাও গাও প্রেম নদী কিনারা ঝাণ্ডা উচাঁ র‍্যহে হামারা'	'গাও স্যব ভারতকা প্যারা' গানটিতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) হিন্দুস্থান কা তিলক থা যো (২) ভুলভেদ আব গ্যলে লাগি যাও গাও প্রেম নদী কিনারা।
৮. গুলশন কো চুমচুম কহতী বুলবুল	'গুলশন কো চুমচুম কহতী বুলবুল' গানটির কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) রুখসারা সে বে-দরদী বোরখা খুল খুল (২) হাঁস্তি হ্যয় বোস্তাঁ মস্ত হো যা দোস্তা শিরী শিরাজী সে হো যা বেহোঁশ জাঁ,	'গুলশন কো চুমচুম কহ্তে বুলবুল' গানটির কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) রুখসারা সে বে-দরদী বোরকা খুল (২) হাঁস্তি হেয় বোস্তাঁ মস্ত, হো যা দোস্তাঁ শিরী শিরাজী সে যা বেহোশ জাঁ।

১	২	৩	৪
৯. ঘন–শ্যামকে উদাসী হুঁ ম্যয় এ ভব সংসার মে	'ঘন–শ্যামকে উদাসী হু ম্যয় এ ভব সংসার মে' গানটির কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) এ ভব সংসারমে (২) রস যমুনা কি কিনার মে (৩) পঞ্ছিকি ঝনকার মে	'ঘন–শ্যামকে উদাসী হু ম্যয় এ ভব সংসার মে' গানটির কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) সো ভ্যর স্যানসারমে (২) যমুনা কি কিনার মে (৩) প্যানিছিকে ঝ্যানকারমে	
১০. চ্যল চ্যল চ্যল নওজওয়ান চল্	'চ্যল চ্যল চ্যল নওজওয়ান চল্' গানের একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'আদমিয়াত কি ফৌজ তুম দরয়্যা কি হো মৌজ তুম' নজরুলের হস্তলিপিতে শেষের পংক্তিটি আছে।	'চল্ চল্ চল্ নওজওয়ান চল্' গানের একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'আদমিয়াত কি ফৌজ তুম' নিম্নোক্ত পংক্তিটি নেই' 'দরয়্যা কি হো মৌজতুম' নজরুলের হস্তলিপিতে পংক্তিটি আছে।	
১১. চ্যল চ্যল চ্যল ন্যওয্যওয়ান চ্যল্	'চ্যল চ্যল চ্যল ন্যওয্যওয়ান চ্যল্' এই গানটি 'নজরুল–গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র গান।	'চ্যল চ্যল চ্যল ন্যওয্যওয়ান চ্যল' এই গানটি 'নজরুলের হিন্দি গান' গ্রন্থে একটি অভিন্ন গান হিসাবে মুদ্রিত। (দ্রষ্টব্য : পৃ. ১৯–২০) তবে সূচিপত্রে শিরোনাম স্বতন্ত্র।	'চ্যল চ্যল চ্যল ন্যওয্যওয়ান চল' শীর্ষক গান দুটি যে স্বতন্ত্র তা গানের বাণী মিলালেই স্পষ্ট হয়। যদিও দুটি গানেরই প্রথম পংক্তি অভিন্ন।

	গানটির কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) আয় মেয় সদকে জাঁউ (২) ভালা নজরকা প্যারে দেওরভায় (৩) যৌবন পে আয় হেয় বাহার (৪) সাজিয়া পে আজো–মেরে প্যারে দেওয়রভায়	তরহাদারার' গানটির কয়েকটি পংক্তি' (১) আয় মেয় সদ্‌কে যাঁউ (২) ভালা নরজকা প্যারে দেওরওয়া (৩) যৌবন পে আয়ি হেয় বাহার (৪) সাজিয়া পে আজো মেরে প্যারে দেওরওয়া
১৩. ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা	'ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা' গানটির একটি পংক্তি : 'সব দেবদেবী বন্দনা গীত গায়'	'ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা' গানটির একটি পংক্তি : 'সব দেবদেবী চন্দনা গীত গায়।'
১৪. ঝুলন–ঝুলায়ে ঝাউ ঝক ঝোরে	'ঝুলন ঝুলায়ে বাউ ঝক্ ঝোরে' গানের একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'হায়রে ধান কি লও মে হো বালি'	'ঝুলন ঝুলায় ঝাউ ঝক্ ঝোরে' গানের একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'হাররে ধান কি লও মে হো বালি'
১৫. তুম প্রেমকে হো ঘনশ্যাম মেয় প্রেম কি শ্যাম প্যারী	'তুম প্রেমকে হো ঘনশ্যাম মেয় প্রেম কি শ্যাম প্যারী' গানটির তিনটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) তুম প্রেমকে হো ঘনশ্যাম মেয় প্রেম কি শ্যাম প্যারী, (২) তুমহরে সুন্দর মন্দির মোহন মোহত মেরে মনমে।'	'তুম প্রেমকে ঘনশ্যাম মেয় প্রেম কি শ্যামপ্যারী' গানটির তিনটি পংক্তি নিম্নরূপ : (১) তুম প্রেমকে ঘনশ্যাম মেয় প্রেম কি শ্যাম প্যারী। (২) তুমহরে মোহন্–মন্দির পিয়া মোহত মেরে মনমে

১৬. নার্গিস বাগমে মে বাহার কি আগমে	'নার্গিস বাগমে বাহার কি আগমে' 'নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'পূবের হাওয়া'য় গানের পংক্তি সংখ্যা : ১৬ (দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-রচনাবলী' জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৮)। আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে গীত গানের পংক্তি সংখ্যা : ৮। মেগাফোন রেকর্ড : শিল্পী : মিস প্রভা (কমলা ঝরিয়া) রেকর্ড নং জে. এন. জি. ৫৯১। তথ্য : নজরুল সঙ্গীতকোষ, কলকাতা পৃষ্ঠা : ১২৯ 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে রেকর্ডের : ৮টি পংক্তিই মুদ্রিত।	'নার্গিস বাগমে বাহার কি আগমে' 'নজরুলের হিন্দি গান' গ্রন্থে গানের পংক্তি সংখ্যা ১৬টি। নজরুলের 'পূবের হাওয়া' গ্রন্থ থেকে পুরো গানটিই মুদ্রিত হয়েছে। এতে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে শিল্পী কণ্ঠে গীত ৮টি পংক্তি আলাদা ভাবে মুদ্রিত হয়নি। তবে মেগাফোন গ্রামোফোন কোম্পানীর নাম, রেকর্ড নম্বর জে. এন. জি ৫৯১, শিল্পীর নাম, মিস প্রভা (কমলা ঝরিয়া) নজরুল সঙ্গীত কোষের নাম ও অন্যান্য তথ্যাদি উল্লেখিত হয়েছে।
১৮. প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে প্রেমনগরকা ঠিকানা	'প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে প্রেম নগরকা ঠিকানা' গানটির একটি পংক্তি নিম্নরূপ, 'দুখকো তু প্রেম্‌সে গলে লাগালে— জাগেনা পছতানা॥	'প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে প্রেম নগরকা ঠিকানা।' গানটির একটি পংক্তি নিম্নরূপ : 'দুখ কো তু গলে লাগালে—আগে না পছতানা,

হিন্দি গানের পাঠান্তর প্রসঙ্গে

আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি ইত্যাদি ভাষায় অভিজ্ঞ এবং জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী নজরুল যে হিন্দি ভাষায় বিচিত্র বিষয়ে ও নানা সুরে এবং রাগ-রাগিণীতে বহু গান লিখেছেন—এই তথ্য ও সত্য এতকাল সুবিদিত ছিল না। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত বহু হিন্দি গান যে গ্রামোফোন রেকর্ডে, বেতারে, ছায়াছবিতে অনেক খ্যাতনামা শিল্পীকণ্ঠে ১৯৩০-এর দশক থেকেই গীত হয়েছে, জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এই তথ্য ও সত্য একালে প্রায় বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেছে। নজরুল হিন্দি গান লিখেছেন হিন্দি বর্ণমালায় (Script-এ), এবং বাংলা বর্ণমালায় (Script-এ)—এই উভয় পদ্ধতিতেই। কবির অনেক গানের হস্তলিপি যেমন বাংলায় অথচ হিন্দি ভাষায়, তেমনি অনেক গানের হস্তলিপি হিন্দি বর্ণমালায়।

১৯৭৮ সালে কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত ও আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) সংকলনে কবির রচিত অনেক হিন্দি গান সংকলিত হয়, তাঁর হস্তলিপিও স্থান পায়। ১৯৮৯ সালে আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত ও 'হরফ প্রকাশনী' প্রকাশিত 'অপ্রকাশিত নজরুল' শীর্ষক গ্রন্থেও নজরুলের লেখা হিন্দি গানের কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (বাংলা ও হিন্দি—উভয় বর্ণমালায় লিখিত) উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় স্থান পায়। আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত নজরুল' (প্রথম খণ্ড) ও ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত নজরুল' (দ্বিতীয় খণ্ড) কলকাতার 'হরফ প্রকাশনী' থেকে প্রকাশের ফলে সুবিধা হয়েছে এই যে, নজরুল যে বহুসংখ্যক হিন্দি গানের রচয়িতা ও সুরকার, কবির বহু হিন্দি গান যে ত্রিশের দশকেই শিল্পীকণ্ঠে গীত হয়ে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে বন্দী হয়ে আছে—এই বেদনাদায়ক তথ্য জানা গেছে। অন্যপক্ষে, 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) এবং 'অপ্রকাশিত নজরুল' প্রকাশিত হবার ফলে অনেক নজরুল-সঙ্গীত-গবেষক এবং সংগ্রাহকই নজরুলের হিন্দি গানের বাণী নিজেদের গবেষণাকর্মে এবং প্রকাশিত গ্রন্থে ব্যবহার করতে পেরেছেন। প্রখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত-গবেষক ও নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রাহক আসাদুল হক তাঁর 'নজরুলের হিন্দি গান' শীর্ষক গ্রন্থে (১৯৯৫) বিভিন্ন স্থানেই উল্লেখ করেছেন যে উক্ত গ্রন্থে ব্যবহৃত হিন্দি গানের বাণী হরফ প্রকাশনীর গ্রন্থ 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) এবং 'অপ্রকাশিত নজরুল' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। জনাব আসাদুল হক লিখেছেন, 'নজরুল রচিত এবং আমার নিজস্ব সংগৃহীত কিছু হিন্দি গান, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত ও ফারসি ভাষায় রচিত কয়েকটি গান এবং প্রখ্যাত নজরুল গবেষক মরহুম আবদুল আজীজ আল আমান ও গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের সংগৃহীত কিছু হিন্দি গান ও নাটক (যা তাঁর সম্পাদনায় 'অপ্রকাশিত নজরুল', দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে) একত্রিত করে আমি এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। গানগুলো কোথায় কিভাবে পাওয়া সম্ভব হয়েছে তা প্রতিটি গানের নীচে উল্লেখ করা হলো।' (নজরুলের হিন্দি গান, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক, প্রকাশনায় : নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুন, ১৯৯৫, ভূমিকা দ্রষ্টব্য) উল্লেখ্য, 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) গ্রন্থে হিন্দি গানের সংখ্যা ৭৪টি। 'নজরুলের হিন্দি গান' গ্রন্থে গানের সংখ্যা ৭২টি। উভয় গ্রন্থেই প্রায় সব গানই অভিন্ন, যদিও কিছু কিছু পাঠভেদ রয়েছে।

নজরুলের কয়েকটি হিন্দি গান
গ্রামোফোন রেকর্ড-পরিচিতি

১. আকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরু শ্যাম
[টুইন রেকর্ড। রেকর্ড নং এফ. টি ৪১০৪, অক্টোবর ১৯৩৫।
শিল্পী : শ্রীযুক্ত হেম সোম ও কুমারী বেরা সোম। সুর : নজরুল]

২. সারাদিন ছাদ পীটি (হিন্দি ফিল্ম 'চৌরঙ্গী'র গান)
[গ্রামোফোন রেকর্ড নং জে. এন. জি ১২৫৫। প্রকাশকাল ১৯৪২]

৩. বালা যোব্যন মোরি স্যখিরি পরদেশে পিয়া
[হিজ মাস্টার্স ভয়েস, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। শিল্পী : মিস প্রমোদা। রেকর্ড নং এন. ১৭০৪২]

৪. ব্যন্‌মে শুন স্যখিরি পিয়া পিয়া বোলে বাঁশুরিয়া
[হিজ মাস্টার্স ভয়েস, ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। শিল্পী : মিস. প্রমোদা। রেকর্ড নং এন. ১৭০৪২]

৫. ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা পে কিশোরী কিশোর
[কথা ও সুর : কাজী নজরুল ইসলাম। হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ড নং এন. ৯৭৭৪। প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ শিল্পী : পারুল সেন]

৬. ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক ঝোরে। দেখো সখি চম্পা থাকে
[ঐ]

৭. ঘনশ্যাম কে উদাসী হুঁ ম্যায়
[মূল সুর : নজরুল। গ্রামোফোন রেকর্ডে দু'জন শিল্পী আলাদাভাবে বাণীবদ্ধ করেন। শিল্পী : বিজনবালা ও শিল্পী : নীলমণি মনি সিংহ HMV Test Record No OML 70281. কোনো কারণে রেকর্ডটি বাতিল হয়ে যায় 'নজরুল-সঙ্গীত কোষ', পৃষ্ঠা ২১৩]

৮. জাগো ভারত বাণী ভারতজন তুম চাহে
[সুর : নজরুল। শিল্পী : বিজনবালা ঘোষ। গ্রামোফোন রেকর্ড নং এন. ১৭১৯০ প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৩৮]

৯. আজি মধুর গগন মধুর পবন
[হিজ, মার্চ, ১৯৩৭ ; গিরীণ চক্রবর্তী। এন ৯৮৬৮। রেকর্ড/বুলেটিনে 'ব্রিজমে ঘনশ্যাম' রয়েছে—রেকর্ডের বাণী 'ব্রিজমে ঘনশ্যাম']

১০. গাওস্যব ভারতকা প্যারা
[মূল সুর : নজরুল। গ্রামোফোন রেকর্ডে সুরকার ও শিল্পী : কুমারী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার। রেকর্ড নং এন. ১৭১৯০ প্রকাশকাল : ১৯৩৮]

১১. জগজ্জন মোহন সঙ্কটহারী কৃষকুমারী শ্রীকৃষ্ণকুমারী
[সুরকার : সত্যেন চক্রবর্তী। শিল্পী : রেণু বসু। রেকর্ড নং এইচ. এম. ভি: এন. ১৭০৫৬, প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ১৯৩৮]

১২. শ্যাম সুন্দর মন—মন্দিরমে আও
[সুর : সত্যেন বসু। শিল্পী : রেণু বসু। এইচ. এম. ভি রেকর্ড নং এন. ১৭০৫৬, প্রকাশকাল : ১৯৩৮]

১৩. রাধা শ্যাম কিশোর প্রীতম শ্রীকৃষ্ণ গোপাল
[শিল্পী : নিতাই ঘটক ও রেবা সোম। টুইন রেকর্ড নং এফ. টি ৪৬৫০। প্রকাশকাল : নভেম্বর ১৯৩৬]

১৪. রূপে ত্রিভুন শ্রীকৃষ্ণকে নাম পবন জপে
[শিল্পী : রেবা সোম। এইচ. এম. ভি রেকর্ড নং এন. ১৭০২২, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৩৮]

১৫. আজ বন-উপবনমে চঞ্চল মেরে মনমে
[শিল্পী : আভা সরকার। সুর : নজরুল। এইচ. এম. ভি রেকর্ড নং এন. ১৯২৭, প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৩৭]

[তথ্যসূত্র : 'নজরুল-গীতি' (অখণ্ড) : সম্পাদনায় ব্রহ্মমোহন ঠাকুর এবং 'নজরুলের হিন্দি গান' : সম্পাদনায় : আসাদুল হক]

বর্ণানুক্রমিক সূচি

অ

আ

জ

ঝ

ট

ত

স

হ